প্রতিচিন্তা

খতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

ষষ্ঠ বর্ষ ● চতুর্থ সংখ্যা ● ঢাকা ● অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৬

সম্পাদক ও প্রকাশক মতিউর রহমান কর্তৃক ৫২ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা ১০০০ থেকে
প্রকাশিত এবং ট্রান্সক্রাফট লিমিটেড, ২২৯ তেজগাঁও শিল্প এলাকা
ঢাকা ১২০৮ থেকে মুদ্রিত।
যোগাযোগ : সিএ ভবন, ১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ, কারওয়ান বাজার
ঢাকা-১২১৫। ফোন : ৮১৮০০৭৮-৮১
পরিবেশক : প্রথমা প্রকাশন, ১৯ কারওয়ান বাজার, ঢাকা-১২১৫।

প্রতিচিন্তা

সমাজ, অর্থনীতি ও রাষ্ট্রবিষয়ক ত্রৈমাসিক

অক্টোবর-ডিসেম্বর সংখ্যা, ২০১৬

সম্পাদক
মতিউর রহমান, সম্পাদক, প্রথম আলো

নির্বাহী সম্পাদক
খন্দকার সাখাওয়াত আলী, সমাজ গবেষক; ফেলো, পিপিআরসি

উপদেষ্টা পর্ষদ
নুরুল ইসলাম, অর্থনীতিবিদ; ইমেরিটাস ফেলো, ইফপ্রি
আনিসুজ্জামান, প্রফেসর ইমেরিটাস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
আজিজুর রহমান খান, অর্থনীতিবিদ ও গবেষক; প্রফেসর ইমেরিটাস, ইউনিভার্সিটি অব ক্যালিফোর্নিয়া
সিরাজুল ইসলাম, ইতিহাসবিদ; কমনওয়েলথ স্টাফ ফেলো
রওনক জাহান, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী; সম্মানীয় ফেলো, সিপিডি
আকবর আলি খান, অর্থনীতিবিদ, লেখক; অধ্যাপক, ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়
ওয়াহিদউদ্দিন মাহমুদ, অর্থনীতিবিদ; অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদনা পর্ষদ
নজরুল ইসলাম, ঊর্ধ্বতন অর্থনীতিবিদ, জাতিসংঘ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক বিভাগ
বদরুল আলম খান, অধ্যাপক, ওয়েস্টার্ন সিডনি বিশ্ববিদ্যালয়, অস্ট্রেলিয়া
হাসান ফেরদৌস, জাতিসংঘে কর্মরত
আলী রীয়াজ, অধ্যাপক, রাজনীতি ও সরকার বিভাগ, ইলিনয় স্টেট ইউনিভার্সিটি
আল মাসুদ হাসানউজ্জামান, অধ্যাপক, সরকার ও রাজনীতি বিভাগ, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
সাজ্জাদ শরিফ, কবি, ব্যবস্থাপনা সম্পাদক, প্রথম আলো

প্রচ্ছদ
অশোক কর্মকার, চিত্রশিল্পী

সহকারী সম্পাদক
খলিলউল্লাহ্ ও গোলাম মুস্তাফা

দাম : ৫০ টাকা
ISSN 2310-2403
ওয়েবসাইট : www.protichinta.com, ই-মেইল : protichinta@gmail.com

Protichinta : A Quarterly Journal on Society, Economy and State
October-December Issue, 2016; Editor & Publisher Matiur Rahman; Price 50 Taka
100 Kazi Nazrul Islam Avenue (CA Bhaban), Karwan Bazar, Dhaka 1215, Bangladesh
Phone : 8180078-81

সূ চি প ত্র

স ম্পা দ কী য় ৬

রা জ নী তি

জঙ্গিবাদের আবর্তে বিশ্বরাজনীতি ৯
বদরুল আলম খান

১ ৯ ৭ ১

শেখ মুজিবুর রহমান : একটি ঝড় ও বাংলাদেশের অভ্যুদয় ৫৫
জন পি থর্প

বাংলার ডায়েরি ৮৩
বরিস কালিয়াগিন
ভ্লাদিমির স্কসিরিওভ

না রী ও স মা জ

লীলা নাগ ও তাঁর জীবনসাধনা ১২১
মালেকা বেগম

ব ই আ লো চ না

এক তরুণ শিক্ষকের অ্যাকটিভিস্ট হয়ে ওঠার গল্প ১৪৩
মহিউদ্দিন আহমদ

পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ ১৬১
মো. ফজলে রাব্বি

লেখক পরিচিতি ১৮১



বর্তমান বিশ্বে দক্ষিণ পন্থার উত্থান প্রবণতাটি স্পষ্টভাবে লক্ষণীয়। বিশ্বের বিভিন্ন দেশে নির্বাচনে দক্ষিণপন্থী দলগুলো বিজয়ী হয়ে ক্ষমতায় আসছে। এই ডামাডোলে রাজনৈতিক ইসলামের উত্থানের পাশাপাশি উগ্র জাতীয়তাবাদ ও অভিবাসনবিরোধী শক্তিগুলো ক্ষমতার কেন্দ্রে চলে এসেছে। এই দুই দলই একে অপরের পরিপূরক শক্তি হিসেবে কাজ করছে। যে কারণে যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মুসলিম ও অভিবাসনবিরোধী হিসেবে পরিচিত দক্ষিণপন্থী ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিজয়ে জঙ্গি সংগঠন ইসলামিক স্টেট উল্লাস প্রকাশ করেছে। যেসব ঘৃণাপূর্ণ বক্তব্য দ্বারা ট্রাম্প তার জনসমর্থন আদায়ের চেষ্টা করেছে, সেগুলোই দক্ষিণপন্থী ইসলামিক স্টেটের পাল্টা বক্তব্য হিসেবে জনসমর্থন আদায়ে সহায়ক হবে বলে তারা মনে করে।

সাম্প্রতিক সময়ে ইউরোপে উগ্র জাতীয়তাবাদ এমন আকার ধারণ করেছে যেখানে মূলধারার রাজনৈতিক দলগুলোও সহিষ্ণুতা, উদারতা ও বৈচিত্র্যপূর্ণ সমাজব্যবস্থার মূলনীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য হচ্ছে। যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচনের আগে যুক্তরাজ্য ইউরোপীয় ইউনিয়ন থেকে বের হয়ে আসে, যার পেছনে মূল নিয়ামক ছিল অভিবাসনবিরোধী আন্দোলন। ফ্রান্স, নেদারল্যান্ডস ও অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সদস্যপদ বিষয়ে ব্রেক্সিটের মতো গণভোটের দাবি উঠেছে।

ডান পন্থার উত্থানের পেছনে অর্থনৈতিক সংকট থেকে আবির্ভূত হতাশা, প্রত্যাশা পূরণ না হওয়া এবং অর্থনৈতিক অসমতাকে অনেকে দায়ী করে থাকে। কিন্তু শুধু অর্থনৈতিক বিশ্লেষণ দিয়ে এর পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে বলে মনে হয় না। এর জন্য প্রয়োজন আরও বিস্তৃত দৃষ্টিভঙ্গি। সাম্প্রতিক কালে 'ইসলামিক স্টেট' সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। তাদের জঙ্গিবাদী কার্যক্রম শুধু মধ্যপ্রাচ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিশ্বের নানা দেশ এবং হাজার হাজার সাধারণ মানুষ তাদের দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে। বাংলাদেশও জঙ্গি হামলায় আক্রান্ত হয়েছে। তাই 'ইসলামিক স্টেট' নামক গোষ্ঠী সম্পর্কে বিশদভাবে ওয়াকিবহাল থাকা জরুরি বলে আমরা মনে করি। এই বিষয়টির প্রতি দৃষ্টি রেখেই *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় ছাপানো হয়েছে বদরুল আলম খানের 'জঙ্গিবাদের আবর্তে বিশ্বরাজনীতি' শীর্ষক প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধে আইএস-এর আবির্ভাব কী কারণে হলো, কেন এত বর্বরতা দিয়ে সে তার আদর্শকে প্রকাশ করছে এবং তার ভবিষ্যৎ কী—এই দিকগুলো বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর উত্থানের পেছনে বিশ্বরাজনীতির ভূমিকা রয়েছে। বাংলাদেশেও আমরা দেখেছি দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলো বিভিন্ন সময়ে মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে। এসব শক্তি কখনোই একেবারে শেষ হয়ে যায়নি। আর্থসামাজিক বৈষম্য দক্ষিণ পন্থার উত্থানে বড় ভূমিকা রাখে, সে কথাও অনস্বীকার্য। বিশ্বব্যাপী যে বৈষম্য বিরাজমান তার স্বরূপ হিসেবে বলা যায়, বিশ্বের এক ভাগ মানুষ বাকি নিরানব্বই ভাগের চেয়ে বেশি সম্পদের মালিক। বাংলাদেশেও একই রকম বৈষম্য আমরা দেখতে পাই। এর মূল কারণ নিহিত সম্পদের বণ্টন-প্রক্রিয়ার মধ্যে। তবে এক্ষেত্রে ঐতিহাসিক কারণগুলো এই বিশ্লেষণের জন্য খুব জরুরি।

উপমহাদেশের ইতিহাসে যে কয়জন নারীর অবদান অনস্বীকার্য, লীলা নাগ তাদের অন্যতম। তিনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুজন ছাত্রীর একজন। তিনি ছিলেন নারীমুক্তি এবং ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম অগ্রবর্তী নারী কর্মী। তিনি ছিলেন বিনা বিচারে আটক প্রথম ভারতীয় নারী রাজবন্দী। এই রাজনীতিসচেতন বিপ্লবী নারীকে নিয়ে আলোচনা করেছেন নারীনেত্রী ও গবেষক মালেকা বেগম। তাঁর প্রবন্ধের শিরোনাম 'লীলা নাগ ও তাঁর জীবনসাধনা'। এই প্রবন্ধ পাঠকদের লীলা নাগ সম্পর্কে আরও বেশি জানতে উৎসাহিত করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি। লীলা নাগকে দেশ ত্যাগ করতে বাধ্য করা তৎকালীন পাকিস্তান রাষ্ট্রের দক্ষিণ পন্থার একটি উদাহরণ। পাকিস্তান রাষ্ট্র শুধু সাধারণ মানুষকেই নয়, লীলা নাগের মতো অসংখ্য প্রতিভাবান ব্যক্তিত্বকে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির মাধ্যমে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল।

সম্প্রতি বাংলাদেশের কাছে পাকিস্তান তাদের 'অনাদায়ী সম্পদের পাওনা' দাবি করবে বলে গণমাধ্যমে আমরা দেখতে পাই। যদিও রাষ্ট্রীয় উত্তরাধিকারের ভিত্তিতে বাংলাদেশই পাকিস্তানের কাছে বিস্তর পাওনার দাবিদার। এ বিষয়ক বিস্তারিত হিসাবনিকাশ *প্রতিচিন্তার* অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫ সংখ্যায় প্রকাশিত হয়েছে। ব্রিটিশ আমলের সম্পদ পাচার এবং বৈষম্যের বোঝা ঘাড়ে নিয়ে যে রাষ্ট্র জন্ম নিল, সেই পাকিস্তানের শাসকশ্রেণি বৈষম্যকে রাষ্ট্রীয়ভাবে কাঠামোবদ্ধ করেছিল। সে কাঠামো আজকের বাংলাদেশ থেকে পুরোপুরি দূর হয়েছে কি না তা তর্কসাপেক্ষ। বর্তমান বাংলাদেশে বৈষম্যকে বুঝতে হলে বাংলাদেশের প্রতি পাকিস্তানের বৈরী নীতি ও বৈষম্যকে আরও ভালোভাবে জানা প্রয়োজন। একই সাথে বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশে উগ্রবাদ বা দক্ষিণপন্থী শক্তিগুলোর উত্থান বিষয়ে আলোচনা করতে হলে বিশ্বরাজনীতির যে প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশ রাষ্ট্র জন্ম নিল তা তখনকার বিশ্বরাজনীতির খেলোয়াড়দের দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে বোঝা প্রয়োজন। *প্রতিচিন্তার* এবারের সংখ্যায় তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়ন, যুক্তরাষ্ট্র ও ভারতের লেখকদের বাংলাদেশ সম্পর্কে বিশ্লেষণ ছাপানো হয়েছে। এসব লেখায় শুধু ঘটনার বর্ণনা আমাদের উপজীব্য নয়, ঘটনা বিশ্লেষণের দৃষ্টিভঙ্গির প্রতিই আমাদের মূল নজর।

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসের সবচেয়ে আলোচিত ব্যক্তিত্ব বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। একজন ব্যক্তি একটি রাষ্ট্র গঠন-প্রক্রিয়ায় কী ধরনের অগ্রণী ভূমিকা পালন করতে পারেন, মুজিব তার উৎকৃষ্ট উদাহরণ। মুজিবের জীবন নিয়ে অনেক আলোচনা হলেও তাঁর নেতৃত্বগুণের সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ যথাযথভাবে হয়নি। এই শূন্যতা পূরণের লক্ষ্যে *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় ছাপা হলো 'শেখ মুজিবুর রহমান : একটি ঝড় ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়' শিরোনামের প্রবন্ধটি। এই প্রবন্ধের লেখক মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক জন পি থর্প। লেখক এই প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের সৃষ্ট বিশেষ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ কীভাবে ধীরে ধীরে জন-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয় তার সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। এর মাধ্যমে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে চলমান আলোচনায় নতুন মাত্রা যোগ হবে বলে আমরা প্রত্যাশা করি।

মুক্তিযুদ্ধ কোনো একমাত্রিক বিষয় ছিল না। এর সঙ্গে জড়িত ছিল জাতীয়, আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক বহু বিষয়। ফলে মুক্তিযুদ্ধের ঘটনাপ্রবাহের বর্ণনায় আমরা বৈচিত্র্য খুঁজে পাই। মুক্তিযুদ্ধ সময়কার ঘটনাপ্রবাহের যেসব বর্ণনা আমরা দেখতে পাই, তার মধ্যে অন্যতম তথ্যসমৃদ্ধ এবং সূক্ষ্ম বর্ণনাগুলো করেছেন তৎকালীন এই অঞ্চলে কর্মরত বিদেশি সংবাদকর্মীরা। এই বর্ণনাগুলো মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাসের অন্যতম প্রধান রসদ বলে আমরা মনে করি। ফলে *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় ছাপা হলো সোভিয়েত সংবাদকর্মী বরিস কালিয়াগিন এবং ভ্লাদিমির স্কসিরিওভের মুক্তিযুদ্ধকালীন ডায়েরির অংশবিশেষ। ১৯৭১ সালে যখন বাংলাদেশের জন্ম হলো এবং যখন রাষ্ট্রটি তার জীবনের প্রথম পদক্ষেপগুলো ফেলছে, সে সময়ের কিছু কথাই উঠে এসেছে এই প্রবন্ধে। এই প্রবন্ধটির শিরোনাম 'বাংলার ডায়েরি'।

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গেলে নিশ্চিতভাবেই এই অঞ্চলের ওপর পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া নীতির প্রসঙ্গটি চলে আসে। অর্থনৈতিক বৈষম্য হ্রাসের লক্ষ্যে উত্থাপিত হয়েছিল ঐতিহাসিক ছয় দফা। ছয় দফা রচিত হয়েছিল 'দুই অর্থনীতি'র তত্ত্বের ভিত্তিতে। এই 'দুই অর্থনীতি' তত্ত্বের প্রবক্তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রেহমান সোবহান। সম্প্রতি প্রকাশিত হয়েছে তাঁর স্মৃতিকথা *আনট্রাঙ্কুয়েল রিকালেকশনস : দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট*। স্মৃতিকথা হলেও এই বইয়ে উঠে এসেছে ওই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ এবং ইতিহাসের নানা চরিত্র। ফলে বইটি হয়ে উঠেছে ইতিহাসের এক নির্মোহ দলিল। *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যায় বই আলোচনা অংশে এই বইটি নিয়ে 'এক তরুণ শিক্ষকের অ্যাকটিভিস্ট হয়ে ওঠার গল্প' শিরোনামে লিখেছেন মহিউদ্দিন আহমদ।

এই বিষয়টি এখন স্বীকৃত যে তৎকালীন পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর শাসন ছিল ঔপনিবেশিক কায়দার। পাকিস্তানের ভাঙনের যে কয়টি মূল কারণ, তার মধ্যে এই অর্থনৈতিক বৈষম্য একটি অন্যতম প্রধান বিষয় ছিল। এই বিষয়টির উপর পাঠকদের বিস্তারিতভাবে অবহিত করার প্রত্যাশায় *প্রতিচিন্তার* এই সংখ্যার বই আলোচনা অংশে ছাপানো হলো ১৯৭১ সালে প্রকাশিত ডি. আর. মানকেকারের বই *পাক কলওনিয়্যালিজম ইন ইস্ট বেঙ্গল* নিয়ে আলোচনা। 'পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ' শিরোনামের বই আলোচনাটি করেছেন মো. ফজলে রাব্বি।

খাতি চিন্তা
রাজনীতি

জঙ্গিবাদের আবর্তে বিশ্বরাজনীতি

বদরুল আলম খান

"Fascism psychologically far sounder than any hedonistic conception of life...Whereas Socialism, and even Capitalism in a more grudging way, have said to people "I offer you a good time," Hitler said to them, "I offer you struggle, danger, and death," and thus a whole nation flings itself at his feet ... We ought not to underrate its emotional appeal.—জর্জ অরওয়েল।

সারসংক্ষেপ

'জঙ্গিবাদের আবর্তে বিশ্বরাজনীতি'—এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয় 'ইসলামিক স্টেট'। ইসলামিক স্টেট ইসলামি জঙ্গিবাদের মূর্ত প্রতীক। এই ধর্মীয় আন্দোলনের আবির্ভাব কী কারণে হলো, কেন এত বর্বরতা দিয়ে সে তার আদর্শকে প্রকাশ করছে এবং তার ভবিষ্যৎ কী—এই দিকগুলো এখানে আলোচিত হয়েছে। 'ইসলামিক স্টেট'-এর উত্থানের চারটি কারণ রয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। একটি পবিত্র ধর্মীয় গ্রন্থের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত প্রয়োগ এবং ব্যাখ্যা। তবে সেটি মুখ্য কারণ নয়। আরও গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলোকে খুঁজতে হলে তিনটি দিককে এই আলোচনায় অন্তর্ভুক্ত করা জরুরি। একটি মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতি, দ্বিতীয়টি মার্কিন আধিপত্যবাদ এবং নিওকনভিত্তিক তার বৈদেশিক নীতি এবং তৃতীয়টি আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সংকট। ইসলামি জঙ্গিবাদ সামাজিক ও রাজনৈতিক নানা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। তাকে একচেটিয়াভাবে দোষারোপ করে আত্মতৃপ্তি পাওয়া সে কারণে কোনো কাজের কথা নয়। ওই সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণগুলোকে দূর করাই হচ্ছে জঙ্গিবাদের একমাত্র সমাধান।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

'ইসলামিক স্টেট', জাতিরাষ্ট্রের সংকট, মার্কিন আধিপত্যবাদ, মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতি, শিয়া-সুন্নি বিভেদ, লিও স্ট্রস, ইসলামিক জঙ্গিবাদ, জিহাদি আদর্শ।

প্রাক্-কথন

এই লেখাটি 'ইসলামিক স্টেট' নামে একটি ধর্মীয় আন্দোলনের ওপর। কিন্তু একচেটিয়াভাবে তার ওপর কেবল নয়। এখানে আরও রয়েছে রাজনৈতিক ইসলামের ভবিষ্যৎ নিয়ে কিছু সার্বিক আলোচনা। সাম্প্রতিক কালে 'ইসলামিক স্টেট' সারা বিশ্বের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কী নাটকীয়ভাবে সিরিয়া ও ইরাকের কিছু অংশ দখল করে নিয়ে ২০১৩ সালের এপ্রিল মাসের দিকে এই 'ইসলামিক স্টেট'-এর জন্ম হলো সেটি আমরা স্থানীয় খবরের কাগজ বা বিদেশি সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে পেয়েছি। এপ্রিলের পর ১০ জুন ২০১৪ সালে ইসলামিক রাষ্ট্রের যোদ্ধারা ইরাকের দ্বিতীয় বৃহত্তর শহর মসুল (২০ লাখ অধিবাসী) দখল করে নেয়। এরপর তাদের অধীনে আসে তিকরিতসহ অন্যান্য আরও কিছু শহর এবং অঞ্চল। প্রায় একই সময়ে সিরিয়ায় 'আরব বসন্তের' ঢেউ লাগে এবং সেখানেও শুরু হয় সরকারবিরোধী অভ্যন্তরীণ সংঘাত। তারই সুযোগ নিয়ে নানা জঙ্গিবাদী ইসলামি সংগঠন জিহাদে যোগ দেয়। রাকা, আলেপ্পো, হোমস পালমিরার মতো গুরুত্বপূর্ণ সিরিয় শহরগুলো দ্রুত তাদের দখলে এলে এসব দখলকৃত অঞ্চল নিয়ে 'ইসলামি রাষ্ট্র' আরও বৃহৎ ও শক্তিশালী হয়।

হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সেই খিলাফত নানা চরাই-উতরাই পার হয়ে অবশেষে ১৯২৪ সালে বিলুপ্ত হয়। সেটি ঘটেছিল প্রথম মহাযুদ্ধে তুরস্কের পরাজয়ের কারণে। তা ছাড়া তার অবসানে আরও ভূমিকা রেখেছিল কামাল আতাতুর্ক, যিনি তুরস্ককে ধর্মনিরপেক্ষ আধুনিক একটি রাষ্ট্রে পরিণত করতে চেয়েছিলেন। 'ইসলামি রাষ্ট্র' প্রতিষ্ঠার ঘটনাকে আমরা সামান্য ভাবতে পারি না। অনেকে তাঁকে ওই হারিয়ে যাওয়া খিলাফতের মূর্ত রূপ হিসেবে দেখে। ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধ ও গৌরবময় যুগে ফিরে যাওয়ার যতটুকু সম্ভাবনা তারা স্বপ্নে ভেবেছে সেটি তাঁর মধ্য দিয়ে সম্ভব বলে তাদের দৃঢ় বিশ্বাস। এই ইসলামিক স্টেটের খলিফা হলেন আবু বকর আল বাগদাদী। তিনি একজন ইরাকি এবং কোরেশি বংশ (অর্থাৎ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর বংশ) থেকে আগত। ইসলামের ওপর তাঁর গভীর জ্ঞান আছে বলে আমরা জানি এবং শান্ত-শিষ্ট প্রকৃতি এবং একজন বিশেষ তাত্ত্বিক হিসেবে তাঁর পরিচিতির কারণে এই রাষ্ট্রের প্রতি অনেকে আকৃষ্ট হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে পরিচালিত এই আন্দোলনের প্রাথমিক উদ্দেশ্য হচ্ছে সদ্যোজাত এই 'ইসলামি রাষ্ট্রের' ভিতকে শক্ত করা। কারণ ওই রাষ্ট্রের সঙ্গে তারা ইসলাম ধর্মের নবী হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সম্পৃক্ততা অনুভব করে। ফলে প্রায় ১০০ বছর পর (খিলাফতের শাসন শেষ হয় ১৯২৪ সালে) 'পুনঃপ্রতিষ্ঠিত খিলাফতের' অধীনে বাস করা তাদের জন্য বিশেষভাবে গৌরবময়। তা ছাড়া গোটা বিশ্বে ইসলামি শরিয়া শাসন প্রতিষ্ঠা করার যে জিহাদি

আহ্বান সম্পর্কে আমরা জানি সেটিও মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের আকৃষ্ট করার ক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। নানা দেশের মুসলিম যোদ্ধারা এই রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেছে। এই আনুগত্যের মধ্যে আরও রয়েছে বিশেষ আবেগ। কারণ ইসলামিক স্টেটের প্রধান লক্ষ্য হচ্ছে সাম্রাজ্যবাদী এবং ইউরোপীয় দেশের তাঁবেদার হিসেবে সিরিয়া ও ইরাকের ক্ষমতাসীন সরকারকে উৎখাত করা। পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে ইসলামি শাসন প্রতিষ্ঠা এবং বিশ্বব্যাপী ইসলামি শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠার সংকল্পও তাদের সহিংস সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে। অনেক মুসলিম যুবক অনুপ্রাণিত হয়ে সিরিয়া ও ইরাকে গেছে যুদ্ধে অংশ নিতে। বাংলাদেশ থেকেও বেশ কিছু তরুণ সিরিয়ায় ইসলামি রাষ্ট্রের হয়ে সংগ্রামে ব্রত আছে বলে আমরা জানি। সেরান্তিনী নামে একজন অস্ট্রেলিয়ান আইএস নেতা দাবি করেছেন কেবল এক সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য দেখানো একজন মুসলমানের জন্য যথেষ্ট নয়। একই সঙ্গে খিলাফতের প্রতি আনুগত্য দেখানো প্রতিটি মুসলমানের কর্তব্য, যাকে আরবি ভাষায় বলা হয় বায়া। খিলাফতের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে মৃত্যু হলে জাহিল হিসেবে মৃত্যু হবে বলে তিনি সতর্ক করে দিয়েছেন। কেবল তিনিই নন, 'ইসলামিক স্টেট'-এর আরও অনেক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ওই একই ধারণা পোষণ করেন। তার অর্থ হচ্ছে ১৯২৪ সালে খিলাফতের পর ৯২ বছরে যেসব মুসলমান মারা গেছে তারা জাহিল হিসেবে মারা গেছে বলে আমাদের ধরে নিতে হবে (দেখুন: গ্রাহাম উড ২০১৫)। তবে এমনও হতে পারে যে তাদের মন খিলাফতের আহ্বানে আন্দোলিত হয়েছিল। কিন্তু হলেও 'ইসলামিক স্টেটের' মতো কোনো এজেন্সি বা বাহক না থাকায় তাদের অনুভূতি বাস্তব রূপ নেয়নি।

'ইসলামিক স্টেট' সিরিয়ার শহর দাবিককে তাদের আন্দোলনে বিশেষ গুরুত্ব দেয়। তারা তাদের প্রোপাগান্ডা পত্রিকার নাম ওই শহরের নাম অনুসারে রেখেছে। যদিও আমরা জানি সেটি অনেকাংশে প্রতীকী। ধর্মীয় বিশ্বাস মতে, হজরত মুহাম্মদ (সা.) কোনো এক সময়ে বলেছিলেন যে রোমের খ্রিষ্টান বাহিনীর সঙ্গে ইসলামের জিহাদি বাহিনীর শেষ যুদ্ধটি অনুষ্ঠিত হবে ওই শহরের কাছে। সেই যুদ্ধে গোটা বিশ্ব ধ্বংস হয়ে শেষ বিচারের পথকে প্রশস্ত করবে বলেও অনেকে বিশ্বাস করেন। এই ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্য ভেবে 'ইসলামিক স্টেট' তার সমর্থক যোদ্ধাদের অনুপ্রাণিত করছে। তাদের মধ্যে এই আত্মবিশ্বাস সঞ্চালিত করা হচ্ছে যে তারাই হচ্ছে সেই গোষ্ঠী যারা বিশ্বব্যাপী ইসলামের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার একমাত্র শক্তি এবং তাদের হাতেই সব বিধর্মীর পতন অনিবার্য। এসব প্রতীকী ব্যবহারিক প্রবণতার সঙ্গে আরও রয়েছে তাদের সামরিক কৌশল, যেটি দৃশ্যত বর্বর ও নৃশংস। ওই বর্বরতার পেছনে যে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্য নেই তা নয়। রুশ সাহিত্যিক দস্তয়ভস্কি যেমন মনে করেছিলেন যে সন্ত্রাসী আতঙ্কের পরিবেশ

সৃষ্টি করে মানুষকে বশ করা সহজ। সেটি তাঁর লেখা 'ব্রাদারস কারামোজভ' নামের রচনায় আমরা উল্লেখ হতে দেখেছি। ইসলামিক স্টেটও কিন্তু ওই সন্ত্রাসকে তাদের দেওয়া ইসলামি জীবনের ব্যাখ্যার প্রতি আনুগত্য প্রকাশে মানুষকে বাধ্য করার হাতিয়ার হিসেবে দেখছে। আজ ইসলামি জঙ্গিবাদের অকুস্থল হিসেবে আমরা মধ্যপ্রাচ্যকে দেখছি বটে কিন্তু তা হলেও প্রতিটি মুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ দেশ আজ ওই আগুনের তাপ অনুভব করছে নানাভাবে—হয় সন্ত্রাসী আক্রমণের শিকার হয়ে অথবা জঙ্গি জিহাদি তৈরি করে। কেবল মুসলিম দেশে নয়, ওই আগুন জ্বলছে ইউরোপ-আমেরিকার মতো দূরের দেশেও। ইসলামিক স্টেটের সবকিছু যদি বিচার করা হয় তাহলে আমরা দেখব যে তাদের এই আক্রমণাত্মক কৌশলকে তারা সুচিন্তিত একটি নীতি হিসেবে গ্রহণ করেছে। সেটি তাদের জন্য যে আকস্মিক কিছু নয় এবং একটি বিশেষ তত্ত্বীয় কাঠামোর ওপর প্রতিষ্ঠিত, সেটিও আমরা প্রত্যক্ষ করব পরবর্তী সময়ে।

কয়েকটি কারণে জিহাদি জঙ্গিবাদকে নিয়ে আমাদের এই আলোচনা প্রাসঙ্গিক। প্রথমত, এই বিশেষ জঙ্গিবাদী আন্দোলন আমাদের মাতৃভূমি বাংলাদেশকে সাম্প্রতিক কালে বিশেষভাবে আলোড়িত করে গেছে। আমাদের দেশে ইসলামিক স্টেটের পক্ষে কাজ করে এমন সমর্থকেরা ব্লগার বা সংখ্যালঘু গোষ্ঠীর ওপর আক্রমণ চালিয়ে অনেককে হত্যা করেছে। সেই সঙ্গে রয়েছে ভবিষ্যতে আরও আক্রমণের হুমকি। যেটি তাদের এই অভিযানে লক্ষণীয় তা হচ্ছে বিধর্মীর সংজ্ঞায়ন। ওই বিধর্মীর দলে তারা অন্তর্ভুক্ত করে খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, সামাজিক কর্মী, শিয়াসহ পুস্তক প্রকাশক, অধ্যাপক এবং মুক্তমনা ব্যক্তিদের। বাংলাদেশ সরকার ইসলামি স্টেটের উপস্থিতিকে দীর্ঘকাল ধরে অস্বীকার করে এলেও গুলশান রেস্তোরাঁয় নৃশংস ঘটনার পর সরকারের কিছুটা হলেও টনক নড়ে। তবে এ কথা সত্য যে, যে পথ বা কৌশল অবলম্বন করে সরকার জঙ্গিবাদের মোকাবিলা করার পরিকল্পনা করছে সেটি ভবিষ্যতের জন্য কতটুকু উপকার বয়ে আনবে, সে প্রশ্ন রয়ে গেছে। ফলে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই আন্দোলনের তাৎপর্য ও ভবিষ্যৎ কী এবং আমাদের করণীয় কী হতে পারে সেটি যেকোনো সচেতন নাগরিকের জন্য ভাববার বিষয়।

দ্বিতীয়ত, রাজনৈতিক বা জঙ্গিবাদী ইসলামের উত্থান এই প্রথম নয়। বিশ্বব্যাপী সাম্রাজ্যবাদী শক্তি আমাদের মতো দেশকে পরাভূত করে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠা করার পর থেকে (অষ্টাদশ শতাব্দী) আমরা ইসলাম ধর্মকে বিশুদ্ধ রাখার আন্দোলন প্রত্যক্ষ করেছি। সেই আন্দোলন কখনো এসেছে সহিংস পথ ধরে। কখনো বা গণ-আন্দোলনের মাধ্যমে (আমাদের দেশের প্রেক্ষাপটে ফরায়েজি আন্দোলন, তিতুমীরের আন্দোলন ইত্যাদি)। 'ইসলামিক স্টেট'ও বিশুদ্ধ ইসলামি সমাজ নির্মাণ

করতে চায়। কিন্তু তা হলেও এই আন্দোলনের প্রকৃত চরিত্র কী, কী কারণে তার উদ্ভব হলো, তার আদর্শ ও কার্যকলাপ ইসলামি আদর্শের সঙ্গে কতটুকু সংগতিপূর্ণ সেসব প্রশ্নের উত্তর আজ বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়। তারা কি পবিত্র কোরআনের সুরা বা হাদিস অনুসরণ করে তাদের কার্যক্রম নির্ণয় করে? নাকি তাদের কার্যক্রম রাজনীতি ও ক্ষমতার দ্বন্দ্বের বহিঃপ্রকাশ মাত্র, যা আজ নানাভাবে প্রকাশ পাচ্ছে ধর্মীয় বাণীর মোড়কে। নাকি দুটির কোনোটিই এককভাবে এর উৎস নয়। বরং দুইয়ের সমন্বয় থেকে জাত। এসব প্রশ্নের উত্তর খুঁজে বের করা যে আজ কতটুকু গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়িয়েছে, সেটি না বললেও চলে।

তৃতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, এই ইসলামি জঙ্গি আন্দোলনের ভবিষ্যৎ কী? 'ইসলামিক স্টেট' ভিত্তিক আন্দোলন কি রাজনৈতিক ইসলামের শেষ অধ্যায়? আমরা জানি এ ব্যাপারে অভিন্ন কোনো মতামত দেওয়া কঠিন। সে যা-ই হোক ওই প্রশ্নকেন্দ্রিক আলোচনাকে অর্থবহ করতে হলে আমাদের তিনটি নির্দিষ্ট ধারা, যা কিনা আমরা রাজনৈতিক এবং জঙ্গি ইসলামের ইতিহাসে লক্ষ করেছি তা বিশ্লেষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। তাদের মধ্যে কোনো বিশেষ প্যাটার্ন আছে কি না সেটিও অনুসন্ধান করা এ ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ। আমাদের বিশ্বাস, তাত্ত্বিকভাবে এই সহিংস পথ ইসলামি আন্দোলনের সর্বশেষ ধাপ। যদিও এই দৃষ্টিকোণটির সত্যতা নির্ভর করছে আরও বহু ফ্যাক্টরের ওপর। তবে এ কথা সত্য যে বাংলাদেশে জঙ্গিবাদী ইসলামের ভবিষ্যৎ কী, সে প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানে আমাদের এই দৃষ্টিকোণটি বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে বলে আমরা মনে করি।

পূর্বকথা

মূল আলোচনায় যাওয়ার আগে কিছু কথা আছে, যা এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেহেতু মধ্যপ্রাচ্য ইসলামিক স্টেটের মূল কেন্দ্র বা যাকে বলে এপিসেন্টার, সেহেতু তাকে নিয়ে দুটি কথা বলে শুরু করা আমি যৌক্তিক বলে মনে করি। মধ্যপ্রাচ্যকে আমরা দীর্ঘকাল ধরে বিশ্বরাজনীতির সবচেয়ে উত্তপ্ত অঞ্চল হিসেবে জেনে এসেছি। কেবল সাম্প্রতিক কালে নয়, অতীতেও সেখানে যে সংঘাত সৃষ্টি হয়েছিল তার জন্য কেবল রাজনীতিকে দোষ দেওয়া যায় না। রাজনীতির সঙ্গে আরও যোগ হয়েছে ধর্ম। ধর্ম এমন একটি অনুভূতি যার আকর্ষণক্ষমতা মানুষকে আবেগপ্রবণ করে। রাজনীতির সঙ্গে ধর্মকে যোগ করার কারণে যেকোনো অশান্ত পরিবেশ আরও অশান্ত হয়ে ওঠে। মধ্যপ্রাচ্যের ক্ষেত্রে ঘটেছেও তা-ই। তিনটি বিশ্বধর্মের (খ্রিষ্টান, ইহুদি ও ইসলাম) কথা আমরা জানি, যার সবগুলোরই জন্ম এই মধ্যপ্রাচ্যে। তাদের প্রতিটিই শান্তির বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিয়েছে। কিন্তু মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি লক্ষ করেছি আমরা কদাচিৎ। অতীতে যেমন তেমনি আজও এ অঞ্চল জ্বলছে ধর্মীয়

সংঘাতের আগুনে। এই অশান্ত পরিবেশের ইতিহাস সাম্প্রতিক কালের নয়। তার শেকড় গভীর অতীতে প্রোথিত। ধর্মীয় দ্বন্দ্বের নানা রূপ অতীতকাল থেকে এখানে আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, যার খণ্ডাংশ আজকের বিক্ষুব্ধ পরিবেশ সৃষ্টির পেছনে কিছুটা হলেও হয়তো ইন্ধন জোগাচ্ছে বলে আমরা ধারণা করতে পারি। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর মুসলমান ধর্মাবলম্বীদের মধ্যে যে অন্তর্দ্বন্দ্বের আগুন ছড়িয়ে পড়েছিল তা থেকে এখানে জন্ম নিয়েছে শিয়া-সুন্নির আত্মঘাতী এবং রক্তক্ষয়ী ইতিহাস। সেই সংঘাত আজ স্থায়ী রূপ লাভ করেছে। ক্রুসেড নামের ধর্মযুদ্ধের কথা আমরা জানি। খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যকার সেই দীর্ঘ ও রক্তক্ষয়ী দ্বন্দ্ব অতীতে বিলীন হলেও তার প্রভাব এবং প্রচ্ছন্ন উপস্থিতি এখানকার রাজনীতিকে অতীতে কলুষিত করে গেছে। আজও করছে। ইহুদি-মুসলিম দ্বন্দ্ব আধুনিক কালের একটি দ্বন্দ্ব হিসেবে আমরা জানি। কিন্তু তা হলেও সে সংঘাতও শান্তিকে বিনষ্ট করার ক্ষেত্রে কম ভূমিকা রাখেনি। ফলে সব মিলিয়ে এ অঞ্চল রাজনৈতিক হিংসার বিষে বিষাক্ত হয়ে আছে। আরও যেটি এ অঞ্চলের জন্য কাল হয়েছে তা হলো তার তেলসম্পদ, ইংরেজিতে যাকে বলা হয় রিসোর্স কার্স। এই তেলসম্পদকে কেন্দ্র করে বিশ্বের ক্ষমতাশালী দেশগুলো নানা ধরনের কূট রাজনীতির আশ্রয় নেয়, কখনো ব্যবহার করে ধর্মকে, কখনো তাঁবেদার শাসক তৈরি করে সম্পদের ওপর কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখে। সেখানে কোনটি সত্য কোনটি মিথ্যা, কোনটি নৈতিকভাবে সংগত কোনটি সংগত নয়, কোনটি গ্রহণযোগ্য এবং কোনটি গ্রহণযোগ্য নয়, সে ভেদাভেদ এখানে মুছে যায়। ফলে ধর্ম-রাজনীতি-গোত্রবিভক্তির এক জগাখিচুড়ি মধ্যপ্রাচ্যকে পরিণত করেছে সংঘাতময় ও ভয়ংকর এক অঞ্চলে।

একেশ্বরবাদী ধর্মের আবির্ভাবের আগে মধ্যপ্রাচ্যে মানুষ বহু ঈশ্বরবাদী নানা ধর্মে বিশ্বাস করত। সুমেরীয়, ব্যবিলনীয় এবং অ্যাসিরীয় নামে যেসব অঞ্চলকে প্রাচীন কাল থেকে আমরা জেনে এসেছি তারাই আজকের ইরাক কিংবা তার গা ঘেঁষে থাকা সিরিয়া, জর্ডান, ইসরায়েল বা তুরস্ক। এসব অঞ্চল প্রাচীনকাল থেকে বিশ্বাস জগতের বিচিত্র সব কাঠামো গড়ে তুলেছিল। বহুদেবতার প্রতি প্রতিষ্ঠিত বিশ্বাসের ওপর ভর করে যে অভূতপূর্ব অতীন্দ্রিয় জগতের জন্ম হয়েছিল তার প্রভাবে মেসোপটেমিয়া, ব্যবিলন, মিসরের নীল নদ, ইউফ্রেটিস, টাইগ্রিস নদীর অববাহিকা ধরে আরব মরুভূমির বালুরাশির ওপর দিয়ে বয়ে গেছে বিশ্বাসের বিচিত্র ঢেউ। কিন্তু বড় মাপের ধর্মীয় সংঘাতের কোনো উদাহরণ ওই পর্যায়ের ইতিহাসে আমরা লক্ষ করিনি। নানা ধর্মবিশ্বাস মানুষকে প্রেরণা জুগিয়েছে। বাতাসে ভেসেছে নানা গুজব, মুক্তির নানা বাণী। ফুলের সুগন্ধ যেমন বাতাস বয়ে নিয়ে আসে, মানুষের মনোজগৎ তেমনি সিক্ত হয়েছে অতীন্দ্রিয় চিন্তার অনুধ্যানে।

দেবতাকুল মানুষের ভাগ্যকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। মানুষকে পাপকাজে প্রবৃত্ত করেছে, আবার তা থেকে উদ্ধারও করেছে। তীব্র কোনো সংঘাতে লিপ্ত হওয়ার কোনো উদাহরণ সে কালে ছিল না বললেই চলে।

এই বিশ্বাসকাঠামো যখন তার শক্তি ও প্রভাব হারিয়ে ফেলে তখন তার স্থান দখল করে নেয় একেশ্বরবাদী ধর্ম। একেশ্বরবাদী ধর্ম হিসেবে ইসলাম ধর্ম ঠিক খ্রিষ্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্মের মতো আরবের অত্যন্ত কর্কশ, কঠোর এক গোত্রশাসিত মরুভূমি অঞ্চলে জন্ম নেয়। ৬৩২ সালে হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর আরবের মুসলমান সম্প্রদায় মধ্যপ্রাচ্যের নানা অঞ্চল জয় করে নেয়। ৬৩৩ সালে দামেস্ক, ৬৩৮ সালে জেরুজালেম, ৬৪০ সালে সিসারিয়া, ৬৪১ সালে সিরিয়া, মেসোপটেমিয় শহর হারান, এদেসা, নাসিবিন দখল করে। এরপর পতন ঘটে মিসরের এবং ওই একই বছর হেলিওপলিস এবং ব্যবিলন মুসলমানদের অধীনে আসে। ৬৪৩ সালে গুরুত্বপূর্ণ শহর আলেকজান্দ্রিয়া এবং ৬৪৩ সালে ত্রিপলি মুসলমানদের দখলে আসে। ৬৩৭ সালে কাদিসিয়ার যুদ্ধে সাসানিয় সাম্রাজ্যের রাজধানী তেসিফন মুসলমানদের অধীনে আসার পর মুসলিম বাহিনী ইরানে অভিযান চালায়। ৬৪৩ ও ৭১১ সালের মধ্যে উত্তর আফ্রিকা তাদের দখলে আসে। ৭১১-৭৫৯ সালের মধ্যে স্পেন মুসলমানদের হাতে পরাজয় বরণ করে। ৭১২ ও ৭১৩ সালে বুখারা, সমরখন্দের পতন ঘটে। এভাবে এই বিশাল অঞ্চল ইসলামের অধীনে এক অভিন্ন অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সাম্রাজ্যে পরিণত হয়। তুর্কিদের নেতৃত্বে অটোমান সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর (১২৯৯-১৯২২) তুর্কি সুলতান বিশ্বের সব মুসলমানকে এক খিলাফতের অধীনে ঐক্যবদ্ধ করেছিলেন। ১৬৮৩ সালে ভিয়েনার যুদ্ধে অটোমান সাম্রাজ্যের পরাজয় মুসলিম প্রভাবকে কিছুটা খর্ব করলেও ইসলাম ধর্মের প্রসার তেমন ব্যাহত হয়নি। সে কারণে এ যুগ ছিল ইসলাম ধর্মের সাফল্যের ধারাবাহিকতায় পরিপূর্ণ। পরবর্তী সময়ে ইসলামি সভ্যতায় ভাটা নামে। ইউরোপ শক্তিশালী হয়ে পঞ্চদশ শতাব্দী (১৪৯২) থেকে নানা মাত্রায় মুসলিম জগতের ওপর কর্তৃত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়। এই মোড় পরিবর্তনের পর থেকে মুসলিম সমাজের অভ্যন্তরে ক্ষোভ দানা বাঁধতে থাকে। সেই ক্ষোভের তিনটি উৎসকে আজকের দিনের ভয়ংকর 'সামরিকতান্ত্রিক ইসলামের' উৎসমূল হিসেবে বিচার করতে পারি। সেগুলো মুসলিম উম্মার জন্য এসেছে তিনটি প্রধান চ্যালেঞ্জ হিসেবে। সেই চ্যালেঞ্জগুলোর সমাধান বের করতে গিয়ে নানা ধরনের আন্দোলন হয়েছে, যার সঙ্গে আমরা কমবেশি পরিচিত আছি।

প্রথম চ্যালেঞ্জের সঙ্গে মুসলিম সমাজ মুখোমুখি হয় যে সময় থেকে মধ্যপ্রাচ্য বা তার বাইরে নানা দেশ ও সমাজ ধর্মান্তরিত হয়ে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে। তখন দেখা গেল সেসব সমাজে বিদ্যমান আচার-ঐতিহ্য এবং প্রথা ইসলাম ধর্মের

প্রাক্সিসের ওপর প্রভাব রাখতে শুরু করেছে। সে কারণে ঠিক অভিন্ন এবং বিশুদ্ধ ধর্মীয় নিয়মিক কাঠামোর কোনো রূপ কোথাও গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি বা আমরা দেখিনি। ধর্ম এবং স্থানীয় সংস্কৃতির সংমিশ্রণে গড়ে ওঠা এই বিশেষ ধরনের সংশ্লেষণী সংস্কৃতির স্বাক্ষর আমরা লক্ষ করেছি ভারতের মোগল সাম্রাজ্য থেকে শুরু করে অটোমান সাম্রাজ্য, ইন্দোনেশিয়া, মালয়েশিয়াসহ মধ্যপ্রাচ্যের নানা সমাজে। খ্রিষ্টধর্ম এবং ইহুদি ধর্ম যেমন গোত্র প্রথা মেনে চলার ওপর কঠোর বিধান আরোপ করে, ইসলাম ধর্মেও তেমনি নিয়মের বিচ্যুতিকে আমরা কঠোরতা দিয়ে বিচার করতে দেখেছি। যাঁরা ধর্মের বিশুদ্ধতার কথা বলেন তাঁরা ধর্মের প্রাক্সিসের ওপর স্থানীয় সংস্কৃতির এই প্রভাবকে এক জাতীয় বিচ্যুতি হিসেবে বিবেচনা করেছেন। ধর্মীয় অনুশাসনের ওপর স্থানীয় সংস্কৃতি এবং ঐতিহ্যের এই প্রভাবের কারণে ইসলাম ধর্ম পালনে আমরা লক্ষ করেছি নানা বৈচিত্র্য। সে কারণে যে মুসলিম সভ্যতা পরবর্তী সময়ে গড়ে ওঠে সেটি ইসলামকে গৌরবময় করলেও অনেকে তাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করে নেয়নি ওই বিচ্যুতির কারণে। ফলে তার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হয়েছে। সেই প্রতিবাদের একাধিক উদাহরণ আমরা ইতিহাস থেকে পাই। ধর্মের পবিত্রতা রক্ষার আন্দোলনে যাঁরা জীবন দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে প্রখ্যাত দার্শনিক আহমেদ ইবনে হাম্বলের (৭৮০-৮৫৫) নাম প্রথমেই উল্লেখ করতে হয়। বাগদাদের আব্বাসিয় খলিফার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করায় তিনি শাস্তি ভোগ করেছিলেন। ওই একই কারণে ইবনে তাইমিয়াকে (১২৬৩-১৩২৮) দামেস্কের জেলে মৃত্যু বরণ করতে হয়েছে। পরবর্তী সময়ে সালাফি বা সঠিক পথের জন্মদাতা হিসেবে এই দুজন ইসলামের ইতিহাসে বিশেষভাবে পরিচিত। বস্তুত তাদের দেওয়া ইসলামি ব্যাখ্যায় উদ্বুদ্ধ হয়ে সৌদি আরবের মোহাম্মাদ ইবনে আব্দেল ওহাব (১৭০৩-১৭৯২) বিশুদ্ধকরণের আন্দোলন গড়ে তুলেছিলেন এবং সেই ধারার প্রধান নেতা হিসেবে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন। এই ধারাই আজকের 'ইসলামি রাষ্ট্রের' তাত্ত্বিক ভিত।

দ্বিতীয় আরও একটি কারণে মুসলিম সমাজে ক্ষোভের জন্ম হয়েছে। এক কালের গৌরবময় মুসলিম সমাজ ইউরোপীয় উপনিবেশের কঠোর অনুশাসনের অধীনে এসে পতনের মুখোমুখি হয়। সেটি মুসলিম সমাজের জন্য বিশেষ পীড়াদায়ক। সে কারণে ভারতে মোগল সাম্রাজ্যের পতনের পর যে ইউরোপীয় আধিপত্য প্রতিষ্ঠা হয়েছিল সেটি মুসলিমদের মনে আত্মপরিচয়ের গভীর সংকট সৃষ্টি করে গেছে। সেই সংকটের সমাধান হিসেবে নানা পথ, মতের জন্ম হয়েছে। কীভাবে বা কেন মুসলমান সমাজ পতনের শিকার হলো, কীভাবে তারা অমুসলিম শক্তির হাতে পরাধীন হলো তার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানে অনেকেই নিজের জীবন উৎসর্গ করেছেন। স্থানীয় সংস্কৃতির প্রভাব তো বটেই সেই সঙ্গে

ঔপনিবেশিক শাসনের প্রভাব, সেই শাসন থেকে সৃষ্ট আধুনিকতা, জাতীয়তাবাদ (জাতিরাষ্ট্র) এবং ইংরেজি শিক্ষাকে অনেকে ভর্ৎসনা করেছেন এবং তাকেই মুসলিম অধঃপতনের পেছনে কারণ হিসেবে দায়ী করেছেন। ভারতবর্ষে মোহাম্মাদ ইকবাল (১৮৭৭-১৯৩৮), আবুল কালাম আজাদ (১৮৮৮-১৯৫৮), মাওলানা মাদানি (১৮৭৯-১৯৫৭) এবং মাওলানা মওদুদী (১৯০৩-১৯৭৯) এই বিদ্রোহের নেতা হিসেবে পরিচিত। এমনকি এই প্রতিবাদের ঢেউ কেবল ভারতবর্ষকে স্পর্শ করে যায়নি। ভারতবর্ষের বাইরেও এই প্রতিবাদের ঢেউ আমরা প্রত্যক্ষ করেছি। ইরানে মির্জা হাসান সিরাজি (১৮১৫-১৮৯৪), শেখ ফাদুল্লা নুরি (১৮৪৩-১৯০৯), জামাল উদ্দিন আফগানি (১৮৩৮-১৮৮৭), আলজেরিয়ার আমির আবদুল কাদেরের (১৮০৮-১৮৮৩) মতো কিছু নাম এখানে আমরা উল্লেখ করতে পারি। আর যদি ইসলামিক আন্দোলনের কথা ভাবি তাহলে তার মধ্যে রয়েছে মিসরে 'মুসলিম ব্রাদারহুড', মালয়েশিয়ায় 'হিজবুল ইসলাম', ভারতের 'জামিয়াতি উলামা এ হিন্দ' বা 'জামাতে ইসলামি'। প্রথম মহাযুদ্ধ শেষ হওয়ার পর তুরস্কের খিলাফতের অবসান ঘটেছিল। সেটিও কিন্তু মুসলিম সমাজের জন্য কম পীড়াদায়ক ছিল না।

তৃতীয় আরও একটি চ্যালেঞ্জ আছে। সেটি বলতে আমরা ধর্মের মূল আদর্শ থেকে ব্যক্তি পর্যায়ে মুসলমানদের বিচ্যুতিকে বুঝি। এই বিচ্যুতির কারণে মুসলমানরা যে সমাজে বাস করে তাকে অনেকে জাহেলিয়া সমাজ নামে অভিহিত করেছেন। ব্যক্তি পর্যায়ে ওই বিচ্যুতি থেকে কীভাবে মুক্তি পাওয়া যায় তার জন্য নানা আন্দোলন হয়েছে। সেসব আন্দোলনের মধ্যে আমরা নানা ধরনের সমাধানের পথও দেখেছি। অন্যতম একটি পথ হিসেবে অনেকে ব্যক্তির আত্মশুদ্ধির ওপর জোর দিয়েছেন। অনেকে আবার আধুনিক শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। অনেকে একই সঙ্গে জোর দিয়েছেন রাজনৈতিক আন্দোলনের ওপর। তার মাধ্যমে ভাগ্যবদল সম্ভব বলে ধারণা করা হয়েছে। একটি উদাহরণ এ ক্ষেত্রে আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখি। সেটি হচ্ছে সৈয়দ কুতুব (১৯০৬-১৯৬৬) নামে মিসরীয় এক পণ্ডিতের লেখা। কুতুবের জন্ম হয়েছিল ১৯০৬ সালে। ১৯৪০ সালের দিকে দুই বছরের জন্য তিনি যুক্তরাষ্ট্রে গিয়েছিলেন মিসরীয় শিক্ষা বিভাগ থেকে ট্রেনিং নেওয়ার উদ্দেশ্যে। কিন্তু সেখানে ভোগবাদী সমাজের মানসিকতা তাঁকে বিদ্রোহী করে তোলে। দেশে ফিরে তিনি সরকারি পদ থেকে ইস্তফা দেন এবং 'মুসলিম ব্রাদারহুড' নামে সংগঠনে যোগ দেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট নাসের তাঁকে ১৯৬৬ সালে ফাঁসিতে ঝুলিয়ে হত্যা করেন। তাঁর যে লেখাটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য তার নাম 'মাইলস্টোন'। কুতুব সেই লেখায় দাবি করেছেন যে তাঁর দেশের মানুষ মুসলমান হয়েও এমন অজ্ঞতার মধ্যে বাস করছে যে তাকে তিনি জাহেলিয়া বা অজ্ঞতার যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ফলে তাঁর মতে, প্রথমেই

সংগ্রাম করা প্রয়োজন তাদের বিরুদ্ধে যারা ওই অন্ধকারের মধ্যে বাস করছে, যাদের অন্তরে ইসলামের বাণী এখনো প্রবেশ করেনি।

ওই জাহেলিয়া সমাজ থেকে মুক্তি পেতে তিনি চারটি মূল যুক্তি তুলে ধরেন। প্রথমত, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাআলা হচ্ছে সব রাজনৈতিক কর্তৃত্বের মূল। অন্য কোনো বৈধ রাজনৈতিক কর্তৃত্ব পৃথিবীতে নেই। ফলে আল্লাহর আইন ছাড়া কোনো আইন পৃথিবীতে থাকা উচিত নয় বলে তিনি দাবি করেছেন। তার অর্থ হচ্ছে, বিদ্যমান সব রাজনৈতিক কর্তৃত্বকে অবৈধ বলে ধরে নিতে হবে, কেবল সালাফ ছাড়া, যা বলতে কুতুব বুঝিয়েছেন প্রথম প্রজন্মের মুসলমানদের, যারা নবী হজরত মোহাম্মদ (সা.)-এর সাহচর্যে ছিলেন। আর সেই অভ্যন্তরীণ সংগ্রামকে তিনি জিহাদের সঙ্গে তুলনা করেছেন। দ্বিতীয়ত, আল্লাহর অধিকার বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সবকিছুর ওপর। রাজনৈতিকভাবে এর অর্থ দাঁড়ায়, শরিয়া আইন প্রতিষ্ঠা করা, যার আওতায় পড়ে অর্থনীতি, প্রার্থনা, খাবার, ব্যক্তিগত স্বাস্থ্য, বৈবাহিক সম্পর্ক এবং পোশাক। এ ক্ষেত্রে অন্যান্য সব ধর্মের সঙ্গে ইসলাম ধর্মের পার্থক্যকেও তিনি সুনিশ্চিত করেছেন। খ্রিষ্টান ধর্ম বস্তুজগৎকে বাদ দিয়ে আধ্যাত্মিক জগৎ নিয়ে ব্যস্ত থাকে বলে তিনি অভিমত পোষণ করেছেন। অন্য সভ্যতা মানুষের জৈবিক এবং বন্য দিককে গুরুত্ব দেয়। তা ছাড়া রয়েছে বৈষম্যের প্রশ্ন। রোম সাম্রাজ্য এবং ব্রিটিশ সাম্রাজ্য শ্রেণিভিত্তিক সমাজকে উৎসাহিত করেছে, যেখানে মানুষের স্বার্থপরতার দিককে বিশেষ মূল্য দেওয়া হয়েছে। একই দোষে আক্রান্ত যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েত ইউনিয়ন। তারাও বস্তুগত দিককে প্রাধান্য দিয়েছে। এসব সমাজ বা আদর্শের তুলনায় ইসলামি সমাজকে তিনি শ্রেণি ও জাতিভেদবিহীন সঠিক সমাজ হিসেবে মূল্যায়ন করেছেন। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলো কিছু পরিমাণে হলেও আমরা 'ইসলামি স্টেটের' মূল নীতিমালায় প্রতিফলিত হতে দেখি।

সব শেষে আসে জিহাদ-সম্পর্কিত ধারণা এবং একটি ইউটোপীয় ইসলামি সমাজ গড়ে তোলার প্রত্যয়। সে ধরনের সমাজ গড়ে তুলতে সন্ত্রাসের প্রয়োজন হলেও হতে পারে। সে ব্যাপারে কুতুবের মতো আরও অনেক চিন্তাবিদ ছিলেন স্পষ্টবাদী। কুতুবের রচনায় সন্ত্রাসকে ন্যায়সংগত ভাবা হয়েছে। রাজনৈতিক সন্ত্রাস দিয়ে ওই সব প্রতিষ্ঠানকে ধ্বংস করার আহ্বান আছে, যেগুলো মানুষ ও ধর্মের মধ্যবর্তী অবস্থানে বিরাজ করে, যার মধ্যে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ গোটা বিশ্বের ধর্মনিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠানগুলো অন্তর্ভুক্ত। ১৯৪১ সালে মাওলানা মওদুদী ভারতে জামায়াতে ইসলামী প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। কারণ তিনি বিশেষভাবে উদ্বিগ্ন ছিলেন ভারতীয় জাতীয়তাবাদী আন্দোলন নিয়ে। ওই আন্দোলন ভারতকে ধর্মনিরপেক্ষ এবং সব জাতি-গোষ্ঠী নিয়ে গঠিত একটি জাতিরাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা দিয়েছিল। মওদুদী সে কারণে ভারতবর্ষকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জাহেলিয়া প্রত্যয়কে তাঁর

নানা রচনায় ব্যবহার করেছেন। তবে এসব 'বিশুদ্ধবাদী' চিন্তাপ্রবাহের মূল শেকড় হচ্ছে ওহাবি ধারা, যা কিনা ইসলামের অভ্যন্তরে এক বিশেষ ধারা এবং যার জন্ম হয়েছিল সৌদি আরবে। সে কারণে আজকের আতঙ্কবাদকে সঠিকভাবে অনুধাবন করতে হলে এই ধারার সঙ্গে পরিচিত হওয়া জরুরি, যদিও বলে নেওয়া ভালো যে ওহাবি ধারার মধ্যে অতীত কাল থেকে লক্ষ করা গেছে নানা বিবর্তন এবং তার আধুনিক সংস্করণের সঙ্গে অনেক ক্ষেত্রেই আগের সংস্করণের অমিল আছে। আবদুল ওহাবের নেতৃত্বে এই আন্দোলন শুরু হলেও তাঁর আদর্শের সঙ্গে যে জঙ্গিবাদী উপাদানের সংযুক্তিকরণ ঘটেছে, সেটি অতি সাম্প্রতিক কালের। এই ওহাবি আদর্শের কাঠামোটি আমাদের কাছে যে অপরিচিত তা নয়, যার মূল দিকগুলো হচ্ছে: ক. পীরতন্ত্র, মাজার এবং মাজারে নানা ধরনের ভক্তিবাদী তৎপরতার বিরুদ্ধে খ. কোরআন ও হাদিস পড়া এবং তা থেকে শিক্ষা নেওয়া গ. ইসলামের আদি যুগের শিক্ষায় ফিরে যাওয়া ঘ. সুফিবাদ এবং শিয়াবাদের বিরুদ্ধে অবস্থান নেওয়া, যেহেতু তারা বিধর্মী।

জঙ্গিবাদের ধরন

'ইসলামিক স্টেট' নামে যে জঙ্গিবাদের উত্থান আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি সেটি অবশ্য অতীতে সব আন্দোলনের তুলনায় চরিত্রে ভিন্ন। যেসব ক্ষোভ মুসলিম সমাজের মধ্যে রয়েছে এবং যেগুলো ইতিমধ্যে আমরা উল্লেখ করেছি সেগুলোর ঘনায়িত রূপ যে এর মূলে রয়েছে তাতে কোনো সন্দেহ নেই, সে ক্ষোভ অতীতের বা সাম্প্রতিক কালের হলেও হতে পারে। কিন্তু তার প্রকৃত রূপকে বুঝতে হলে ইসলামি রাষ্ট্র সম্পর্কে দুটি কথা না বললেই এখানে নয়। ইসলামিক স্টেট একটি তাত্ত্বিক ভিতের ওপর প্রতিষ্ঠিত। সেখানে ধর্মীয় গ্রন্থ পবিত্র কোরআন থেকে নানা উদ্ধৃতি আছে। কিন্তু ইসলামের ওপর অনেক বিশেষজ্ঞ মনে করেন সেগুলোকে ব্যবহার করা হয়েছে অনেকটা উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে। কখনো তাকে পরিবর্তিত করে, কখনো খণ্ডিত বা আংশিকভাবে ব্যবহার করে অথবা কখনো তার ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে। এসব কৌশল প্রয়োগ করা হয়েছে মূলত নিজেদের অবস্থানকে ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে সংগতিপূর্ণ করে উপস্থাপন করার জন্য। ধর্মগ্রন্থ থেকে উদ্ধৃতির পাশাপাশি এই কাঠামো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে যেসব রচনার আরও ভূমিকা দেখি সেগুলো হচ্ছে আল-কায়েদার নেতা আল জাওয়াহিরির *নাইটস আন্ডার দ্য প্রফেটস ব্যানার*। আরও উল্লেখ করতে হয় আব্দ-আল-আজিজ আল মুকরিনের *আ প্র্যাকটিক্যাল কোর্স ফর গেরিলা ওয়ার* বা আবু মুসাব আল-সুরির *দ্য কল টু গ্লোবাল ইসলামিক রেজিস্ট্যান্স*। এই কৌশলগত কাঠামোর মূলে আরও রয়েছে আবু অবায়েদ আল কোরেশির সম্পাদনায় প্রকাশিত *স্ট্র্যাটেজিক স্টাডিস* নামে একটি পত্রিকা। ওই

পত্রিকায় প্রকাশিত নানা লেখায় তিনি পশ্চিমা গবেষণা থেকে প্রচুর উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছেন। উদাহরণ হিসেবে আমরা বলতে পারি পল কেনেডির *দ্য রাইজ অ্যান্ড ফল অব গ্রেট পাওয়ারস* নামে বিখ্যাত গবেষণাগ্রন্থটি। ওই গ্রন্থ থেকে নানা উদ্ধৃতি ব্যবহার করে প্রমাণ করা হয়েছে যে অতি সত্বর পশ্চিমা সভ্যতার পতন ঘটতে বাধ্য। আরও উল্লেখ করতে হয় উইলিয়াম লিন্ডের *আন্ডারস্ট্যান্ডিং ফোর্থ জেনারেশন ওয়ার* নামের গ্রন্থ। সেখানে আমাদের সমকালীন যুদ্ধের ধরন সম্পর্কে যে নতুন ব্যাখ্যা আছে তাকে ব্যবহার করে ইসলামিক স্টেটের সামরিক কৌশলের মূল কাঠামোর একটি আকৃতি দেওয়া হয়েছে। তবে যে ম্যানিফেস্টো তাদের কার্যকলাপের মূল তাত্ত্বিক ভিত হিসেবে কাজ করে এবং জিহাদিদের আদর্শিকভাবে উদ্বুদ্ধ করে সেটি লিখেছেন আবু বকর নাজি। তাঁর নাম দেওয়া হয়েছে *দ্য ম্যানেজমেন্ট অব স্যাভিজেরি* (২০০৪ সাল)। আফগানিস্তানে তালিবান শাসনের সমাপ্তির পর আল-কায়েদার অন্যতম নেতা আইমান আল জাওয়াহিরি নতুন স্ট্র্যাটেজি এবং সামরিক কৌশল তৈরির একটি নির্দেশনামা প্রচার করেছিলেন, যার প্রত্যুত্তরে এটি লেখা হয়েছিল। সেখানে যেটি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা হচ্ছে, ধর্মীয় অবস্থানের তাত্ত্বিক বিশ্লেষণ এবং সামরিক কৌশলের সঙ্গে তাকে এক করে একটি বিশেষ সংশ্লেষণ তৈরি করা, যা কিনা ইসলামি জিহাদের পরিপূর্ণ এক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে। প্রথমেই আসে সামরিক কৌশলের দিক। ইসলামিক স্টেটের স্ট্র্যাটেজি কী হবে, তার সঙ্গে এখানে মাও সে তুং বা চে গুয়েভারার গেরিলা যুদ্ধের নীতিমালার সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো। যে গেরিলা যুদ্ধের কৌশল এখানে বর্ণনা করা হয়েছে সেটি *দ্য ওয়ার অব দ্য ফ্লি* গ্রন্থ থেকে নেওয়া, যার লেখক হিসেবে রবার্ট ট্যাবের বেশ খ্যাতি রয়েছে। আবু বকর নাজি দেখিয়েছেন যে আজকের দিনে এক জাতীয় নেতৃত্বহীন প্রতিরোধ গড়ে তোলা অনেক বেশি যৌক্তিক। সেখানে কেন্দ্রীয় কোনো সংগঠনের স্থান নেই। কেন্দ্রীয় সংগঠন না থাকার সুবিধা হচ্ছে, জিহাদিরা নিজেরাই স্বাধীনভাবে তাদের দায়িত্ব বুঝে নেবে এবং তাদের আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু কী হবে, সেটি তারাই নির্ধারণ করবে। এই পদ্ধতি যদি প্রয়োগ করা যায়, তাহলে মাঠপর্যায়ে ক্ষমতায়নের সম্ভাবনা সৃষ্টি করা যাবে। সামরিক নানা কৌশলের মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সমরতাত্ত্বিক উইলিয়াম লিন্ডের *ফোর্থ জেনারেশন ওয়ার*-এর এ দেওয়া যুদ্ধের ধারণা, যেটি আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। সেখানে 'চতুর্থ প্রজন্মের যুদ্ধ' সম্পর্কে কথা আছে এবং সেই যুদ্ধে এমন কোনো কৌশল নেই যাকে অবাঞ্ছনীয় মনে করা হবে। ইসলামিক স্টেট এই কৌশলকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দেয়, কারণ সে ক্ষেত্রে শরিয়া আইনের অনুমোদনের প্রয়োজন হয় না। ফোর্থ জেনারেশন যুদ্ধ এমনই এক যুদ্ধ, যা কিনা কেন্দ্রীয়ভাবে পরিচালিত হয় না।

সেটি আল-কায়েদা, হামাস, হিজবুল্লাহর মতো সংগঠনের যুদ্ধকৌশল থেকে আমরা অনুধাবন করতে পারি। সেখানে রাষ্ট্রের একচ্ছত্র আধিপত্য নেই। কারণ যুদ্ধ কেবল রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয় না, তার সঙ্গে সংস্কৃতিও যুদ্ধের একটি ফ্রন্ট হিসেবে কাজ করে। সে কারণে এই যুদ্ধে বিশেষ একটি দিকের ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। ধরে নেওয়া হয়েছে যে যেসব ইউরোপীয় দেশে মুসলমান নাগরিক বাস করে তারা সেসব দেশকে তাদের অধীন করতে পারে, যদি স্থানীয় পর্যায়ে তারা নানা সন্ত্রাসী তৎপরতা গড়ে তোলার দিকে নজর দেয়। মাদ্রিদে যে বোমা বিস্ফোরণ হয়েছিল তার সঙ্গে এই স্ট্র্যাটেজির বিশেষ সাদৃশ্য লক্ষ করার মতো। কিন্তু এসব সত্ত্বেও যেটি আরও গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত সেটি হচ্ছে, মুসলিম দেশগুলোতে মার্কিন সেনাবাহিনীর উপস্থিতি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে এসব স্থানীয় পর্যায়ের যুদ্ধে জড়ানো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তার ফলে এই বৃহৎ ও ক্ষমতাবান সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্তঃসারশূন্যতা ধরা পড়বে। রক্তক্ষরণের কারণে তার বিনাশ সহজ হবে। ফলে কৌশলগতভাবে ইসলামিক স্টেট এমন পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে চায়, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নিজেই বাধ্য হবে ওই সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়তে।

এই 'ফোর্থ জেনারেশন' যুদ্ধের ধারণাকে বাস্তব ও আধুনিক রূপ দেওয়া হয়েছে *দ্য ম্যানেজমেন্ট অব স্যাভিজেরি*তে। সেখানে বিশেষ তিনটি ধাপ আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। সেই ধাপগুলো বাস্তবায়নের মধ্য দিয়ে ইসলামি জিহাদ পরিপূর্ণতা লাভ করবে বলে ইসলামিক স্টেটের নেতৃত্ব আশা করে। প্রথম ধাপকে বলা হয়েছে *রিজিয়নস অব স্যাভিজেরি*। তার অন্য আরও একটি নাম আছে। সেটি হচ্ছে *পাওয়ার অব ভেক্সেশন অ্যান্ড এক্সজোশন*। এই পর্বে প্রধান কৌশল হচ্ছে উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এক জাতীয় অস্থিতিশীল পরিবেশ তৈরি করা। তারপর চরম হিংস্রতা দেখিয়ে সবকিছুকে ধ্বংস করা, নিঃশেষিত করা। এর ফলে স্থানীয় প্রশাসন সম্পূর্ণ ভেঙে পড়বে, বিশেষ করে মনোবলের দিক থেকে। এটি সম্পন্ন হলে পরের ধাপকে বাস্তবায়ন করা সম্ভব। সেই ধাপকে *অ্যাডমিনিস্ট্রেশন অব স্যাভিজেরি* বলা হয়েছে। সেখানে জিহাদিদের নিয়ে বর্বর প্রশাসন প্রতিষ্ঠা করার উল্লেখ আছে। এই বর্বরতার অভিঘাতে বিশেষ করে নিজের নিরাপত্তার কথা ভেবে সাধারণ জনগণ জিহাদিদের প্রতি আনুগত্য দেখাতে বাধ্য হবে এবং তাদের শাসন মেনে নেবে (বর্বরতাকে প্রতিষ্ঠিত করা)। 'ইসলামিক স্টেট' এখানে একটি বিশেষ প্রত্যয়ের ওপর গুরুত্ব দেয়, যাকে তারা *পেয়িং দ্য প্রাইস* বলে থাকে। তার অর্থ হচ্ছে পুরোনো অনৈসলামিক রাষ্ট্রের প্রশাসনে নিযুক্ত ব্যক্তিদের পাপের প্রায়শ্চিত্ত করার সুযোগ করে দেওয়া। তার অর্থ অবশ্য আরও সন্ত্রাস। সেই সন্ত্রাসী অবস্থা প্রতিষ্ঠিত করার ক্ষেত্রে যেন কোনো দুর্বলতা না দেখানো হয় তার প্রতিও সতর্ক নির্দেশ আছে। এই পর্যায়ে বন্দীদের

নির্বিশেষে হত্যা করা হবে, যেন ভীতির এক প্রবাহ সবাইকে গ্রাস করে। এই সন্ত্রাস হবে নিয়ন্ত্রণহীন, এলোপাতাড়ি, যা জন্ম দেবে ত্রাসের। এরপর আসে তৃতীয় এবং সর্বশেষ ধাপ বা যাকে বলে *পাওয়ার অব এসটাবলিশমেন্ট*। এই পর্যায়ে বর্বর প্রশাসনের পরিবর্তে সালাফি মতাদর্শের ওপর প্রকৃত ইসলামি রাষ্ট্র গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু করা মূল লক্ষ্য। বর্বরতার চরম অভিঘাতে মানুষ ইসলামি জিহাদে অংশ নিতে বাধ্য হবে। কারণ সেখানে তাদের জীবন-মরণের প্রশ্ন জড়িত। এ পর্যায়ে ইসলামি রাষ্ট্র প্রত্যেক মুসলমানকে তাদের ঘর থেকে বেরিয়ে বিধর্মীদের হত্যার আহ্বান জানাবে। যোদ্ধা নয় এমন কাউকে হত্যা করায় কোনো বাধা নেই। যদিও শাহরিয়ার সিদ্দিকী নামে একজন ইসলামি চিন্তাবিদ তাঁর প্রবন্ধে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে ইসলামবিরোধী হিসেবে দেখিয়েছেন। তিনি এই তিনটি পর্যায়কে ইসলামবিরোধী মনে করেছেন। কারণ হজরত মুহাম্মদ (সা.) অযোদ্ধা বা মানুষকে জিম্মি করে প্রতিরোধ করার কথা কখনো বলেননি। তিনি রাতে আক্রমণ করা থেকে বিরত থাকার বিধান রেখে গেছেন, কারণ ঘুমন্ত অবস্থায় মানুষ হত্যা পাপ। শিরশ্ছেদ করা এবং দেহকে টুকরো টুকরো করা বা যুদ্ধবন্দীদের হত্যা করার ওপরও হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর নিষেধাজ্ঞা ছিল বলে তিনি দাবি করেছেন। শাহরিয়ার সিদ্দিকী আরও দেখিয়েছেন (ফেব্রুয়ারি ২০১৫, পৃ. ৪) ইসলামিক স্টেটের নেতারা পবিত্র কোরআন থেকে উদ্ধৃতি ব্যবহার করেন ঠিকই কিন্তু অসম্পূর্ণ উদ্ধৃতি ব্যবহার করায় সেই উদ্ধৃতির মর্মবাণী সঠিকভাবে প্রতিফলিত হয় না।

এই স্ট্র্যাটেজি যে নানা উপায়ে আজ বাস্তবায়িত হচ্ছে সেটি আমরা সিরিয়ার গৃহযুদ্ধে লক্ষ করি। ইসলামিক স্টেটের বর্বরতার নানা উদাহরণ সেখান থেকে প্রতিনিয়ত আমাদের কানে পৌঁছাচ্ছে। ব্রিটিশ সাংবাদিক রবার্ট ফিস্কের সঙ্গে পাল্মিরায় সিরিয় বাহিনীর একজন ক্যাপ্টেনের আলাপচারিতা থেকে তার একটি নমুনা পাওয়া যায়। সিরিয়ার সেনাবাহিনীর ২৫ জন যুদ্ধবন্দীকে ইসলামিক স্টেটের একজন খুনি এক এক করে গুলি করে হত্যা করে। রবার্ট ফিস্ক ক্যাপ্টেনকে জিজ্ঞেস করেন খুনি কে ছিল? সে কি ধরা পড়েছে? ক্যাপ্টেন উত্তরে বলে, না, তার বয়স ছিল মাত্র ১০ বছর। ঘটনার পর ইসলামিক স্টেটের জিহাদিরা তাকে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। এই দশ বছর বয়সের খুনির পক্ষে ইসলামি আদর্শকে বোঝা বা তার মন ইসলামি শিক্ষায় কতটুকু উদ্বুদ্ধ সে প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয় (ফিস্ক ২০১৬)। বর্বরতার আরও উদাহরণ মেলে তাদের সদ্য প্রকাশিত ভিডিওতে, যার নাম *চেঞ্জিং দ্য সোর্ডস*: পর্ব ৪। কীভাবে ৩৮ জনকে এক এক করে হত্যা করা হচ্ছে, কীভাবে একজন পালিয়ে যাওয়ার সময় গুলি করে হত্যা করা হলো, ঘরে ঢুকে শিরশ্ছেদ করা হলো, লাইন করে বন্দীদের দাঁড় করিয়ে পেছন থেকে গুলি করে মারা হলো,

আইএস যোদ্ধারা শহরের ভেতর দিয়ে গাড়ি চালিয়ে যাওয়ার সময় নির্বিচারে পথযাত্রীদের ওপর গুলিবর্ষণ করল—সেসব অমানবিক দৃশ্যে ওই ভিডিও ভরপুর।

এ ক্ষেত্রে অবশ্য যে প্রশ্নকে এড়িয়ে যাওয়া কঠিন সেটি হচ্ছে বুশ প্রশাসনের ২০০৩ সালে ইরাক আক্রমণ। ওই আক্রমণের পর মার্কিন সেনারা ইরাকি জনগণের ওপর যে বর্বরতা দেখায় আবু গারাইব কারাগারে বন্দীদের ওপর নৃশংস আক্রমণের লোমহর্ষকতা থেকে কিছুটা হলেও আমরা সেটি অনুভব করি। বস্তুত ইসলামিক স্টেট আজ ওই একই ধরনের দ্য ম্যানেজমেন্ট অব স্যাভিজেরি-এর আশ্রয় নিয়েছে, ঠিক যেভাবে মার্কিন বাহিনী ইরাকি প্রশাসনকে সম্পূর্ণভাবে ধ্বংস করে আজকের ইসলামিক রাষ্ট্রের মতো জোন অব স্যাভিজেরি সৃষ্টি করেছিল। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের Shock and Awe নীতির সঙ্গে ইসলামিক স্টেটের কোনো পার্থক্য দেখি না। ওই জোন অব স্যাভিজেরি নিয়ন্ত্রণ করার জন্য মার্কিন প্রশাসক এবং একজন নিওকন হিসেবে পরিচিত পল ব্রেনারকে আনা হয়েছিল। আমেরিকায় বসবাসরত ইরাকি নেতা আহমেদ সালাবিকে ব্যবহার করা হয়েছিল। ব্যবহার করা হয়েছিল মার্কিন সামরিক শক্তিকে। মার্কিন সৈন্যরা নিরীহ পথচারীকে গুলি করে হত্যা করেছে। নিরীহ মানুষকে ক্ষুধার্ত রেখেছে। মানুষকে জিম্মি করেছে নিজেদের ইচ্ছা অনুযায়ী, ওই সব দেশে তাদের মতো করে পরিবর্তন আনতে চেয়েছে। বিদেশের মাটিতে কয়েক দশক ধরে আমেরিকা এ ধরনের সন্ত্রাসী তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। গালফ যুদ্ধের সময় মার্কিন সেনাবাহিনী যখন নির্বিচারে মানুষ হত্যা করছে তখন তৎকালীন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের একটি উক্তি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছিলেন,

> There is another way for the bloodshed to stop, and that is for the Iraqi military and the Iraqi people to take matters into their own hands, to force Saddam Hussein , the dictator, to step aside... (দেখুন The Symbiosis of Savagery, page 4)

তার অর্থ হচ্ছে জর্জ বুশ যুদ্ধ বন্ধ করবে যদি ইরাকিরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইচ্ছা অনুযায়ী তাদের সরকার পরিবর্তন করে। ৬০ মিনিটের সাক্ষাৎকারে ডিপার্টমেন্ট অব স্টেটের তৎকালীন প্রধান মেডেলিন অলব্রাইট বলেছিলেন, ৫ লাখ ইরাকি শিশু মারা গেছে বটে কিন্তু আমি মনে করি এটাই তাদের প্রাপ্য ছিল (The Symbiosis of Savagery, page 5)। Glen Greenwald নামের একজন মার্কিন চিন্তাবিদ ওই উক্তিকে স্মরণ করে লিখেছেন,

> When we invaded Iraq, we called our invasion 'Shock and Awe'. The purpose of it was to do so much violence that we would terrorise the civilian population into submission, to surrendering.

মার্কিন এই নৃশংসতার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল বেসামরিক প্রতিষ্ঠানের ওপর বোমাবর্ষণ, ইরাকের অবকাঠামো ধ্বংস করে দেওয়া, ইউরেনিয়াম ব্যবহার করে প্রাপ্তবয়স্কদের নির্বিচারে হত্যা করা, নৈশ অভিযান চালিয়ে মানুষ হত্যা করা। আজ ওই একই সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছে 'ইসলামিক স্টেট'। যেভাবে আমেরিকার নিওকনরা বিশ্বব্যাপী সন্ত্রাসের পথ ধরে রাষ্ট্রের ক্ষমতা পরিবর্তন করতে উদ্যোগী হচ্ছে, ইসলামি রাষ্ট্র ঠিক একই পথ অনুসরণ করে তার প্রত্যুত্তর দিচ্ছে। এভাবে এক সন্ত্রাস থেকে জন্ম হয়েছে আরও ভয়ংকর এক সন্ত্রাসের। সেদিক থেকে ভাবলে ইসলামিক রাষ্ট্রের স্যাভিজেরি তত্ত্ব (দেখুন Neeva Steve 2015) বস্তুত মার্কিন বাহিনীর বর্বরতার পরোক্ষ ফলাফল এবং সেখানে আমি দুঃখ করি না। কারণ ইসলামিক স্টেটের বর্বরতা মার্কিন বর্বরতার ঠিক উল্টো পিঠ। ইসলামিক স্টেট যুদ্ধ করছে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে। কিন্তু যেটি এ ক্ষেত্রে প্যারাডক্স তা হচ্ছে এসব সহিংসতা থেকে যারা মৃত্যুবরণ করছে বা যারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তারা সাধারণ মুসলিম। তারা সবচেয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হলেও অন্যদিকে উপকৃত হচ্ছে আমেরিকার সামরিক শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো। মধ্যপ্রাচ্যের যুদ্ধ থেকে এ পর্যন্ত তারাই লাভবান হয়েছে সবচেয়ে বেশি। এবং গবেষণা করলে হয়তো দেখা যাবে যেসব নিওকন রাজনীতিবিদ এই যুদ্ধের জন্য দায়ী তারা পরোক্ষভাবে হোক বা প্রত্যক্ষভাবেই হোক ওই সমরশিল্পের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত আছে। ফলে ইসলামিক স্টেটের সাম্রাজ্যবাদ বিরোধিতাও যে ফলপ্রসূ হচ্ছে তা বলা কঠিন।

তবে মার্কিন বর্বরতাকে ইসলামিক স্টেটের উত্থানের পেছনে মূল কারণ ভাবাও যুক্তিযুক্ত নয়। মার্কিন বর্বরতা পরোক্ষ কারণ হতে পারে। কিন্তু আন্দোলন হিসেবে 'ইসলামিক স্টেট' এবং তার সঙ্গে সম্পৃক্ত ইসলামি জঙ্গিবাদের জন্মের মূল কারণ কী সেটি যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়ে আমাদের দেখা প্রয়োজন। দুটি প্রধান ব্যাখ্যা এ ক্ষেত্রে সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য বলে নানা মহলে বিবেচিত হচ্ছে। কোরআনের নানা ব্যাখ্যায় বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান আছে বলে অনেকে দাবি করেন, সেই আহ্বানই জঙ্গিবাদী গোষ্ঠীকে সশস্ত্র সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ করছে বলেও অনেকে মনে করেন। অন্যদিক থেকে আদর্শের ওই গুরুত্বকে বোঝানোর জন্য অনেকে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে হিটলারের বর্বরতার উদাহরণ উল্লেখ করে থাকেন এবং কী কারণে হিটলারের সমর্থকদের মনে ইহুদি নিধন এবং শত্রুর প্রতি চরম নৃশংসতা দেখানোর প্রবণতা স্থান পেয়েছিল সেটি দেখানোর চেষ্টা করেন। Daniel Goldhagen তার *Hitler's Willing Executioner* এ লিখেছেন, হিটলারের সমর্থকেরা বর্ণবাদী তত্ত্বে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল একমাত্র আদর্শের কারণে। তারা তাদের নেতা হিটলারের দেওয়া ব্যাখ্যা, ইহুদি জাতি সম্পর্কে হিটলারের ধারণার যুক্তিসিদ্ধতাকে সঠিক মনে

করে ইহুধি নিধনে অনুপ্রাণিত হয়েছিল। প্রখ্যাত সাহিত্যিক আয়ান হিরসি আলিও সেভাবে ব্যাপারটিকে দেখেন। তাঁর মতে, সন্ত্রাসী গড়ে তোলার ক্ষেত্রে আদর্শের বড় ভূমিকা থাকে। ফলে ইসলাম ধর্মের আহ্বানের মধ্যে জিহাদের যে বীজ নিহিত, তাকে এই জঙ্গিবাদের উৎস হিসেবে অনেকে ধরে নেন। আদর্শ যে মানুষের কার্যকলাপে ভূমিকা রাখে তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মানুষের কাজের সঙ্গে বিশ্বাসের কিছু না কিছু মিল থাকে। বিশ্বাস মানুষকে কাজে উদ্বুদ্ধ করে। ফলে আদর্শের ভূমিকাকে একেবারে বাদ দেওয়া কঠিন। একটি উদাহরণ এখানে সংগত বলে মনে হতে পারে। আমরা যদি মনে করি, ইউরোপের ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ আমাদের সন্তানদের বিপথগামী করছে তাহলে ওই সমাজের বিরুদ্ধে আদর্শগত অবস্থান নিতে আমরা অনেকেই আগ্রহী হব। ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শের বদলে ভিন্ন কোনো ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে অনেকে এমনকি সন্ত্রাসী হলেও হতে পারে। তবে ব্রাউনিং নামে মার্কিন এক গবেষকের মতো অনেকেই আবার আদর্শের ভূমিকাকে খাটো করে মানুষের মনস্তাত্ত্বিক দিকের প্রতি জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন। তিনি তাঁর 'অর্ডিনারি ম্যান'-এ আদর্শের চেয়ে অবস্থানগত কারণকে (situational factors) এ ধরনের সন্ত্রাসী উন্মাদনায় প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য দায়ী করেছেন। গ্রুপের প্রতি আনুগত্য, প্রশংসিত হওয়ার তাড়না বা কাজের ক্ষেত্রে প্রমোশন লাভের আকাঙ্ক্ষা বা নিজেকে দুর্বল না ভাবার মতো মনস্তাত্ত্বিক উপাদানগুলোর ভূমিকাকেও বাদ দেওয়া যায় না।

জঙ্গিবাদ এবং পবিত্র কোরআন

তবে যদি ধরে নেওয়া হয় যে ইসলামি আদর্শই ইসলামি রাষ্ট্রের মূল চালিকাশক্তি তাহলে জঙ্গিবাদের উত্থানকে পবিত্র কোরআন বা কোরআনের নানা ব্যাখ্যা থেকে বাদ দেওয়া কঠিন। পবিত্র কোরআনের একটি আয়াতে আছে :

> And kill them wherever you find them, and turn them out from where they have turned you out. And Al-Fitnah [disbelief or unrest] is worse than killing... but if they desist, then lo! Allah is forgiving and merciful. And fight them until there is no more Fitnah [disbelief and worshipping of others along with Allah] and worship is for Allah alone. Quran (2:191-193)।

তবে এ কথা সত্য যে জিহাদ শব্দকে নানাভাবে নানা মহল ব্যবহার করে থাকে এবং তা নিয়ে বিভ্রান্তি আছে। অনেকে মনে করেন জিহাদ বলতে মূলত আত্মশুদ্ধি বোঝায়, ঠিক যে আত্মশুদ্ধির কথা মনে রেখে প্রাচীন গ্রিক দার্শনিকেরা নিজেকে জানার (know thyself) উপদেশ দিয়ে গেছেন। জিহাদের ব্যাখ্যা পরিবর্তিত

হয়েছে যুগের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। আজকাল জিহাদ বলতে আত্মশুদ্ধি না বুঝিয়ে বিধর্মীদের বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামকে বোঝায়। তবে বিধর্মী কে সেটিও অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট থাকে। বিধর্মী হতে পারে শিয়া সম্প্রদায়। কারণ শিয়া সম্প্রদায় মাজার শরিফে প্রার্থনা অনুমোদন করে। কারবালার করুণ কাহিনিকে নাটকীয় করে রাজপথে শোভাযাত্রা করে, যা কিনা বিশুদ্ধ ধর্মীয় অবস্থানের বিপরীত বলে অনেকে মনে করেন। সেই সঙ্গে আরও রয়েছে সুফিবাদের ভক্ত গোষ্ঠী। তাদেরও বিধর্মী হিসেবে ধরা হয়, এমনকি যারা মুসলমান কিন্তু ধর্মীয় নেতৃত্বের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করেনি তারাও বিধর্মী। বিধর্মী হতে পারে ইয়াজিদি, খ্রিষ্টান, হিন্দু, বৌদ্ধ, ইহুদি। মোট কথা কিছু সীমিত সংখ্যক আত্মনিবেদিত মুসলমান ছাড়া বাকি সবাই 'ইসলামিক স্টেটের' সংজ্ঞায় বিধর্মী। এসব কারণে ইসলাম ধর্মকে অতীতে ও বর্তমানকালে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হতে হয়েছে বা হচ্ছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে ইসলামকে একপর্যায়ে যুদ্ধের ধর্ম হিসেবে দেখা হতো। ১৯২৬ সালে স্বামী সারদানন্দ নামে একজন উগ্রপন্থী ধর্মীয় নেতা একজন মুসলমানের হাতে নিহত হয়েছিলেন। এই হত্যা ভারতে বিশেষ আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং ইসলাম ধর্মকে তীব্র ভাষায় সমালোচনা করা হয়। অভিযোগ করা হয় যে ইসলাম নিজের প্রচারের কাজে তলোয়ারের ওপর নির্ভর করে। সে সময় অবশ্য মাওলানা মওদুদী ইসলামের পক্ষে অবস্থান নিয়ে কিছু লেখা প্রকাশ করেন। তিনি সেখানে ইসলাম যে শান্তির ধর্ম সেটি প্রমাণ করেছিলেন কোরআন ও হাদিস থেকে নানা উদ্ধৃতি ব্যবহার করে। ইসলাম শান্তির ধর্ম হিসেবে ধরে নিতে হবে, যারা শান্তির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেয় তারা যেমন মুসলিম, তেমনি যারা সশস্ত্র জিহাদের কথা বলে তারাও কিন্তু মুসলিম। অর্থাৎ কোরআন শরিফে দুটি বিষয়ই থাকায় নিজের পছন্দমতো করে কোনো একটির পক্ষে দাঁড়ানো অনেকের পক্ষে সম্ভব হয়। এই দুই ধরনের অবস্থান—শান্তি ও জিহাদ—গড়ে উঠেছিল সম্ভবত নানা পরিস্থিতির কারণে। ধর্ম প্রচারের সময় হজরত মুহাম্মদ (সা.) নানা সময়ে নানা বিরোধিতার মুখোমুখি হয়েছেন। তাঁকে নানা অনুকূল ও প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে কখনো তাকে ভয়ংকর যোদ্ধা হতে হয়েছে এবং নবজাত ইসলামের শত্রুর বিরুদ্ধে যোদ্ধার ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হয়েছে। কখনো শান্তির বাণী দিয়ে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন ইসলামের গ্রহণযোগ্যতাকে। ইসলামের ইতিহাসে সে কারণে যেমন রয়েছে মদিনার সনদ, তেমনি রয়েছে শত্রুকে ধ্বংস করার আহ্বান। ফলে ইসলামিক স্টেটের পক্ষে যারা জিহাদে যোগ দিয়েছে তাদের বিধর্মী বলা কঠিন। যারা আইসিস বা ইসলামিক রাষ্ট্রের যোদ্ধা বা নেতৃত্বে আছে তারা সঠিক মুসলমান কেন নয়, সেটিও প্রমাণ করা কঠিন।

২০১৫ সালের মার্চ মাসে *দ্য আটলান্টিক* পত্রিকায় প্রকাশিত What the ISIS Wants নামে প্রবন্ধে গ্রাহাম উড ইসলাম ধর্মের সঙ্গে জঙ্গিবাদের প্রত্যক্ষ সম্পর্ক তুলে ধরেছেন। অনেকে ইসলামিক স্টেটের সমর্থক জিহাদিদের সঠিক মুসলিম হিসেবে দেখার বিপক্ষে, কারণ তাদের মতে তারা ধর্মীয় আদর্শের অপব্যাখ্যা করে, অপব্যাখ্যা দিয়ে উগ্র প্রথাকে যুক্তিসিদ্ধ করে। কিন্তু তা সত্ত্বেও Bernard Haykel নামে প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন অধ্যাপক দাবি করেছেন, যারা ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধা তারাই হচ্ছে ইসলামের সঠিক প্রবক্তা। কারণ বাস্তব জীবনে মুসলিমরা যা কিছু করে সেটিই ইসলাম (Dagli 2015)। অর্থাৎ ধর্মের ক্ষেত্রে আদর্শ বা সেই আদর্শের সঠিকতা বলে কিছু নেই। ধর্মের অনুসারীরা যা করে তাই ধর্ম। দৃষ্টিভঙ্গিটি সঠিক বলে মনে করার কারণ নেই। সমাজে নানা ধরনের মানুষ নানা কারণে ইসলাম ধর্মকে ব্যবহার করতে পারে। সেসব কারণের মধ্যে রাজনীতি অন্যতম বলে আমরা জানি। তাহলে কি উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ধর্মের ব্যবহার বা অবমাননা, যা-ই বলি না কেন তাকেই কি সত্যিকার ইসলাম বলে ধরে নিতে হবে? আরও যে জটিলতা নেই তা নয়। হজরত মুহাম্মদ (সা.) যে পরিবেশে যে জীবন কাটিয়েছেন তার দেওয়া প্রতিটি উপদেশ বা আদেশকে সেই পরিবেশ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখা কঠিন। পরিপ্রেক্ষিত থেকে ছিন্ন করে তার উপদেশের মর্মবাণী বোঝাও কঠিন। কোনো কোনো হাদিসের সত্যতা নিয়েও ইসলামি চিন্তাবিদদের মধ্যে মতবিরোধ আছে। ইবনে খালদুন থেকে শুরু করে ইসলামের নানা পণ্ডিত ব্যক্তি সে কারণে হাদিসকে দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন—সঠিক এবং সঠিক নয় হিসেবে। ইসলামিক রাষ্ট্র হাদিস বা কোরআনের বাণী ব্যবহার করে। কিন্তু তারা ব্যবহার করে যেগুলো তাদের জঙ্গি এবং উগ্রবাদী রাজনীতির উদ্দেশ্যকে তুলে ধরতে সাহায্য করে। ইসলামিক স্টেট মূলত হাদিস থেকে নেওয়া উদ্ধৃতি ব্যবহার করে থাকে। তাদের বাক্য বিন্যাসে ধর্মীয় নানা শব্দ ও নিয়মাবলি উপস্থিত থাকে এবং তারা ওই বহুমুখী ইসলামি ব্যাখ্যার সুযোগ নেয়। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে তারা ইসলামের ওপর সত্যিকার জ্ঞানী। রবীন্দ্রনাথের কাব্যভান্ডার থেকে নানা শব্দ ও বাক্য বা কথোপকথন মুখস্থ করে ব্যবহার করার অর্থ এই নয় যে কেউ রবীন্দ্রসাহিত্যের ওপর পণ্ডিত হয়ে গেছে। খ্রিষ্টান ধর্মের প্রসঙ্গকেও ওই একইভাবে বিচার করা যায়। যারা মধ্যযুগে খ্রিষ্টানদের বিরুদ্ধে ইসলামিক স্টেটের মতো একই ধরনের অত্যাচার করেছে, বিচার করেছে, হত্যা করেছে তারা কি খ্রিষ্টান ছিল না? যারা ইনকুইজিশনের মাধ্যমে অনেককে মৃত্যুর মুখে পাঠিয়েছে তারা কি চার্চের সঙ্গে যুক্ত ছিল না? অনেক ক্ষেত্রে ভ্যাটিকানের অনুমোদন নিয়ে ওই ধরনের সন্ত্রাসী কাজ চালানো হয়েছে। মধ্যযুগে ধর্মের যে ব্যাখ্যা ভ্যাটিকান দিয়েছে এবং নানা ধরনের উৎপাত অত্যাচার করেছে সেটি তারা করেছে খ্রিষ্টান হিসেবেই। সেটি

করতে হয়েছে সময়ের দাবি অনুযায়ী, বিশেষ সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়ে। ফলে যেটি আমাদের বোঝা প্রয়োজন তা হচ্ছে ধর্মের বাণী বিশুদ্ধ আকারে আমাদের হাতে আসে কিন্তু আমাদের বাস্তব জীবন বিশুদ্ধ নয়। ধর্মের বিশুদ্ধ বাণী বিশুদ্ধ নয়, এমন বাস্তবতার সংস্পর্শে এসেই কেবল সমাজে স্থান করে নেয়। ফলে যত বিশুদ্ধই হোক বা যত বিশুদ্ধ ধর্মীয় জীবনের কথা আমরা বলি না কেন ধর্ম পালনে একধরনের বিশুদ্ধ ও কলুষিতের মিশ্রণ ঘটার যথেষ্ট সুযোগ থেকে যায়, যাকে বলা যেতে পারে a mixture of the sacred and the profane অথবা profanation of the sacred।

সে কারণে আমাদের নানা ধরনের অসংগতির মুখোমুখি হতে হয়। কেবল এখন নয়, অতীতেও। ধর্মকে কেন্দ্র করে নানা ধরনের মিথ্যাচারিতার আশ্রয় নেওয়া সম্ভব হয়েছে বা হচ্ছে। সেই অসংগতির নানা উদাহরণের সঙ্গে আমরা আমাদের বাস্তব জীবনে মুখোমুখি হই। যেমন আদি ওহাবি আন্দোলন সৌদি আরবে জন্ম নিয়েছিল। ওই আন্দোলন একসময় অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান জানিয়েছিল। অটোমান সাম্রাজ্যকে আমরা ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে জেনে এসেছি। ওই বিরোধিতা কেন করা হয়েছিল বা তার যৌক্তিকতা কতটুকু ছিল তা নিয়ে প্রশ্ন থাকা স্বাভাবিক। সে সময় অবশ্য কারণ দেখানো হয়েছিল যে অটোমান সুলতান খিলাফতকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিতে ব্যর্থ হয়েছে। সে কারণে তাকে সত্যিকার অর্থে ইসলামি বলা সংগত ছিল না। কিন্তু মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক, যেটি আমরা পরবর্তী সময়ে লক্ষ করব। দ্বিতীয় বড় অসংলগ্ন সৌদি রাজতন্ত্রের অবস্থানগত নানা সিদ্ধান্তে। সৌদি আরব সরকারিভাবে ইসলামি রাষ্ট্রের সন্ত্রাসকে বরাবর অস্বীকার করে এসেছে। বর্তমানে সৌদি আরবের বাদশাহ প্রিন্স সালমান ২০০৭ সালে বিদায়রত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত জেমস অবেরওয়েটারকে বলেছিলেন, 'সন্ত্রাসবাদ বা মৌলবাদ ইসলামকে অন্য সবকিছুর চেয়ে সবচেয়ে বেশি ক্ষতি করছে। এটিই সৌদি পরিবারের প্রকৃত অবস্থান' (Chomsky, 2015)। এই একই কথা আমরা শুনেছি বাদশাহ আবদুল্লার কাছ থেকে। মৃত্যুর কিছু আগে তিনি মিসরের মুসলিম ব্রাদারহুড এবং ইসলামিক স্টেটকে ভর্ৎসনা করে গেছেন। কারণ তাঁর ধারণায় তারাই ইসলামকে হাইজ্যাক করেছে এবং তাকে ঘৃণার ধর্ম হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রচার করছে। অথচ ওহাবি ইসলামের যে বিশেষ ধারার প্রতি ইসলামিক স্টেট অনুগত এবং যার সঙ্গে আল-কায়েদার নেতা ওসামা বিন লাদেনের যোগসূত্র প্রবল সেই ওহাবি আদর্শ বস্তুত অর্থে সৌদি আরবের ইসলামি শাসনব্যবস্থা এবং শরিয়া আইনের মূল ভিত। মার্কিন কংগ্রেসের অত্যন্ত গোপন দলিলে আল-কায়েদা সন্ত্রাসী জাকারিয়া মুসায়ি বলেছেন যে নয়-এগারো টুইন টাওয়ারে আঘাত হানার বেশ অনেক কাল আগে থেকে সৌদি

আরব সুন্নি উগ্রবাদীদের মধ্যে বিপুল অর্থ বিলি করেছে। এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে বসবাস করা উগ্রপন্থীরা (Chomsky 2015)। আঞ্চলিক রাজনীতিতে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বে ইরানের বিপরীতে নিজেকে সুন্নি সম্প্রদায়ের মুখপাত্র হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে সৌদি আরব ওহাবি আদর্শকে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার কাজে লিপ্ত রয়েছে। ওহাবি আন্দোলন গড়ে উঠেছিল পবিত্র কোরআনের বিশেষ ব্যাখ্যা থেকে, যার প্রণেতা ছিলেন আবদুল ওহাব। কিন্তু ওহাবের ব্যাখ্যায় অনেক ভালো দিক ছিল যেগুলো কালের পরিবর্তনে বিশেষ করে রাজনৈতিক কারণে পরবর্তী সময়ে বাতিল করা হয়েছিল। ওহাব পবিত্র কোরআনে যে ন্যায়ভিত্তিক অর্থনীতি গড়ে তোলার নির্দেশ আছে তার ভিত্তিতে অর্থনীতিকে সমতা এবং সম্মানের ওপর প্রতিষ্ঠিত করার ওপর জোর দিয়েছিলেন। মুসলিম উম্মাহর রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা এবং মঙ্গলভাবনা কোরআনের মূলে থাকায়, তার মতাদর্শে দরিদ্র নিপীড়িত মানুষের স্বার্থে রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি থেকে মুক্ত রাখার নির্দেশনা আছে। এই দিকগুলো আবদুল ওহাব বিশেষ করে তুলে ধরেছেন এবং এ পর্যন্ত ইসলামের যেসব ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে সেগুলোকে বর্জন করে তার মত বিশ্বাসে আসার আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর এই মতবাদে আরও ছিল যুদ্ধবন্দীদের হত্যা বন্ধ করার নির্দেশ, বিনা কারণে সম্পত্তি ধ্বংস করার ওপর কঠোর নিষেধাজ্ঞা, সাধারণ মানুষ নারী ও শিশুদের হত্যার ওপর নিষেধাজ্ঞা। তিনি আরও ঘোষণা দেন যুদ্ধে যারা মারা গেছে তাদের শহীদ হিসেবে দেখা বা তারা বেহেস্তে যাবে, এ ঘোষণা দেওয়া ভুল। কারণ তাঁর ধারণায় এর মধ্য দিয়ে আত্মগরিমা প্রকাশ পায়। সে কারণে ওহাব নিজেও তকফির দেওয়ার বিপক্ষে ছিলেন। তাঁর মতে, একমাত্র আল্লাহ তাআলা মানুষের মন বুঝতে পারে, মানুষের মনের অন্তর্নিহিত চরিত্র জানে, এই ছিল তাঁর অবস্থান। সে কারণে কাউকে কাফের বলাও তিনি সঠিক মনে করেননি। আজকের দিনের ওহাবি ইসলামি ব্যাখ্যা বা প্রয়োগের সঙ্গে যে এর অনেক বৈসাদৃশ্য আছে, সেটি বলার অপেক্ষা রাখে না।

কারণ আদর্শ সর্বকালে বিবর্তনের মধ্য দিয়ে যায়, বিশেষ করে যখন রাষ্ট্রের কৃতকর্মের ব্যাখ্যা হিসেবে তাকে ব্যবহার করা হয়। সেটি কেবল ওহাবি আদর্শে নয়, অন্যান্য আদর্শের ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ করি। সমাজতান্ত্রিক আদর্শ মার্ক্স, এঙ্গেলস, লেনিন, ট্রটস্কি, বার্নস্টেটনের হাতে পরিবর্তিত হয়ে একে অপরের বিরোধী আদর্শে পরিণত হয়েছিল। এই কথাটি ১৯৩০ সালে প্রকাশিত লুইস নামিয়ের (Lewis Namier) তাঁর লেখা *ইংল্যান্ড ইন দ্য এজ অব দ্য আমেরিকান রেভল্যুশন* (*England in the Age of the American Revolution*) গ্রন্থে আমরা উল্লেখ হতে দেখি। ওহাবি আন্দোলন ইসলাম ধর্মের বিশুদ্ধতা দাবি করে আন্দোলনে নামলেও সৌদি রাজতন্ত্র ওতপ্রোতভাবে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত হওয়ায়

সময়ের ব্যবধানে সে আদর্শ পরিবর্তিত হয়েছে রাজতন্ত্রের স্বার্থকে রক্ষা করতে গিয়ে। ওহাবি ইসলাম বাস্তব জীবনে দুই ধারায় গড়ে ওঠে। প্রাথমিক পর্যায়ে ওহাব জোর দিয়েছিলেন শিক্ষা, পড়াশোনা এবং বিতর্কের ওপর। কিন্তু বাদশাহ ইবনে সাউদের হাতে এসে সেই জ্ঞান শক্তিভিত্তিক মতাদর্শ তলোয়ারের ধর্মে পরিণত হয়েছিল। ওহাবের মৃত্যুর পর রাজতন্ত্রের আদর্শে পরিণত হয়ে ওহাবি আদর্শ সন্ত্রাসের আশ্রয় নেয়। কারণ সৌদি আরবে রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা সন্ত্রাস ছাড়া সে সময় সম্ভব ছিল না। কীভাবে ওহাবি আদর্শে সন্ত্রাসী উপাদান সংযুক্ত হয়েছিল, সেটি সৌদি রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে আমরা লক্ষ করি। প্রথম মহাযুদ্ধের পর আবদুল আজিজ ওহাবি মতাদর্শের ওপর নির্ভর করে বেদুইন গোত্রদের নিয়ে এক বিশেষ বাহিনী গড়ে তোলেন। তাঁর লক্ষ্য ছিল মধ্যপ্রাচ্যে বিশাল সাম্রাজ্য গড়ে তোলা। যে বেদুইন বাহিনী তাকে সাহায্য করেছিল তাকে Ikhwan Brotherhood নাম দেওয়া হয়েছিল। কারেন আর্মস্ট্রংয়ের মতে, এই বাহিনী বস্তুত আজকের 'ইসলামিক স্টেটের' মূল শেকড়। সৈয়দ কুতুব বা হাসান আল বান্না নামে যে ইসলামি চিন্তাবিদের নাম আমরা আগেই উল্লেখ করেছি, তাঁরাও ১৯২৮ সালে যে রাজনৈতিক ইসলামি সংগঠন গড়ে তোলে তাকে ইখওয়ান নাম দিয়েছিলেন (দেখুন Asyraf Rahman & Nooraihan Ali 2012)। ইখওয়ান আন্দোলন প্রথমে বেদুইনদের যাযাবর জীবন থেকে সরিয়ে এনে স্থায়ীভাবে বসবাসের ব্যবস্থা করে দেয়। যাযাবর জীবন ওহাবি ধারণায় ইসলামবিরোধী। সেখানে তারা কৃষিকাজের সঙ্গে পরিচিত হয় এবং ওহাবি মতবাদে দীক্ষা নেয়। যাযাবর অবস্থায় বেদুইনরা গরু ছাগল উট অপহরণ করত। একে ghazu বলা হতো। কিন্তু জিহাদি আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে তারা হিংস্র হয়ে ওঠে। এরা যুদ্ধ করত তলোয়ার দিয়ে, কারণ হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর সময়ে তলোয়ার ছাড়া অন্য কোনো অস্ত্রের ব্যবহার ছিল না। গাজু ঐতিহ্যে বেদুইনরা কখনো বেসামরিকদের হত্যা বা আক্রমণ করেনি। কিন্তু ইখওয়ানরা অস্ত্রবিহীন গ্রামবাসীদের হত্যা শুরু করে। বন্দীদের গলা কেটে হত্যা করা এবং নারী-শিশুদের হত্যা করা তাদের অভ্যাসে পরিণত হয়। ১৯১৫ সালে আবদুল আজিজ হিজাজ নামে এলাকাকে (যেখানে মক্কা ও মদিনা অন্তর্ভুক্ত) নিয়ে পারস্য, সিরিয়া ও জর্ডান দখলের পরিকল্পনা করে। কিন্তু ইখওয়ানরা আরও এক ধাপ এগিয়ে ব্রিটিশের অধীনে থাকা ইরাক, কুয়েত ও জর্ডান আক্রমণ করে। তারা আবদুল আজিজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে, কারণ বাদশাহ আজিজ টেলিফোন, মোটর গাড়ি, টেলিগ্রাফ, সংগীত ও ধূমপানের অনুমতি দিয়েছিলেন, যেগুলো হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর আমলে ছিল না। ১৯৩০ সালে আবদুল আজিজ এই বিদ্রোহ দমন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

সরকারি মতাদর্শে পরিণত হওয়ার পর জিহাদি ধারণা পরিত্যাগ করে ওহাবি আদর্শ একধরনের রক্ষণশীল ইসলামি ধারায় পরিণত হয় কিন্তু ইখওয়ানের স্পিরিট সৌদি আরবে ধ্বংস হয়নি। সেটি সৌদি সরকারি মতাদর্শে আমরা লক্ষ করি। ১৯৭৩ সালে তেলের দাম বৃদ্ধি পাওয়ার পর যে বিপুল পেট্রোডলার সৌদি সরকারের হাতে জমা হয়েছিল সৌদি আরব ওহাবি মতাদর্শ প্রচারের কাজে ওই অর্থ ব্যবহার করতে থাকে। সৌদি আরবের মুসলিম ওয়ার্ল্ড লীগ সারা বিশ্বে আজ ওই জিহাদি মতবাদ প্রচার করছে। কোরআনের ওহাবি অনুবাদ সারা বিশ্বে বিতরণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে প্রচার করা হচ্ছে ওহাবি মতাদর্শের সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ অন্যান্য মতবাদ বিশেষ করে মওদুদী এবং কুতুবের লেখা রচনাগুলো। সৌদি ধাঁচের মসজিদ নির্মাণে অর্থ দেওয়া থেকে শুরু করে মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠা, সেখানে গরিব ছাত্রদের থাকা-খাওয়া এবং বাসস্থানের ব্যবস্থা এবং ওহাবি মতাদর্শে দীক্ষা দেওয়া আজকের সৌদি কৌশলের অন্যতম রূপ। সৌদি আরব নানা মুসলিম ও অমুসলিম দেশে ওহাবি আদর্শের আদলে নানা ধরনের চ্যারিটি এবং রয়্যাল ট্রাস্ট গড়ে তুলেছে। মিলিয়ন মিলিয়ন ডলার ব্যয়ে ১৫০০ মসজিদ, ২১০টি মুসলিম সংস্কৃতি কেন্দ্র, ২০২টি ইসলামি কলেজ, ২০০ মাদ্রাসা নির্মাণ করা হয়েছে, যেখানে ৪০০০ শিক্ষক নিয়োজিত আছেন। ওহাবি মতবাদে বিশ্বাসীদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে সৌদি আরবের তিন-চতুর্থাংশ প্রকাশনার ভার। ২০০১ সালের পর যুক্তরাষ্ট্রের ১২০০ মসজিদের প্রায় ৮০ শতাংশ সৌদি টাকায় নির্মিত হয়েছে। ২০১১ সালের পর ফ্রান্সে মসজিদ নির্মাণে ব্যয় করা হয়েছে সৌদি টাকা। বসনিয়ায় কিং ফাহাদ মসজিদ সৌদি টাকায় নির্মিত। ইতালির ৬০ শতাংশ মসজিদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে সৌদি ওহাবি আদর্শের মানুষ। কাজাখস্তানে মক্কাভিত্তিক বিশ্ব মুসলিম লীগ নানা মসজিদ নির্মাণ করেছে। ভারতীয় গোয়েন্দা বিভাগের মতে, সৌদি আরব অন্তত ২৪৪ মিলিয়ন ডলার ব্যয় করেছে মসজিদ ও ইসলামিক কেন্দ্র নির্মাণে। বাংলাদেশ এ ক্ষেত্রে কোনো অংশে ব্যতিক্রম নয়। মুসলিম দেশ থেকে নেওয়া যেসব শ্রমিক সৌদি আরবে কাজ শেষ করে দেশে ফিরে আসে তারাও ওহাবি ইসলাম প্রচারে কাজ করে। তাদের অর্থ থেকে যেসব শপিং মল নির্মাণ করা হয়, সেখানে থাকে নারী-পুরুষের জন্য আলাদা ব্যবস্থা। ফলে আজ এমন এক প্রজন্মের জন্ম হচ্ছে যারা ওই ওহাবি আদর্শে দীক্ষিত হচ্ছে এবং যারা অন্য ধর্মবিশ্বাসের প্রতি সহনশীল নয়। এই আদর্শের পরিমণ্ডল এমনই যে এরই অভ্যন্তরে জঙ্গিবাদ ও অসহনশীল নানা মতাদর্শ জন্ম নিতে বাধ্য।

এ ক্ষেত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে ধোয়া তুলসী পাতা ভাবা যায় না। ভূকৌশলগত স্বার্থের দিকে লক্ষ রেখে তারা সৌদি ওহাবি আদর্শ বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে, যদিও পরোক্ষভাবে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের

এই তৎপরতা বিশেষভাবে লক্ষণীয় ছিল সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে স্নায়ুযুদ্ধের সময়, বিশেষ করে ১৯৭৬ এবং ১৯৯১ সালের মধ্যবর্তীকালে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারি প্রতিষ্ঠান US Agency for International Development ১৯৮৪ থেকে ১৯৯৪ সালের মধ্যবর্তী সময়ে আফগানিস্তানের স্কুলে পাঠ্যপুস্তক বিতরণের জন্য ৫১ মিলিয়ন ডলার অনুদান দিয়েছিল। তখন পাকিস্তানে জেনারেল জিয়ার শাসন চলছে এবং আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখল বলবৎ আছে। সোভিয়েত দখলকালে আঞ্চলিক মুজাহিদিনদের এসব বই (১০০ পৃষ্ঠা এবং সেখানে ৪৩টি হিংস্রতাসম্পন্ন ছবি আছে) পাকিস্তান থেকে আফগানিস্তানে পাচার করার কাজে যুক্ত করা হয়। ওই সব বইয়ে ট্যাংক, মিসাইল, মাইন, কালাশনিকভ রাইফেল এবং বিধর্মীদের বিরুদ্ধে জিহাদের আহ্বান লিপিবদ্ধ রয়েছে। যেসব কোরআনের আয়াত এসব পাঠ্যপুস্তকে ব্যবহার করা হয়েছে সেগুলো সংঘাতের কথা বলে, জিহাদের গুরুত্ব তুলে ধরার জন্য নানা পদ্ধতি এবং উপায় ব্যবহার করা হয়েছে। তালিবান শাসনকালে (১৯৯৬ সাল থেকে) এই বই ব্যবহার করা হয়েছে। আফগানিস্তানে সোভিয়েত দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধরত মুজাহিদদের প্রায় সব গ্রুপই ওহাবি আদর্শের সঙ্গে যুক্ত ছিল। তাদের অর্থ সাহায্য এসেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার বিশ্বস্ত সহযোগী সৌদি আরব থেকে। যারা ইরাকে মার্কিন আক্রমণের (২০০৩) পর উগ্রবাদী হয়ে ওঠে তারাও এ ওহাবি আদর্শের সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে শিয়াবিরোধী আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। দখলদারি সৈন্য অপসারণের পর নব্য প্রতিষ্ঠিত সরকারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে অর্থ এসেছে সৌদি আরব থেকে। প্রকৃতপক্ষে ইয়েমেন, ইরাক, সিরিয়া, লেবাননে শিয়া-সুন্নি সংঘর্ষে মূল ভূমিকা পালন করছে সৌদি আরব এবং একধরনের প্রক্সি-যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। সরকারিভাবে সাহায্য ছাড়াও জিহাদি যোদ্ধা এবং অস্ত্রশস্ত্রের মূল সরবরাহকারী হচ্ছে সৌদি আরবের ব্যক্তিভিত্তিক দাতারা। দুর্বল ব্যাংকিং নিয়মকানুনের সুযোগ নিয়ে তারা উগ্রবাদীদের তহবিলে অর্থ পাচার করেছে। জাকাতের অনেক অর্থ যায় উগ্রপন্থীদের তহবিলে। এই অর্থ থেকে ধ্বংস করা হচ্ছে সুফি নানা নিদর্শন (যেমন তিম্বুকতু (Timbuktu) বা আফগানিস্তানের বামিয়ানের (Bamiyan Buddhist statues) বৌদ্ধ নিদর্শনগুলো বা শিয়া নানা প্রতিষ্ঠান অথবা পাল্মিরার মতো গ্রিক বা রোমান সভ্যতার অমূল্য নিদর্শন। এ ছাড়া রয়েছে অসংখ্য ইন্টারনেট ওয়েবসাইট। তার মধ্যে উল্লেখ করার মতো যেমন সালাফি টক, ইসলামিক অ্যাওকেনিং, সুন্নি ফোরাম ইত্যাদি। লাখ লাখ মানুষের কাছে ধর্মোপদেশ রেকর্ড করে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে বিপুল পরিমাণের অর্থের প্রয়োজন হয় সেটিও সৌদি আরব জোগান দিয়ে থাকে। যেমন দ্য রেভাইভাল। সেখানে ধর্মীয় বিদ্বেষ এবং উগ্র পন্থার পক্ষে বলা হয়। ডালরিম্পল নামে একজন সাহিত্যিককে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে

পাকিস্তানের হাক্কানি মাদ্রাসার মাওলানা সামিউল হক বলেছেন, স্বাধীনতাকালে পাকিস্তানে যত মাদ্রাসা ছিল তার সংখ্যা ২৭ গুণ বৃদ্ধি পেয়ে আজ দাঁড়িয়েছে ২৪৫ থেকে ৬৮৭০-এ (২০০১ সালের হিসাব) এবং এদের অর্থায়নে সৌদি সাহায্য বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো। এই মাদ্রাসাগুলো পাকিস্তানের রাজনৈতিক দলের সঙ্গে সম্পর্কিত। মিসরেও মাদ্রাসার সংখ্যা ১৯৮৬ সালে ১৮৫৫ থেকে ৪৩১৪ (ডালরিম্পল ২০০৫) বৃদ্ধি পেয়েছে। এই প্রবণতাটি বৈশ্বিক হলেও মাদ্রাসায় ছাত্রদের আধুনিক জীবনের জন্য প্রস্তুত করা হচ্ছে না। অনেক ক্ষেত্রে এই অর্থায়নের উদ্দেশ্য রাজনৈতিক এবং মূলত শিয়াবিরোধী।

তবে কেবল ধর্মীয় নির্দেশ বা ধর্মীয় প্রচারের অবকাঠামোর ওপর গুরুত্ব দিয়ে ইসলামিক স্টেটের উত্থানকে বোঝা কঠিন। রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিপ্রেক্ষিতকে দৃষ্টির বাইরে রেখে কোনো আলোচনা সফলভাবে ইসলামিক স্টেটের মূল চরিত্র উদ্‌ঘাটন করতে পারে না বলে আমাদের বিশ্বাস। স্লাভাক দার্শনিক জিজেক (Neeva Steve 2015) ইসলামিক স্টেটকে আধুনিক এক জাতীয় সর্বত্যাগবাদী আদর্শের ধারক হিসেবে দেখার পরামর্শ দিয়েছেন। ইসলামিক স্টেট ঐশ্বরিক কোনো আদর্শের ভিত্তিতে গড়ে ওঠেনি। যে বর্বরতার আশ্রয় নিয়ে তারা তাদের রাজনীতি করে তার সঙ্গে ইসলামের সম্পর্ক নেই বলেও তিনি মত দিয়েছেন। এদের মতাদর্শ কঠোর এবং আদি ইসলামিক নিয়ম দিয়ে পরিচালিত নয়। বরং তারা তাদের হাতকে কলুষিত করছে নানা অপকর্ম দিয়ে এবং সেগুলোকে যুক্তিসিদ্ধ করছে ইসলামিক নানা শব্দ ব্যবহার করে। ফলে তাদের প্রকৃত চরিত্র বুঝতে হলে যতটুকু না ধর্ম তার চেয়ে রাজনীতি এবং সামাজিক কারণকে দেখতে হবে। যদি কেবল ধর্মই হতো তাহলে ব্রিটিশ সাংবাদিক মেহেদি হাসান যেমন লিখেছেন সবচেয়ে ধার্মিক মুসলিম সন্ত্রাসী বা জিহাদি হতেন। কিন্তু দেখা গেছে সবচেয়ে ধার্মিক যিনি তিনি জিহাদি হচ্ছেন না। জিহাদি হওয়ার ক্ষেত্রে ধর্ম বিশেষ কোনো ভূমিকা পালন করে না। ধর্ম বা ধর্মগ্রন্থের চেয়ে অনেক বড় কারণ হচ্ছে সামাজিক ও রাজনৈতিক। জিয়া মেরাল তাঁর *The Question of Theodicy and Jihad*-এ অথবা কারেন আর্মস্ট্রং তাঁর প্রবন্ধে জঙ্গিবাদের উত্থানের প্রধান কারণ হিসেবে সামাজিক এবং বিশ্বরাজনীতিকে দোষারোপ করেছেন। জিয়া মেরাল লিখেছেন, ধর্মীয় উগ্রবাদীরা তাদের পথকে ধর্মীয় ব্যাখ্যা দিয়ে যুক্তিসিদ্ধ করে বটে কিন্তু সেটিই উগ্রবাদের একমাত্র কারণ নয়। ধর্মই কেবল সহিংস সেটি ভাবা ভুল। ইতিহাসে ধর্মনিরপেক্ষ আদর্শ, মানবতবাদী আদর্শ, জাতীয়তাবাদী আদর্শ, সমাজতন্ত্র বা উদারনীতিবাদের মতো প্রতিটি আদর্শ সহিংসতাকে ব্যবহার করেছে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য। তারা সবাই একধরনের কাল্পনিক সমাজ গড়তে চেয়েছে। কারেন আর্মস্ট্রং তাঁর প্রবন্ধে দেখিয়েছেন,

সহিংসতা এমনকি গণহত্যা যেটি আমরা লক্ষ করি ইসলামিক স্টেটের কার্যকলাপে সেটি কেবল যে আজ অনুষ্ঠিত হচ্ছে তা নয়। ১৭৮৯-১৭৯৩ সালের ফরাসি বিপ্লবে জ্যাকবিনরা ১৭ হাজার পুরুষ, নারী এবং শিশুকে জনসমক্ষে হত্যা করেছিল। প্রথম মহাযুদ্ধে তুর্কি বাহিনী দশ লাখ আর্মেনীয় নারী-শিশুকে হত্যা করেছিল। সেই গণহত্যার ওপর আধুনিক তুর্কি রাষ্ট্র গড়ে উঠেছে। সোভিয়েত রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে বা খেমাররুজ রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন করতে গিয়ে বা দুর্নীতি থেকে সমাজকে মুক্ত করতে গিয়ে সন্ত্রাস ও গণহত্যা ঘটেছে। ১৯২২ সালে কামাল আতাতুর্ক গ্রিক ভাষাভাষি তুর্কিদের তার দেশ থেকে বের করে দিয়েছিলেন। *দ্য আটলান্টিক* পত্রিকায় ক্যাথি গিলসিনান লিখেছেন আইসিস ইসলাম ধর্মের যে ব্যাখ্যা দেয় তা থেকে হিংস্রতা ও উগ্রবাদের জন্ম হয় না। উগ্রবাদের জন্ম হয় ওই গ্রুপের মনোজগতের উগ্রতা থেকে, যার ভিত্তি রাজনীতিতে, ধর্ম কারণ নয়। ফলে আঞ্চলিক রাজনীতি, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের প্রভুত্বের রাজনীতি এবং সামাজিক দিক বিশেষ করে নানা ধরনের ইসলামবিরোধী প্রবণতা, ধর্মনিরপেক্ষতা এবং তার মূর্ত প্রতীকগুলোকে হিসাবে না নিয়ে জঙ্গিবাদকে বোঝা কঠিন হবে। এই তিনটি প্রবণতার মিলন থেকে আজকের ইসলামি জঙ্গিবাদের আবির্ভাব হয়েছে, যার মূর্ত প্রকাশ হচ্ছে ইসলামিক স্টেট। সে কারণে এই আন্দোলনকে দেখা উচিত একধরনের পবিত্র এবং অপবিত্রের মিশ্রণ (Hybrid of the Sacred and the Profane) হিসেবে (দেখুন Niva Steve, 20 February 2015 ব্লগ থেকে নেওয়া)। পবিত্র এই কারণে যে তাদের কার্যকলাপে ধর্মের দিক যে নেই তা নয়। কিন্তু তার চরিত্রে অপবিত্র দিক আছে। কারণ নানা ধরনের স্থানীয়, জাতীয়, আন্তর্জাতিক রাজনীতি, স্বার্থ, ষড়যন্ত্র, কুট চক্রান্ত তাকে ছাড়েনি।

জাতিরাষ্ট্রের সংকট

'ইসলামি রাষ্ট্রের' উদ্ভবের সঙ্গে বেশ কয়েকটি সামাজিক ও রাজনৈতিক কারণ যুক্ত আছে। সেই কারণগুলোর মধ্যে তিনটি প্রধান বলে মনে করি। একটি কারণ, তৃতীয় বিশ্বে আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের সংকট। দ্বিতীয়, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের আধিপত্যবাদী বৈদেশিক নীতি। তৃতীয় হচ্ছে মধ্যপ্রাচ্যের আঞ্চলিক রাজনীতি। ইসলামিক স্টেটের জন্ম হয়েছে ওই তিন কারণের মিথস্ক্রিয়া থেকে। এই মিথস্ক্রিয়ার শুরু বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশক থেকে। সে কারণে আমি ওই সময়কালকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে দেখি। ১৯৭৮ সালে ইরানে আয়াতুল্লাহ খোমেনির সফল ইসলামি বিপ্লব, ১৯৭৮ সালে সোভিয়েত সামরিক বাহিনীর আফগানিস্তান দখল, ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানে জিয়াউল হকের সামরিক অভ্যুত্থান এবং ১৯৭৩ সালে লিও স্ট্রস নামে মার্কিন রাজনৈতিক চিন্তাবিদের মৃত্যু এই

ধারাবাহিকতার খণ্ড খণ্ড রূপ। ১৯৭৮ সালের ইরান বিপ্লব আধুনিক রাষ্ট্রের সংকটের কারণে হয়েছিল। রেজা শাহ পাহলভি যে আধুনিক ইরান গড়ে তুলেছিলেন সেটি ইরানি জাতীয়তাবাদের ওপর ভর করে হলেও ওই শাসন ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত, পাশ্চাত্য শক্তির ওপর নির্ভরশীল এবং জাতি পরিচয় বর্জিত। ১৯৭৮ সালে আফগানিস্তানে সোভিয়েত আগ্রাসনের কারণ আফগান জাতিরাষ্ট্রের সংকট থেকে। সমাজতন্ত্রের অধীনে বহু জাতিভিত্তিক একটি দেশকে কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রের অধীন করার প্রক্রিয়া ব্যর্থ হওয়ার কারণে সোভিয়েত সৈন্যের উপস্থিতি সে সময় জরুরি হয়ে দাঁড়ায়। ১৯৭৮ সালে পাকিস্তানে সামরিক অভ্যুত্থান ঘটে ওই জাতিরাষ্ট্রের সংকট থেকে। যিনি ক্ষমতা গ্রহণ করেন, তিনি প্রতিষ্ঠিত জাতিরাষ্ট্রের ভিতকে ভেঙে দিয়ে শরিয়া আইন প্রবর্তনের ব্যবস্থা নেন। ১৯৭৩ সালে লিও স্ট্রসের মৃত্যু হয়। ওই ব্যক্তির দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রের সংকটের সম্পর্ক আছে।

জাতিরাষ্ট্রের এই সংকট কেবল ইরান, আফগানিস্তান বা পাকিস্তানে অনুভূত হয়নি। সংকটের অশনিসংকেত আজ শোনা যাচ্ছে মধ্যপ্রাচ্য থেকে শুরু করে সবখানে। কী কারণে পুরোনো জাতিরাষ্ট্রের সংকট দেখা দিল তার অন্তর্নিহিত কারণ অনুসন্ধানের কাজটি কঠিন ভাবার যৌক্তিকতা নেই। আধুনিক এবং ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র ইউরোপ ও আমেরিকায় আধুনিক দর্শন, জীবনধারা এবং রাজনৈতিক দর্শন থেকে জন্ম নিয়েছিল; বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে ঠিক যখন ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা ভেঙে পড়ছে। ইউরোপের রাষ্ট্রপুঞ্জ সবচেয়ে সফল রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে আসে সপ্তদশ শতাব্দীতে ১৬৪৮ সালে ওয়েস্টফেলিয়া চুক্তি স্বাক্ষরের পর। তার প্রভাবে এশিয়া, আফ্রিকা বা দক্ষিণ আমেরিকার অনুন্নত অঞ্চলে ইউরোপের অনুকরণে জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল। এই জাতিরাষ্ট্রের গঠন কিন্তু এমন সব অঞ্চলে ঘটেছিল, যেখানে জাতি বোধ হয় অনুপস্থিত ছিল অথবা প্রকৃত জাতিবোধকে সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্তের কারণে ধ্বংস করা হয়েছিল কৃত্রিমভাবে। সেটি আমরা লক্ষ করেছি ভারতবর্ষে (ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে), ডুরান্ড লাইন দিয়ে আফগানিস্তান এবং পাকিস্তানের মধ্যে বিভেদরেখা এঁকে, কৃত্রিম রাষ্ট্রের জন্ম দিয়ে অথবা মধ্যপ্রাচ্যে অটোমান সাম্রাজ্যের পতনের পর যেভাবে জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল তার মধ্য দিয়ে। ঔপনিবেশিক শক্তি প্রথম মহাযুদ্ধের পর তুরস্কের খিলাফতের পতন ঘটিয়ে যেভাবে জাতিরাষ্ট্রের জন্ম দিয়েছিল, তাতে করে জাতীয়তাবাদ গড়ে ওঠেনি। একটি রাজনৈতিক ব্যবস্থা হিসেবে মধ্যপ্রাচ্যে যে জাতিরাষ্ট্রকে চাপিয়ে দেওয়া হয়েছিল সেটি ছিল আপাদমস্তক কৃত্রিম।

দ্বিতীয়ত, কয়েক যুগ ধরে জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা

জাতিরাষ্ট্র পরিণত হয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়। এসব রাষ্ট্র উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ প্রভাবশালী ছিল। গণতন্ত্রের নাম ব্যবহার করা হলেও সেসব রাষ্ট্র শাসিত হয়েছে স্বৈরতান্ত্রিক কায়দায়। প্রতিটি দেশ পুলিশি রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। ক্ষমতায় অধিষ্ঠিতরা দেশ শাসন করেছে আইনের ঊর্ধ্বে দাঁড়িয়ে। সেসব দেশের প্রতিটি সমাজ দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারের অধীনে আজ নিপীড়িত হচ্ছে। এই বিশেষ শ্রেণিকে মধ্যপ্রাচ্যে বলা হতো হোগ্রা (দেখুন Sachdev, Mahesh 2015)। এরা শক্তি দিয়ে শাসন করায় বিদ্রোহ দমনে কঠোর ব্যবস্থা নিয়েছে। ১৯৫০ সাল থেকে ১৯৭৫ সালের মধ্যবর্তী সময়ে এসব রাষ্ট্রের সরকার হয় সোভিয়েত অথবা মার্কিন সাহায্য নিয়ে টিকে ছিল। ফলে তাদের অভ্যন্তরীণ চরিত্র ও দুর্বলতা প্রকাশ পায়নি। বরং ঢাকা পড়ে ছিল ঠান্ডা যুদ্ধের দ্বিমুখী সংঘাতের আড়ালে (Patrik Cockburn, 28 June 2016)। আজ সেই পর্দা সরে গেছে। আজ তাদের সংকট দিবালোকের মতো স্বচ্ছ ও পরিষ্কার।

একদা ব্রিটিশ ও ফরাসিদের ষড়যন্ত্রে মধ্যপ্রাচ্যে যে ধরনের জাতিরাষ্ট্রের জন্ম হয়েছিল (Sykes-Picot Agreement in 1916) সেসব জাতিরাষ্ট্রের সীমানাকে ইসলামিক রাষ্ট্র ভেঙে দিয়ে নতুন ইসলামিক রাষ্ট্রের ভিত গড়তে চায়। এতকাল টিকে থাকলেও জাতিরাষ্ট্রের অন্তঃসারশূন্যতা আজ ধীরে ধীরে উন্মোচিত হচ্ছে এবং সে ক্ষেত্রে ইসলামিক স্টেট বা তালিবান বা আল-কায়েদার মতো ঠিকানাবিহীন সব সংগঠনের তৎপরতার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। জাতিরাষ্ট্রের ব্যর্থতার যে ব্যাখ্যা ইসলামিক স্টেটের কাছ থেকে আমরা পাই তার সঙ্গে আমরা একমত নাও হতে পারি। কিন্তু জাতিরাষ্ট্রের ব্যর্থতা যে মিথ্যা নয়, সেটি তো সত্য। তাদের ব্যাখ্যা হচ্ছে মানুষনির্মিত নিয়মকানুন ব্যর্থ হতে বাধ্য এবং সে কারণে মুসলমানদের জন্য সেসব আইনকানুন বা রাষ্ট্রকাঠামো অগ্রহণযোগ্য। আধুনিকতার বিরুদ্ধে ইসলামিক স্টেটের এই যে সংগ্রাম তাকে খাটো করে দেখার অবকাশ নেই। কারণ যারা আজ ইসলামি সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত, তারা ইসলামি রাষ্ট্রের মধ্যে তাদের পূর্বপুরুষের ইতিহাস খুঁজছে, তাদের ঐতিহ্য ধারণ করতে চাইছে, তাদের বীরদের আদর্শকে প্রতিফলিত করতে চেষ্টা করছে। নোয়াম চমস্কির মতে, এরা যে সম্পূর্ণভাবে কোরআনের আদেশ পালন করার জন্য জিহাদে অংশ নিচ্ছে তা নয়। তারা অংশগ্রহণ করছে এক রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতায় অংশ নেওয়ার জন্য। ইসলামিক স্টেটের মতো ধর্মীয় ও গোত্রভিত্তিক আত্মপরিচয়কে প্রাধান্য দিয়ে যে আন্দোলনের ধারা আজ গড়ে উঠেছে সেটি একমাত্র মধ্যপ্রাচ্যীয় দেশগুলোর প্রবণতা হিসেবে যদি দেখা হয় তাহলে ভুল করা হবে। এটি আজ বিশ্বব্যাপী একটি প্রবণতা। ইউরোপে নানা ধরনের আন্দোলনের মূলে আমরা একই প্রবণতা বা কার্যকারণ সম্পর্ক লক্ষ করছি। বস্তুত সবখানেই আজ আধুনিক জাতিরাষ্ট্রের ভাঙনের

অশনিসংকেত লক্ষ করা যাচ্ছে। সেখানে সংখ্যালঘু ইস্যু আজ প্রধান একটি ইস্যুতে পরিণত হয়েছে। সংখ্যালঘুদের ভূখণ্ড থেকে বের করে নতুন ধাঁচের রাষ্ট্র গড়ে তোলা এবং একচ্ছত্র ক্ষমতা প্রতিষ্ঠিত করা এসব আন্দোলনের মুখ্য উদ্দেশ্য। ভারতে বিজেপির উদ্দেশ্য ওই। বাংলাদেশে জামায়াতে ইসলামীর উদ্দেশ্য হিন্দুদের তাদের মাতৃভূমি থেকে উচ্ছেদ করা। মিয়ানমারে বৌদ্ধ সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণ রোহিঙ্গাদের উৎখাত করতে চায়। পাকিস্তানে সুন্নিরা মোহাজিরদের উৎখাত করতে আগ্রহী। আফগানিস্তানে হাজরা সম্প্রদায়কে দেশান্তরিত করা সুন্নি সম্প্রদায়ের প্রধান লক্ষ্য। শিয়াপ্রধান দেশকে সুন্নিমুক্ত করা, সুন্নিপ্রধান দেশকে শিয়ামুক্ত করা, ইউরোপকে মুসলিমমুক্ত করা আজ সামাজিক আন্দোলনের বিশেষ প্রবণতা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ফলে এসব প্রবণতা থেকে বোঝা যায় যে, যে জাতিরাষ্ট্র আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল প্রতিষ্ঠান হিসেবে সেই জাতিরাষ্ট্র আজ আদর্শগতভাবে গভীর সংকটে নিমজ্জিত হয়ে আছে। তার কাঠামো ভেঙে পড়ছে। আর সেই সংকটকে তুলে ধরছে ইসলামিক স্টেট বা আল-কায়েদা বা তালিবানের মতো একনায়কতান্ত্রিক ধর্মভিত্তিক, গোষ্ঠীভিত্তিক সব আন্দোলন। এরাই আজকের দিনের সাম্রাজ্যবিরোধী জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের বিরুদ্ধ শক্তি হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে। তাদের এই প্রতিবাদের ভাষা কেন ধর্মীয় হলো তার কারণ যে নেই তা নয়। জাতিরাষ্ট্রের যাঁরা এতকাল কর্ণধার ছিলেন তাঁরা তাঁদের স্বৈরাচারী শাসনকে টিকিয়ে রাখতে সমাজতান্ত্রিক শক্তিকে ধ্বংস করেছে। তারা জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধ শক্তিকেও ধ্বংস করেছে এবং মাঝেমধ্যে ধর্মীয় শক্তির সঙ্গে আঁতাত করেছে নিজের কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে। সে কারণে আজ তাদের দুর্বল জায়গাটি পূর্ণ করার একমাত্র শক্তি, যা অবশিষ্ট আছে তা হচ্ছে ধর্মীয়, আমাদের ক্ষেত্রে ইসলামি, সে জঙ্গিবাদ হোক বা হোক নরম কোনো ইসলামি আন্দোলন।

মার্কিন আধিপত্যবাদ

জাতিরাষ্ট্রের সংকট কেবল ইউরোপ বা মধ্যপ্রাচ্যকে আঘাত করেনি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বা অন্যান্য ইউরোপীয় দেশ ওই একই সংকটকাল অতিক্রম করছে, যদিও তাদের ক্ষেত্রে সংকটের চরিত্র ভিন্ন। ইতিমধ্যে আমরা মার্কিন রাষ্ট্রবিজ্ঞানী লিও স্ট্রসের নাম উল্লেখ করেছি ৭০ দশকের জাতিরাষ্ট্রের সংকটের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে। লিও স্ট্রস ইউরোপীয় জাতিরাষ্ট্রের সংকটকে একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করেছিলেন। তিনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সংকটকে উদারনীতিবাদী দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করে দেখেছিলেন। পশ্চিমা বিশ্বের সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থা বস্তুত ওই দর্শনের ওপর ভর করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। উদারনীতির সংকট কেন হলো তার

কারণ আছে। উদারনীতিভিত্তিক সমাজে মানুষ ব্যক্তিকেন্দ্রিক হয়, মানুষ তার প্রাপ্য নিয়ে উৎসাহিত থাকে, দায়িত্বের কথা ভুলে যায়। ফলে সমাজের সংহতি বিনষ্ট হয় এবং মানুষ স্বার্থপরে পরিণত হয়। ওই সংকট নিরসনের পথ কী? লিও স্ট্রস রাজনীতিবিদের পরামর্শ দিয়েছেন তাঁরা যেন এমন সব কল্পকথা সৃষ্টি করেন (প্লেটোর নোবেল লাই) যেগুলো মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত কিন্তু মানুষ সত্য হিসেবে সেগুলোকে গ্রহণ করে। স্ট্রসের প্রধান বক্তব্য হচ্ছে এমন রাজনৈতিক কর্মসূচি হাতে নেওয়া প্রয়োজন, যেখানে সাধারণ মানুষ বুঝবে একরকমভাবে। আর মুষ্টিমেয় এলিট গোষ্ঠী বুঝবে ভিন্নভাবে। নব্য রক্ষণশীল এই রাজনৈতিক আন্দোলন সত্তরের দশকের মার্কিন পররাষ্ট্রনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। রোনাল্ড রিগ্যান, জর্জ বুশ ছাড়া আরও বাদবাকি যেসব নিওকন মার্কিন নীতিকে প্রভাবিত করেছে তাঁদের মধ্যে পল উলফভিচ, জন বলটন, রিচার্ড পার্ল, পল ব্রেমার, ডিক চেনি, ডোনাল্ড রামসফেলড, সিনেটর হেনরি জ্যকসন প্রমুখ। তাঁরা জাতিরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ সংকটকে বুঝেছিলেন এবং সেই সংকট থেকে সাধারণ মানুষের দৃষ্টি সাময়িকভাবে হলেও সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন মিথ্যার আশ্রয়ে।

এ ক্ষেত্রে সত্তর দশকের মার্কিন বৈদেশিক নীতির সঙ্গে ইসলামিক স্টেটের উত্থানের গভীর সম্পর্ক অস্বীকার করা কঠিন। স্ট্রসের রাজনৈতিক আদর্শ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বৈদেশিক নীতিতে বাস্তবায়িত হওয়ার কারণে সাদ্দাম হোসেনের উৎখাত সম্ভব হয়েছিল। গণবিধ্বংসী অস্ত্র বা রাসায়নিক অস্ত্র বা নয়-এগারো আক্রমণে সাদ্দাম হোসেনের কোনো সম্পৃক্ততা না থাকার সত্য যে ওয়াশিংটনের কাছে অজানা ছিল তা নয়। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মহৎ মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সাদ্দাম হোসেনকে উৎখাত করে। লিবিয়ায় গাদ্দাফিকে উৎখাত করা হয় ওই একই কারণ দেখিয়ে। এভাবে মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে সুপরিকল্পিতভাবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এসব দেশের রাষ্ট্রকাঠামোকে ধ্বংস করেছে। আফগানিস্তানকে ব্যর্থ রাষ্ট্রে পরিণত করা হয়। মার্কিন নাগরিকদের দৃষ্টিকে দেশীয় সংকট থেকে বের করে অন্যদিকে নেওয়া যদিও এ সবকিছুর মূল উদ্দেশ্য ছিল। এই নীতির আরও একটি দিক ছিল ইসলাম ধর্মকে জঙ্গিবাদী রূপ দেওয়া। তার কয়েকটি উদাহরণ এখানে দেওয়া হলো। ইসলামের ইতিহাসে জিহাদ শব্দকে কখনো জঙ্গি প্রত্যয় হিসেবে ব্যবহার করা হয়নি। ১৯৮০ সালের দিকে পাকিস্তানে জেনারেল জিয়াউল হক ক্ষমতায় আসার পর এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার সহযোগিতায় 'সৃষ্টিকর্তাহীন' কমিউনিস্টদের বিরুদ্ধে এক সশস্ত্র আন্দোলন গড়ে তুলতে সক্ষম হয়। বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের আফগানিস্তানে সোভিয়েতদের বিরুদ্ধে যুদ্ধের জন্য সিআইএ রিক্রুট করে এবং প্রশিক্ষণ দেয়। এই অপারেশনের নাম দেওয়া হয় অপারেশন সাইক্লোন। রোনাল্ড রিগ্যান, তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট মুজাহিদিনদের সঙ্গে তাঁর ওভাল অফিসে

সাক্ষাৎ করেন। ১৯৯০ সালে গালফ যুদ্ধের সময় আমেরিকা সৌদি আরবে সৈন্য পাঠিয়েছিল কুয়েত আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য। সে যুদ্ধে সাদ্দাম পরাজিত হয়েছিলেন। কিন্তু মার্কিন সৈন্যরা ইসলামের সবচেয়ে পবিত্র স্থান মক্কা নগরী ছেড়ে যায়নি। সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান ত্যাগ করার পর আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয় এবং তালিবান বাহিনী ক্ষমতায় আসে। তারা আফগানিস্তানে মধ্যযুগীয় এক ধর্মীয় রাষ্ট্র গড়ে তোলে। বস্তুত সেটিই ছিল ইসলামিক স্টেটের প্রথম ট্রায়েল বা ফলস স্টার্ট।

ইসলামিক স্টেটের জন্ম হয়েছে জর্জ বুশের হাতে। ক্ষমতায় থাকাকালে সিরিয়াকে তিনি অ্যাক্সিস অব এভিলের সঙ্গে যুক্ত করে মিথ্যা প্রচার চালিয়েছিলেন। বুশ সিরিয়া পরিস্থিতিকে অশান্ত করার নানা পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। উইকিলিকসে প্রকাশিত স্টেট ডিপার্টমেন্টের নথিপত্রে দেখা যায়, ২০০৬ সালে মার্কিন দূতাবাস সিরিয়াকে নানাভাবে অস্থিতিশীল করার বেশ কিছু পথ বাতলে দেয়। তার মধ্যে সৌদি আরব ও মিসরের সঙ্গে মিলে সিরিয়ার গোত্রবিভক্তিকে তীব্র করা, কুর্দি সুন্নিদের সিরিয়া সরকারের বিরুদ্ধে দাঁড় করানো ছিল অন্যতম। এই কৌশল বাস্তবায়নের জন্য ন্যাশনাল স্যালভেশন ফ্রন্ট নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলা হয়। ওই সংগঠনের নেতা আবুল হালিম খাদ্দামকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সমর্থন দেয়। ২০০৬ সালের ওই রিপোর্টে উল্লেখ আছে যে আমেরিকা ৫ মিলিয়ন ডলার খরচ করেছে আসাদবিরোধী সংসদ সদস্যদের পেছনে। লিবিয়া থেকে তুরস্ক হয়ে সিরিয়ায় যে সমরাস্ত্র পাচার হয়েছে তার দায়িত্বে ছিল সিআইএ। *ওয়াশিংটন পোস্ট* পত্রিকায় প্রকাশিত খবরে জানা যায়, ত্রিপলিতে নিহত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মৃত্যুর আগে আল-মারফা শিপিং অ্যান্ড মেরিটাইম সার্ভিসেসের সঙ্গে বৈঠক করেছিলেন। এটি ত্রিপলিভিত্তিক একটি কোম্পানি, যেটি অবৈধ অস্ত্র পাঠানোর কাজে নিয়োজিত ছিল (সেমর এম হার্শ, ৭ জানুয়ারি ২০১৬)। উইকিলিকস প্রকাশিত তথ্যে আরও জানা যায়, ২০০৬ ও ২০১০ সালের মধ্যে স্টেট ডিপার্টমেন্ট নানা ধরনের ইসলামিক গ্রুপকে ৬ মিলিয়ন ডলার সাহায্য দিয়েছে। লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত আসাদবিরোধী তথাকথিত দ্য মুভমেন্ট ফর জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট (এমজেডি) আন্দোলনকে অস্ত্র ও অর্থ দিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সাহায্য করেছে। যারা ইসলামি জঙ্গি তাদের নরম ও উদারনৈতিক হিসেবে প্রচার করে তাদের হাতে অত্যাধুনিক অস্ত্র তুলে দেওয়া হয়েছে। সেগুলো অবশেষে পৌঁছেছে ইসলামিক স্টেটের যোদ্ধাদের হাতে। সেমর হার্শ নামে প্রখ্যাত সাংবাদিক 'দ্য র‍্যাট লাইন' নামে প্রবন্ধে লিবিয়া থেকে তুরস্ক হয়ে সিরিয়াতে অস্ত্র পাচারের সঙ্গে সিআইএকে জড়িত করেছেন। এই অপারেশনের নেতৃত্বে ছিলেন সিআইএর তৎকালীন প্রধান ডেভিড পেত্রিয়াস এবং বেনগাজি শহরের মার্কিন কনস্যুলেট (নিলস উইলিয়ামসন,

২০১৪)। এ ছাড়া ওই একই প্রবন্ধে ইসলামিক স্টেটের খলিফা বাগদাদি এবং ইসলামিক স্টেটের যুদ্ধমন্ত্রী শিসানির সঙ্গে সিআইএ ও এফবিআইয়ের যোগসূত্রের কথাও উল্লেখ আছে।

বস্তুত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইতিহাস থেকে কোনো শিক্ষা নেয়নি। প্রখ্যাত মার্কিন চিন্তাবিদ গোর ভিডাল আমেরিকাকে কেন *ইউনাইটেড স্টেটস অব এম্নেসিয়া* বলেছেন তার কারণ যে নেই তা নয়। সেই একই উপলব্ধি আমরা আরও লক্ষ করি চীনা প্রধানমন্ত্রীর বক্তব্যে। তিনি আরও একটু বাড়িয়ে আমেরিকানদের সম্পর্কে বলেছেন যে তারা এমন এক জাতি যার বিশেষত্ব হচ্ছে ঐতিহাসিক জ্ঞানের অভাব। কামারের ভারী হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করার মতো করে জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে আমেরিকা যে সামরিক সংগ্রাম আফগানিস্তানের মতো ক্ষুদ্র একটি দেশে ২০০১ সালে শুরু করেছিল তার ফলে ওই জঙ্গিবাদ কি নিঃশেষ হয়েছে? হয়নি। বরং তার আগুন ছড়িয়ে পড়েছে বিশ্বের বেশির ভাগ অঞ্চলে। নোয়াম চমস্কি লিখেছেন (চমস্কি ২০১৬) বস্তুত ইরাকে মার্কিন অভিযানের পর বিভিন্ন গোয়েন্দা সংস্থার হিসেবে জঙ্গিবাদী আক্রমণ সাত গুণ বেড়ে গেছে। ইরাক, আফগানিস্তান ও পাকিস্তানে গত ১২ বছরে অত্যন্ত রক্ষণশীল হিসেবে ১.৩ মিলিয়ন মানুষের মৃত্যু হয়েছে। অসলোভিত্তিক শান্তি গবেষণা ইনস্টিটিউটের হিসাবমতে, এর কারণ অভ্যন্তরীণ। যেসব অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্ব বিগত বছরগুলোতে আমরা লক্ষ করেছি সেগুলো ৯৮ শতাংশ ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয়েছে মার্কিন নীতির কারণে। তারা বাইরে থেকে তাদের দেওয়া নিয়মকানুন কোনো দেশের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে (চমস্কি ২০১৬ থেকে নেওয়া)। একটি উদাহরণ ব্যবহার করে নোয়াম চমস্কি দেখিয়েছেন যে আমেরিকা যদি ইসলামিক স্টেটের খলিফা বাগদাদিকে হত্যা করতে সক্ষম হয় তাহলেও কিন্তু আল-কায়েদা এবং ইসলামিক স্টেট (বর্তমানে তাদের মধ্যে বিরোধ আছে) ধ্বংস হবে না। বরং তারা এক হয়ে অতি শক্তিশালী এক জঙ্গি বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। এই দুই সংগঠনের মধ্যে বর্তমানে যে মতবিরোধ সেটি নিতান্তই ব্যক্তিগত এবং সেটি দুই নেতা বাগদাদি এবং আইমান জাওয়াহিরির মধ্যেকার দ্বন্দ্ব। বাগদাদির বিদায়ের পর ইসলামিক স্টেটের পরবর্তী নেতা আল-কায়েদার সঙ্গে আঁতাতে কোনো বাধা দেখবে (চমস্কি ২০১৬) কি না সে বিষয়ে সন্দেহ আছে।

আঞ্চলিক রাজনীতি

প্রখ্যাত ইতিহাসবিদ ও দার্শনিক নিল ফার্গুসন ২০০১ সালে নিউইয়র্কের টুইন টাওয়ার আক্রমণের পর ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে পরবর্তী বিশ্ব সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু হবে ইসলামের অভ্যন্তরীণ দুই গোষ্ঠী শিয়া ও সুন্নি সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব। সে

সময় ফার্গুসনের ওই উক্তিকে অনেকেই পাশ কাটিয়ে গিয়েছিলেন। তখন ভিন্ন এক সংঘাতের সম্ভাবনা নিয়ে অনেকে ব্যস্ত ছিলেন। রাজনীতি বিজ্ঞানের প্রথিতযশা অধ্যাপক সামুয়েল হান্টিংটনের তত্ত্ব সে সময় ভবিষ্যৎ বিশ্ব সংঘাতের চরিত্রকে ব্যাখ্যা করতে গিয়ে আন্তঃসভ্যতার সংঘর্ষের ওপর বিশেষ জোর দিয়েছিল। সেই আন্তঃসভ্যতার সংঘাত বলতে তিনি ইসলামভিত্তিক সভ্যতার সঙ্গে খ্রিষ্টীয় ধর্মভিত্তিক সভ্যতার মধ্যকার দ্বন্দ্বকে বুঝেছিলেন। মধ্যপ্রাচ্যের সাম্প্রতিক ঘটনা কিন্তু আন্তঃসভ্যতার চেয়ে শিয়া-সুন্নি বিভেদকে আজকের অশান্ত রাজনীতির উৎস হিসেবে প্রমাণিত করছে বলেই মনে হয়। এই দ্বন্দ্বকে ইতিহাসের প্রতিটি অধ্যায়ে আমরা সংঘাতের জন্ম দিতে দেখেছি, যদিও এর পেছনে প্রকৃত কারণ হচ্ছে ক্ষমতার লড়াই। ইরাক ও সিরিয়াকে কেন্দ্র করে যে গৃহযুদ্ধ আজ আমরা প্রত্যক্ষ করছি (একে গৃহযুদ্ধ না বলে আঞ্চলিক ও বৈশ্বিক সংঘাত বলা উচিত) সেটি ওই অঞ্চলের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব নিয়ে ঘটেছে। ১৯৭৯ সালে ইরানে শিয়া ইসলামি বিপ্লব এবং বিশেষ করে ইরাকে মার্কিন দখল এবং সাদ্দাম হোসেনকে ক্ষমতা থেকে উৎখাত করার পর (২০০৩ সালে) মধ্যপ্রাচ্য কার্যত দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। ইরান, ইরাক, সিরিয়াকে (সেখানে আলউয়ি নামে সংখ্যালঘিষ্ঠ শিয়া গ্রুপ শাসন করে) নিয়ে এক শিয়া শক্তির আঁতাত গড়ে ওঠে। ওই আঁতাতের বাকি অংশ লেবাননের হিজবুল্লাহ বাহিনীসহ আরও কিছু স্থানীয় শিয়া বাহিনী। অন্যদিকে সুন্নিপ্রধান দেশ সৌদি আরব, গালফ রাষ্ট্র এবং অন্যান্য দেশ শিয়া উত্থানকে তাদের আঞ্চলিক ক্ষমতার প্রতি হুমকি হিসেবে দেখে। এর সঙ্গে আরও যুক্ত রয়েছে নানা ধরনের স্থানীয় ও আঞ্চলিক কিছু দ্বন্দ্ব। তারই মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছে অবিশ্বাস্যভাবে জঙ্গি এবং হিংস্র এই 'ইসলামিক স্টেট'ভিত্তিক আন্দোলন।

এই বিরোধের শেকড় অতীত ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত। সুন্নি ও শিয়া সম্প্রদায়ের মধ্যে এই দ্বন্দ্ব যতটুকু না ধর্মীয় তার চেয়ে অনেক বেশি ক্ষমতাকেন্দ্রিক এবং আঞ্চলিক রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করার উপায় ব্যতীত কিছু নয়। এ দ্বন্দ্ব প্রাথমিক পর্যায়ে যে ধর্মীয় পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল সেটি পরবর্তী সময়ে আরও গভীর থেকে গভীরতর হয়েছে। যদিও তাদের বিশ্বাসজগতের মধ্যে পার্থক্য খুবই সামান্য। হজরত মুহাম্মদ (সা.)-এর মৃত্যুর পর ইসলামিক বিশ্ব খলিফা দ্বারা শাসিত হতো। শেষ খলিফা ছিলেন নবীর জামাতা আলী। আলীর মৃত্যুর পর নেতা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে মুসলিম বিশ্ব দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক গ্রুপ মুসলিম বিশ্বের নেতা হিসেবে নবীর উত্তরসূরি বা আলীর পুত্রকে অগ্রাধিকার দেওয়ার পক্ষে ছিল। অন্য অংশের মতে মুসলিম বিশ্বের নেতা যে কেউ হতে পারেন, যদি সেই নেতা রসুলের সুন্না অনুসরণ করে খিলাফত শাসন করে। এই গ্রুপের প্রথম নেতা ছিলেন মুয়াবিয়া। সিরিয়ায় তিনি উমাইয়া বংশের শাসন (৬৬১-৭৫০) প্রতিষ্ঠা

করেছিলেন। এই বংশ পরবর্তী সময়ে প্রতিপক্ষ আব্বাসীয় বংশের হাতে (৭৫০ থেকে ১২৫৮ সাল পর্যন্ত শাসন করার পর) পরাজিত হয়। উমাইয়ারা সুন্নি ইসলামের অনুসারী অন্যদিকে আব্বাসীয়রা শিয়া মুসলমান। শিয়া-সুন্নি এই বিভেদ আব্বাসীয় এবং উমাইয়া শাসন চরিত্রে প্রতিফলিত হয়েছে। উমাইয়া শাসনের সময় খিলফাতের বিশেষ কোনো বিস্তার লক্ষ করা যায়নি। যত বিস্তার ঘটেছে সেটি আব্বাসীয় আমলে। যদিও ইসলামের ধর্মীয় নীতিমালার মূল ভিত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে উমাইয়া শাসনের প্রধান ভূমিকা ছিল বলে অনেকের ধারণা। উমাইয়াদের মূল লক্ষ্য ছিল সিরিয়া, ইসরায়েল, লেবানন, মিসর ইত্যাদি অঞ্চলে তাদের প্রভাব বিস্তার করা। উমাইয়া শাসনকালে নারীদের বিশেষ মর্যাদা দেওয়া হতো। নারীরা কোনো হিজাব পরত না। তাদের মতামত ও উপদেশকে গুরুত্ব দেওয়া হতো। আব্বাসীয় শাসনামলে নারীদের এই মর্যাদা দেওয়া হয়নি। উমাইয়া শাসনামলে ধর্মান্তরিত করার ক্ষেত্রে তেমন চাপ ছিল না। আরও একটি বিভেদ লক্ষ করার মতো। উমাইয়ারা আক্রমণাত্মক সামরিক দখলের ওপর গুরুত্ব দিয়েছে। অন্যদিকে আব্বাসীয়রা গুরুত্ব দিয়েছে জ্ঞানের ওপর।

আজকের মধ্যপ্রাচ্যে যে সংঘর্ষ চলছে তার মূলে রয়েছে সৌদি আরব ও ইরানের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার দ্বন্দ্ব। সৌদি আরব সুন্নি মুসলমানদের পবিত্র স্থান মক্কা শরিফের রক্ষাকর্তা। সে কারণে সুন্নি বিশ্বের নেতা। ইরান শিয়া মুসলমানদের নেতা (১৩ শতাংশ মুসলমানের)। এরা প্রত্যেকে ধর্মকে প্রধান অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করে। সিরিয়া থেকে শুরু করে ইয়েমেন, লেবানন, বাহরাইন, ইরাকসহ মধ্যপ্রাচ্যের অন্য সব দেশ এই দুই শক্তির দ্বন্দ্বে জর্জরিত। এই দুই দেশের দ্বন্দ্বই সেখানকার রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে। এসব সংঘর্ষের কারণে আজ ৬ মিলিয়ন উদ্বাস্তু সৃষ্টি হয়েছে। তাদের মধ্যেকার ঠান্ডা যুদ্ধ গোটা বিশ্বকে প্রভাবিত করছে। ১৯৭৯ সালে ইরানি বিপ্লবের পর থেকে সৌদি আরব তার প্রভাব ও শক্তিকে বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে ওহাবি ইসলামের ধারাকে সারা বিশ্বে ছড়িয়ে দেওয়ার প্রকল্প হাতে নেয়, যার কিছু দিক আমরা ইতিমধ্যে উল্লেখ করেছি। একইভাবে ইরান তার শক্তি বৃদ্ধি করেছে শিয়া অধ্যুষিত দেশে। ইসলামের দুই সম্প্রদায়ের এই দ্বন্দ্ব ইতিহাসে প্রায় সব ক্ষেত্রে আমরা লক্ষ করেছি। স্থানীয় ক্ষমতার লড়াইয়ে আন্তর্দেশীয় সম্পর্কে নানা মতবিরোধ মেটাতে এবং সামাজিক ও রাজনৈতিক আন্দোলন প্রভাবিত হয়েছে শিয়া-সুন্নি বিভেদ দিয়ে। সেটি ইসলামিক স্টেটের উদ্ভবে লক্ষ করা যায়। ২০০১ সালে আফগানিস্তান আক্রমণের পর আল-কায়েদার শক্তি যখন একেবারে নিঃশেষিত তখন এই শিয়া-সুন্নি বিভেদকে কাজে লাগানো হয়েছিল। তখন ইরাকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দখলদারি সৈন্যের নৃশংসতা চলছে। আবু মুসাব আল জারকাই নামের এক জর্ডানি এবং আল-কায়েদার সঙ্গে সংশ্লিষ্ট (তার অতীত খুব সুবিধার

ছিল না। তিনি ছিলেন চোর এবং নারী কেলেঙ্কারির সঙ্গে জড়িত) একটি গ্রুপ গড়ে তোলেন, যার নাম দেওয়া হয় আর্মি অব দ্য শ্যাম। বিন লাদেন তাকে আল-কায়েদার সঙ্গে এক হতে বলেন। তিনি সেটি অগ্রাহ্য করেন। পরে তার সংগঠনের নাম দেওয়া হয় আল-কায়েদা ইন ইরাক (২০০৪)। তিনি মার্কিন দখলদার বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ না চালিয়ে শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্বকে চাঙা করার জন্য বিশেষ তৎপর হয়েছিলেন। ২০০৩ সালে নাজাফ শহরের ইমাম আলী মসজিদে বোমা ফাটিয়ে আয়াতুল্লা মুহাম্মদ বকর আল হাকিমকে হত্যা করা হয়। সেই সঙ্গে মৃত্যু হয় আরও ১২৫ জনের (লরেন্স রাইট ২০১৪)। ফলে আজকের ইসলামিক স্টেটের উত্থানে জাতিরাষ্ট্রের সংকট যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি করে গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে মার্কিন আধিপত্যবাদ এবং শিয়া-সুন্নি দ্বন্দ্ব।

বাংলাদেশ ও জঙ্গিবাদ : কোনো প্যাটার্ন আছে কি?

ইতিহাসে রাজনৈতিক ইসলাম তিনটি ধাপ অতিক্রম করেছে বলে আমরা মনে করি। প্রথম ধাপটি ছিল উপনিবেশবাদবিরোধী। মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলে উপনিবেশবাদকে বিরোধিতা করতে গিয়ে ইসলাম ধর্মের সঙ্গে রাজনীতির সংমিশ্রণ ঘটে। জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক শক্তির পাশাপাশি ধর্মীয় আন্দোলনের সেই বিরোধিতার মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল আধুনিক অর্থে জাতি বলতে যা বোঝায়, তার বিরোধিতা করা এবং মুসলিম আত্মপরিচয়কে জাতি গঠনের প্রক্রিয়ায় প্রতিষ্ঠিত করা। এই আন্দোলন থেকে জন্ম নিয়েছে নানা ইসলামি চিন্তাধারা এবং ইসলামি আন্দোলন। পাকিস্তানের মাওলানা মওদুদী এবং মিসরের সৈয়দ কুতুবকে এই আন্দোলনের সবচেয়ে প্রভাবশালী তাত্ত্বিক এবং পুরোধা হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এদের উভয়ে জাতীয়তাবাদকে বিরোধিতা করে ইসলামি শরিয়া আইনের ভিত্তিতে রাষ্ট্রব্যবস্থা গড়ে তোলার পক্ষে ওকালতি করেছেন। জন্ম হয়েছে জামায়াতে ইসলামী এবং মুসলিম ব্রাদারহুড নামে দুই শক্তিশালী আন্দোলন। এই পর্যায়ের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে রাজনৈতিক ইসলামের আন্দোলনের ধরন। এ ক্ষেত্রে প্রাধান্য পেয়েছে গণ-আন্দোলন। এটিকেই উদ্দেশ্য অর্জনে মুখ্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়েছে। মানুষকে সচেতন করা, রাজনৈতিক সংগঠনের মাধ্যমে তাদের উৎসাহিত এবং সক্রিয় করা এই আন্দোলনের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। আধুনিক অর্থে জাতীয়তাবাদকে আমরা বুঝি এক ভাষাভাষী, এক সংস্কৃতি বা এক পূর্বপুরুষের ঐতিহ্যভিত্তিক কোনো মানবগোষ্ঠীর আত্মপরিচয়গত আন্দোলনকে। জাতীয়তাবাদী গণ-আন্দোলনের শক্তিশালী সমর্থনের কারণে গণভিত্তিক ওই ইসলামি আন্দোলনের সাফল্য সীমিত ছিল। ইরানের শাহের বিরুদ্ধে আয়াতুল্লাদের আন্দোলন ১৯৭৮ সালে সাফল্য এনে দেয়। এ ক্ষেত্রে বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, সাফল্যটি

আমরা লক্ষ করি শিয়া গোত্রের ক্ষেত্রে। সেই বিপ্লবের গণ-আন্দোলনী চরিত্রে আকর্ষিত হয়ে মানুষ রাস্তায় জীবন দিয়েছে কিন্তু আন্দোলন জঙ্গিবাদে পরিণত হয়নি। ওই বিপ্লবের সাফল্যের আরও একটি কারণ তার আধ্যাত্মিকতা। আয়াতুল্লাদের নেতৃত্বে পরিচালিত হলেও সে আন্দোলনে সমাজতন্ত্রী, কমিউনিস্টদেরও বিশেষ প্রভাব ছিল। আধ্যাত্মিকতার প্রসঙ্গে একটি নাম এখানে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হয়। তিনি হচ্ছেন আলী সরিয়তি নামে একজন বুদ্ধিজীবী এবং সমাজতন্ত্রী। শাহবিরোধী এই আন্দোলনের মূল দার্শনিক ভিত তিনি রচনা করেছিলেন ইসলাম ধর্মের (বিশেষ করে হাসান এবং হোসেনের মৃত্যু) আধ্যাত্মিকতার সঙ্গে অস্তিত্ববাদী দর্শন, বিশেষ করে ফরাসি দার্শনিক পল সার্ত্রে বা কাম্যু এবং মার্ক্সবাদী দর্শনের মতো নানা দৃষ্টিভঙ্গির সংযোজন ঘটিয়ে।

দ্বিতীয় ধাপ বলতে এখানে আমরা বুঝতে চাই আফগানিস্তানে সোভিয়েত সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে মুজাহিদদের সফল সশস্ত্র অভিযান। চরিত্রগতভাবে এই আন্দোলন পূর্বের আন্দোলনের তুলনায় একেবারে ভিন্ন ছিল। সমাজতন্ত্রকে পরাভূত করতে গিয়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইসলাম ধর্মকে উগ্র সমরবাদী দর্শনে কীভাবে পরিণত করেছিল সেটি সবার জানা। পাকিস্তানের সামরিক একনায়ক জেনারেল জিয়াউল হক মাদ্রাসা শিক্ষা কর্মসূচিতে জিহাদি চিন্তাকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। অর্থ ঢেলে মাদ্রাসা নির্মাণ, আফগানিস্তানে মুজাহিদিনদের প্রতি সামরিক, আর্থিক ও রাজনৈতিক সাহায্য ভান্ডার খুলে দিয়ে পবিত্র ধর্মবিশ্বাসকে আমেরিকা সামরিক জঙ্গিবাদে পরিণত করেছিল। ফলে দ্বিতীয় পর্যায়ের এই আন্দোলন জাতীয়তাবাদের বিরুদ্ধে পরিচালিত হয়নি। হয়েছে সমাজতান্ত্রিক মতাদর্শ এবং তার ধারক সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। এভাবে সুন্নিভিত্তিক এই আন্দোলন ইসলাম ধর্মকে সন্ত্রাস ও সন্ত্রাসবাদী জিহাদি আদর্শে পরিণত করে। তৃতীয় ধাপে রয়েছে আরও হিংস্র এবং বর্বর পদ্ধতি। তার বহিঃপ্রকাশ ঘটতে দেখি 'ইসলামি রাষ্ট্র' নামে খিলাফত প্রতিষ্ঠার সশস্ত্র সংগ্রামে। টুইন টাওয়ার আক্রমণ, ইরাক ও আফগানিস্তানে মার্কিন সামরিক অভিযানের ধাপ পার হয়ে সেই জঙ্গিবাদ এই তৃতীয় ধাপে পৌঁছায়। এখানে লক্ষণীয় দিক হচ্ছে জাতিরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র অবরোধ এবং তাকে প্রতিস্থাপন করে ইসলামি রাষ্ট্র বা ইসলামি খিলাফত প্রতিষ্ঠা করা। মধ্যপ্রাচ্যের শিয়া-সুন্নি রাজনৈতিক গোলকধাঁধায় আটকে গিয়ে এই বিশেষ আন্দোলন ইসলাম ধর্মকে পরিণত করেছে ভয়াবহ এক সন্ত্রাসী আদর্শে। এই সন্ত্রাসী আদর্শের কোনো স্থানীয় বাহক নেই। ইন্টারনেটের মাধ্যমে সারা বিশ্বে সে আদর্শ ছড়িয়ে পড়েছে, তাকে ঘিরে গড়ে তোলা হয়েছে বিশ্ব নেটওয়ার্ক, যা কিনা ভাসমান ও শেকড়বিহীন। ডিজিটাল সভ্যতার বদৌলতে আজ দূরত্ব এবং স্থান-কালকে উপেক্ষা করে ওই নেটওয়ার্কে আমরাও জড়িয়ে পড়েছি। ওই আদর্শের

সাহচর্যে আসছে সামাজিকভাবে উপেক্ষিত ও পরিত্যক্ত এক তরুণসমাজ।

আল-কায়েদা বা ইসলামিক স্টেটের যে কাঠামো গড়ে তোলা হয়েছে তার মধ্যে রয়েছে তার দুর্বলতার চিহ্ন। সেই দুর্বলতার দুটি দিক এখানে উল্লেখ করা যায়। একটি হচ্ছে সন্ত্রাসকে তারা যে অনিয়ন্ত্রিতভাবে বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে দিচ্ছে সেটি অনেকটা আন্তদেশীয় বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠানের মতো দেখায়। ম্যাকডোনাল্ড, কেএফসি যেমন বিভিন্ন দেশে তাদের ফ্র্যাঞ্চাইজির মাধ্যমে তাদের পণ্য বিক্রি করে রাজনৈতিক ইসলামের সাম্প্রতিক সংস্করণ আঞ্চলিক বা স্থানীয় জিহাদিদের মাধ্যমে সন্ত্রাসকে ছড়িয়ে দিচ্ছে। সন্ত্রাসকে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রণ করার কোনো নেতৃত্ব নেই। এর ফলে বিভিন্ন দেশের জিহাদিরা ন্যূনতম তদারকির বাইরে। এই নিয়ন্ত্রণহীন সন্ত্রাসের মধ্যে নিহিত তার ধ্বংসের অন্যতম কারণ। এই দিকটি বিশেষভাবে তুলে ধরেছেন ওয়েন বেনেট-জোনস তাঁর 'বানচেস অব গাইস' নামের প্রবন্ধে। দ্বিতীয় আরও একটি কারণ উল্লেখ করার মতো। তাদের ধনসম্পদের প্রতি বিশেষ মোহ। আমলাতান্ত্রিকতায় নিবিষ্ট হওয়ার একটি উদাহরণ হচ্ছে পাকিস্তানের তালিবান নেতা হাকিমুল্লাহ মেহসুদ। তাঁর ধনসম্পদের হিসাব সাংবাদিকেরা যখন পত্রিকায় ছাপে তখন থেকে পাকিস্তানের সোয়াত উপত্যকায় তালিবানের প্রভাব ক্ষুণ্ন হতে থাকে (দেখুন ওয়েন বেনেট-জোনস ১৯ ডিসেম্বর, ২০১৪)। এ থেকে ধর্মের রাজনৈতিকীকরণের বিশেষ প্যাটার্ন আমরা তৃতীয় বিশ্বের নানা মুসলিম দেশে লক্ষ করি, যেটি পাশ্চাত্যের তুলনায় ভিন্ন। পাশ্চাত্যে ধর্মীয় ব্যানার ব্যবহৃত হয়েছে পুরোনো সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে। মার্টিন লুথারের ধর্ম সংস্কারের আন্দোলনকে ধর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখা কঠিন হয়েছে। তার পরিধি যত প্রচ্ছন্নভাবেই হোক না কেন। ওই আন্দোলন আক্রমণ করেছে অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতাকাঠামোকে। খ্রিষ্টধর্মের পতাকা নিয়ে এসব আন্দোলন কোনো না কোনোভাবে অর্থনৈতিক পরিবর্তনে সহায়তা করেছে। প্রতিটি আন্দোলন কোনো না কোনোভাবে একটি বিশেষ যুগসন্ধিক্ষণে জন্ম নিয়েছে। ধর্মীয় স্লোগানের মূল উদ্দেশ্য অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংস্কার। সে কারণে পাশ্চাত্যের ধর্মগুলো কেবল আধ্যাত্মিকতার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। সমাজের মৌলিক কাঠামোগত পরিবর্তনে তারা সহায়তা করেছে। এই মূলকথাটি এঙ্গেলস তুলে ধরেছেন তার *প্রাচীন খ্রিষ্টান ধর্মের ইতিহাসে*। তিনি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের মধ্যে একটি সূক্ষ্ম পার্থক্য লক্ষ করেছিলেন। এঙ্গেলস লেখেন, 'এসব আন্দোলন প্রাচ্যে ধর্মীয় চাদরে আবৃত হলেও তার পেছনে কারণটি হলো অর্থনৈতিক। কিন্তু অর্থনৈতিক ব্যবস্থাটি এসব আন্দোলন সফল হলেও থেকে গেছে অপরিবর্তিত। অন্যদিকে, খ্রিষ্টীয় পাশ্চাত্যে ধর্ম জনপ্রিয় আন্দোলন বা বিক্ষোভে ব্যবহৃত হয়েছে ব্যানার হিসেবে। ধর্ম সেখানে পুরোনো

জরাজীর্ণ অর্থনৈতিক কাঠামোর বিরুদ্ধে আক্রমণের মুখোশ হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে মাত্র। পুরোনো ব্যবস্থার জায়গায় গড়ে উঠেছে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা' (এঙ্গেলস : ৪৮৩)। সে তুলনায় তৃতীয় বিশ্ব কেন ভিন্ন এবং কেন তার ভূমিকা সমাজ প্রগতির সঙ্গে সম্পৃক্ত নয়, তার একটি সম্ভাব্য ব্যাখ্যা পাওয়া যায় জুবাইদার লেখা 'ইকোনমিক অ্যান্ড পলিটিক্যাল অ্যাকটিভিজম ইন ইসলাম' প্রবন্ধে। তিনি দেখিয়েছেন বণিক ও বুর্জোয়া শ্রেণির স্বাধীন বিকাশের বিলম্বীকরণ প্রাচ্যের দেশগুলোতে এক বিশেষ জটিলতা সৃষ্টি করেছিল। ওই বিলম্বিত বিকাশের কারণে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণভার সম্পূর্ণভাবে ন্যস্ত হয়ে পড়ে আমলাতন্ত্র ও রাজনৈতিক এলিটদের ওপর। অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড থেকে আপেক্ষিক অর্থে মুক্ত থাকায় ধর্ম তাদের হাতে আমলাতান্ত্রিক হাতিয়ারে পরিণত হয়। এই প্রবণতা বিশেষভাবে প্রযোজ্য বাংলাদেশের ক্ষেত্রে। পাকিস্তানের অধীনে বাঙালি বণিক শ্রেণি ছিল অত্যন্ত ক্ষুদ্র এবং সংকুচিত। রাজনৈতিক ক্ষমতার বলয় থেকে দূরে অধস্তন অবস্থায় তাকে টিকে থাকতে হয়। পাকিস্তান শাসন থেকে মুক্তি পাওয়ার পর যে আদর্শিক কাঠামো বাংলাদেশ উত্তরাধিকার সূত্রে লাভ করে, সে কাঠামো ধর্মীয় অনুভূতির রাজনৈতিকীকরণের ওপর প্রতিষ্ঠিত ছিল। ইসলাম ধর্মকে আমলাতান্ত্রিক প্রশাসনিক ধর্মে পরিণত করা হয়েছিল। পাকিস্তানে তালিবান নেতার অর্থ সঞ্চয়ের প্রবণতা, নিজের আর্থিক ভাগ্যের প্রতি বিশেষ যত্নবান হওয়ার মধ্যে আমলাতান্ত্রিকতার প্রচ্ছন্ন ছোঁয়া পাওয়া যায়, যদিও এ ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত।

আমাদের দেশে ইদানীংকালে ওহাবি ধারার প্রভাব বৃদ্ধি পেয়েছে। ১৯৭৫ সালের রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের পর জেনারেল জিয়াউর রহমানের শাসনামলে আমাদের দেশ মধ্যপ্রাচ্যের সঙ্গে অর্থনৈতিক এবং মানব শ্রম রপ্তানি বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়ে। সেখানকার এই ওহাবি ধারার সঙ্গে আমরাও প্রত্যক্ষভাবে যুক্ত হয়ে পড়ি। সৌদি ওহাবি ধারার সঙ্গে এখানে আরও যুক্ত আছে দেওবন্দি ইসলামের ধারা। এই ধারার জন্ম হয়েছিল সিপাহি বিদ্রোহের পর। বিদ্রোহে ব্যর্থ হওয়ার পর ব্রিটিশ সরকার দিল্লির সব ধর্মীয় কেন্দ্র তাদের অধীন করে। অনেক উলামা যারা মোগল আমলে বিশেষ রাষ্ট্রীয় সুবিধা পেয়েছে তারা দিল্লি ত্যাগ করে এবং অনেকেই উত্তরের শহর দেওবন্দে পাড়ি দেয়। দেওবন্দ মুসলিম সংস্কৃতির কেন্দ্র এবং দিল্লি থেকে মাত্র ৯০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। দেওবন্দ এবং ওহাবি ধারার এক মিশ্রণ থেকে আমাদের দেশে জন্ম নিয়েছে একদিকে যেমন আধা গণ-আন্দোলনমুখী, আধা সন্ত্রাসমুখী জামায়াতে ইসলামীর মতো সংগঠনের, তেমনি নানা জাতীয় জঙ্গি এবং উগ্রবাদী ইসলামি সংগঠনের। এদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করার মতো জেএমবি নামের সংগঠনটি। এই সংগঠনের প্রতিষ্ঠা হয় ২০০৪ সালে। পরে সেটি দুই ভাগে ভাগ হয়ে যায়। একটি নিও জেএমবি নামে

আত্মপ্রকাশ করে। এর সঙ্গে ইদানীংকালের ইসলামিক স্টেটের সংযোগ লক্ষ করার মতো। এর নেতা তামিম কয়েক দিন আগে পুলিশের অভিযানে নারায়ণগঞ্জে মারা যান। ২০১৩ সালে আনসারুল ইসলাম এবং হিজবুত তাহরিরসহ আরও কিছু উগ্রপন্থী গ্রুপের সঙ্গে জেএমবি এক হয়। সেই সঙ্গে রয়েছে আরও একটি সংগঠন, যার নাম আনসারউল্লাহ বাংলা টিম। নিও জেএমবি তরুণদের নিয়ে গঠিত এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকে যথেষ্ট জ্ঞান রাখে। সেই সঙ্গে তাদের গ্রুপে আছে মাদ্রাসা শিক্ষিত তরুণ। জেএমবি এ পর্যন্ত ৪০ জনকে হত্যা করেছে, যার মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, ব্লগার, প্রকাশক রয়েছে। তাদের সংবাদ সংস্থার নাম আল-তামকিন। তারা ইসলামিক স্টেটের সাইট 'আমাক'কেও ব্যবহার করে (দেখুন ভট্টাচার্য, ২০১৬)। ইদানীংকালে আমরা লক্ষ করছি যে ৮০টি প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাস করা অনেক ছাত্র জঙ্গিবাদী কার্যকলাপে যুক্ত হয়ে পড়ছে। কী বিশেষ কারণে বাংলাদেশে উচ্চশিক্ষিত বা মধ্যবিত্ত ঘরের ছেলেমেয়েরা এবং কিছু মাদ্রাসার ছাত্র এই জঙ্গিবাদী আন্দোলনে অংশ নিচ্ছে, সেটি ভাববার বিষয়। তারা সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে নিপীড়িত বা নির্যাতিত নয়। তাদের অর্থের অভাব নেই এবং তারা সামাজিকভাবে ক্ষমতাবান। তা সত্ত্বেও তারাই আজকের ইসলামি জঙ্গিবাদের অগ্রবাহিনী। এর একটি ব্যাখ্যা আমরা পাই ফয়সাল দেবজির পর্যবেক্ষণ থেকে। তিনি মনে করেন, এই বিত্তবান তরুণ শ্রেণি জঙ্গিবাদে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে ব্যক্তিজীবনে সামাজিক বা অর্থনৈতিক নির্যাতনের কারণে নয়, বরং যে নির্যাতন ও বঞ্চনা তারা সমাজে প্রত্যক্ষ করে তার কারণে।

এই পর্যবেক্ষণের গুরুত্ব কতটুকু সেটি আমরা আমাদের সমাজকে দিয়ে উপলব্ধি করতে পারি। বিগত বিশ বছরে বাংলাদেশ অনেকখানি বদলে গেছে। কীভাবে এবং কতটুকু, সেটি আমরা হয়তো যেভাবে করার সেভাবে উপলব্ধি করিনি। যদি করেও থাকি তাহলে সেটি ভাসা ভাসা। স্বাধীনতার পরপরই বাংলাদেশে দুটি ভুবন গড়ে উঠেছে। একটি রাজনীতির। সেটি আজ পরিণত হয়েছে সংঘাতের প্রধান ক্ষেত্রে। সে ক্ষেত্র স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি, সুবিধাবাদ, আইনের শাসনে ঘাটতি, রাষ্ট্রশাসনে অদক্ষতা, অদূরদর্শিতা এবং আঞ্চলিকতায় নিমজ্জমান এক ক্ষেত্র। তার প্রভাবে এখানে রাজনীতি দিকদর্শনহীন এক সংঘাতময় পরিবেশ গড়ে তুলেছে। সেখানে না আছে কোনো আদর্শ যার পেছনে সমবেত হওয়া যায়; না আছে দিকনির্দেশনা, যাকে মূলধন করে সমাজজীবনে সম্পৃক্ত হওয়ার পথ খোলা থাকে। বাঙালি জাতীয়তাবাদের অধ্যায় শেষ হলেও নতুন সমাজ গড়ার জন্য নতুন আদর্শের প্রয়োজনীয়তাকে আমরা উপেক্ষা করেছি। অতীতের চর্বিত চর্বণ দিয়ে ভেবেছি মানুষকে বশে রাখা যাবে ক্ষমতার লড়াইয়ে জয়ী হতে। কিন্তু সেই ক্ষমতার বৈধতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। সেখানে হিংসা সবার

ওপরে স্থান করে নিয়েছে। পরিবারেও কোনো সুস্থ স্থান নেই। আধ্যাত্মিকতার নামে সেখানে রয়েছে পোশাকি ধর্ম পালন অথবা দুর্নীতির ফসল হিসেবে ভোগবাদী জগতের উপকরণে ভরপুর এক বলয়। মিথ্যার ওপর প্রতিষ্ঠিত বৃহত্তর সমাজ ও পরিবার। দুর্নীতি, বাহ্যিকতা, সস্তা উপভোগী জীবনচেতনার মধ্যে আকণ্ঠ নিমজ্জিত হয়ে দিকদর্শনহীন এক জীবন গড়ে তোলার উপদেশ রয়েছে সব খানে। শিক্ষাব্যবস্থাও এখানে লোকদেখানো, সংখ্যাতত্ত্ব হিসাবে প্রচুর মানুষ 'শিক্ষিত' হচ্ছে, অথচ শিক্ষার অন্তর্নিহিত মর্মবাণী নেই। এ ধরনের সমাজে মানুষ হিংস্র হবে না কেন? যে পরিবেশ আমরা সৃষ্টি করে রেখেছি, সন্ত্রাসী মনন উৎপাদনের কেন্দ্রে পরিণত হওয়ার জন্য তা বড়ই উর্বর।

অন্য যে জগৎ সেটি অর্থনীতির। সেখানেও অতিযান্ত্রিক, মুনাফা, শোষণ, তীব্র সামাজিক মেরুকরণের কারণে হাতে গোনা কিছু গোষ্ঠীর ধন সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে পরিণত হয়েছে। বিশ্বসমাজের সঙ্গে যোগাযোগ, যাকে আমরা বিশ্বায়ন বলি, আমাদের সমাজে অর্থের ঢল এনে দিয়েছে। সেদিকে তাকিয়ে আমরা ভেবেছি সমাজ এগিয়েছে। সম্পদ বেড়েছে। পোশাকআশাকে বাবুয়ানা ভাব এসেছে, যাতায়াত, খাবার, গাড়ির ব্যবহার বৃদ্ধি পেয়েছে। কিন্তু এরই মধ্য দিয়ে মানুষের আধ্যাত্মিক, মানবিক দিককে পিষে ফেলে এক বস্তুবাদী ভোগবাদী জীবন শেকড় গেড়ে বসেছে। তার ভয়াবহ দিকটা আমরা লক্ষ করিনি। ওই দুই বলয়ের পাশাপাশি রয়েছে বৃহত্তর সমাজ। তাকে সিভিল বা নাগরিক সমাজ বলা হয়। বিশাল মধ্যবিত্ত শ্রেণির শ্বাস-প্রশ্বাসের একমাত্র ক্ষেত্র হলেও সেখানে জীবন নেই, অসাড়, নিস্তব্ধ প্রাণহীন এক সত্তা হিসেবে দাঁড়িয়ে আছে। কেন ভুলে যাই ঠিক এই ধরনের ভোগবাদী নির্দয় সমাজকে প্রত্যক্ষ করেই ইসলামি মৌলবাদের গুরু সায়েদ কুতুব জন্ম দিয়েছিলেন সমরতান্ত্রিক ইসলামি দর্শনের। মার্কিন সমাজের উগ্র ভোগবাদের অন্তর্নিহিত ধ্বংসের চরিত্র সায়েদ কুতুব বুঝেছিলেন। সেই বুঝ থেকে বিংশ শতাব্দীর ষাট দশকের দিকে তিনি দেখিয়েছিলেন ওই সর্বভোগবাদী সমাজের সারসত্তাহীনতা। ওই ভোগবাদী সমাজকে মডেল ধরে বস্তুবাদী, দুর্নীতিবাদী, লক্ষ্যহীন সমাজ আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। তাকে পরিবর্তন করেনি কোনো শাসক। ক্ষমতা ও আত্মপ্রাপ্তিতে মগ্ন শাসক মানুষকে দূরে সরিয়ে দিয়েছে। অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক এই জটিলতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদকে প্রতিবাদের মূর্ত রূপ দিতে সাহায্য করেছে রাজনৈতিক ইসলাম। সেই ইসলাম যদিও 'ইসলামি রাষ্ট্রের' অতিমাত্রায় ক্রুদ্ধ বিধ্বংসী জীবনদর্শনকে মাধ্যম হিসেবে ব্যবহার করছে, তবে আমরা কেন এই বর্বর আদর্শ হাতে পেয়েছি তার একটি কারণ তো খুঁজতে হবে এখানেই।

ভুললে চলবে না এসবই ঘটছে এমন এক অঞ্চলে যার ইতিহাস সন্ত্রাসের ওপর

প্রতিষ্ঠিত, যেখানে ধর্মীয় বিভেদ জাতিরাষ্ট্র গঠনের মূল অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছে। দেশ বিভাগের রক্তাক্ত অধ্যায় এই উপমহাদেশের মনোজগৎকে স্থায়ীভাবে হিন্দু-মুসলমান বৈপরীত্য দিয়ে গড়ে তুলেছে। এখানে বাবরি মসজিদের মতো ঘটনা আছে, আছে ট্রেনে আগুন ধরিয়ে হিন্দু তীর্থযাত্রী হত্যার ঘটনা, গুজরাটের দাঙ্গা। বাংলাদেশে হিন্দু-বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নিপীড়নও ওই ঐতিহাসিক সাম্প্রদায়িকতার প্রলম্বিত ইতিহাস। এখানে পাকিস্তানের আণবিক মারণাস্ত্রকে ইসলামি বোমা বলা হয়। ভারতের আণবিক বোমাকে হিন্দু ভাবা হয়। দেশ বিভাগকালে কয়েক লাখ হিন্দু-মুসলিম হত্যা, কয়েক কোটি মানুষের উদ্বাস্তু হওয়ার নিদারুণ দুঃখের কাহিনি হিন্দু-মুসলিম সহিংসতার স্থায়ী এবং ঘনায়িত মেটাফোর হিসেবে আমাদের চেতনায় রয়ে গেছে। কেউ তার প্রভাব থেকে আমাদের মুক্ত করেনি। সব মিলিয়ে আমাদের সামনে আজ এক ভয়াবহ চ্যালেঞ্জ এসে দাঁড়িয়েছে, ঐতিহাসিক ও ইদানীংকালীন। সেই চ্যালেঞ্জ দুরূহ।

উপসংহার

এই প্রবন্ধের শুরুতে আমরা প্রখ্যাত ইংরেজ সাহিত্যিক জর্জ অরওয়েলের একটি উদ্ধৃতি ব্যবহার করেছি। কী কারণে ফ্যাসিবাদ একপর্যায়ে ইউরোপকে আকর্ষিত করেছিল তার ইঙ্গিত আমরা ওই উক্তি থেকে পাই। ইসলামিক স্টেটকে অনেকে ফ্যাসিবাদী আন্দোলন হিসেবে দেখেন। কিন্তু মুসলিম যুবসমাজের কাছে তার অভাবনীয় আকর্ষণী প্রতাপকে উপেক্ষা করা কারও পক্ষে সম্ভব নয়। ফ্যাসিবাদ বা আরও কোনো নাম দিয়ে তাকে চিহ্নিত করার মধ্যে আমি কোনো আত্মতৃপ্তি দেখি না। সমষ্টিবদ্ধ ভর্ৎসনা দিয়ে তাকে পরাভূত করা আমার মতে অকার্যকরী একটি কৌশল। এমনকি যুদ্ধজাহাজ, বোমা দিয়েও তাকে ধরাশায়ী করা কোনো কৌশল হতে পারে না। যে অন্যায়ের প্রতিবাদ থেকে এই আন্দোলনের উৎপত্তি তার মুখোমুখি হওয়া আজকের দিনের পবিত্র কর্তব্য। পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রায়শ্চিত্ত করার সময় এসেছে। এই প্রায়শ্চিত্ত বহু আগে থেকে মধ্যপ্রাচ্য এবং অন্যান্য দেশ যারা উপনিবেশবাদ বা মার্কিন আধিপত্যবাদের শিকার হয়েছিল তাদের ঐতিহাসিক পাওনা। সেই পাওনা না মিটিয়ে সমাধানের কোনো পথ আমাদের সামনে খোলা নেই। আজ বিশ্ব যে দ্বিমুখী সংকটে আক্রান্ত তার অনেকখানি ইউরোপ বা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নীতি এবং দার্শনিক আদর্শ থেকে উদ্ভূত বলে আমরা দাবি করতে পারি। সেই দার্শনিক আদর্শ কীভাবে ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত হলো তার একটি বর্ণনা আমরা পাই জার্মান দার্শনিক এইচ জি হেগেলের নানা লেখায়। তিনি ঐতিহাসিক প্রগতি দ্বান্দ্বিক প্রক্রিয়ার কারণে ঘটে বলে উনবিংশ শতাব্দীতে দাবি করেছিলেন। সামাজিক, সাংস্কৃতিক, বুদ্ধিবৃত্তিক,

অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে যেসব দ্বন্দ্ব বা সংকট দেখা দেয় তা নিরসনের মধ্য দিয়ে সমাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু তাঁর দাবি অনুযায়ী সেই নিরসনের প্রকৃত মালমসলা বিদ্যমান থাকে কেবল উদারনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত সমাজে, অন্য কোথাও নয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপ মহাদেশ উদারনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত। আমাদের দেশ বা অঞ্চলও ইউরোপীয় প্রভাবের কারণে উদারনীতির প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিল উপনিবেশ শাসনামলে। উদারনীতিবাদী দর্শনের যে মূল্যবোধ সেটি বলতে বোঝায় ব্যক্তিস্বাধীনতা, বিরোধী মতাদর্শের প্রতি সহনশীল হওয়া ইত্যাদি। এই মূল্যবোধগুলোকে বাস্তবায়নের জন্য ইউরোপ ধর্মনিরপেক্ষ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। কিন্তু সেই জাতিরাষ্ট্র আজ গভীর সংকটের মুখোমুখি। কেবল এশিয়া, আফ্রিকা বা লাতিন আমেরিকায় নয়। ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকায়, বস্তুত সবখানে। পশ্চিমা বিশ্ব বিশেষ করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মধ্যপ্রাচ্যের জাতিরাষ্ট্রকে ধ্বংস করছে তার সংকীর্ণ স্বার্থের কথা মাথায় রেখে। সে কারণে তাদের নীতির সঙ্গে ইসলামপন্থীদের মিল আছে। ইসলামপন্থী এই আন্দোলনও বিদ্যমান জাতিরাষ্ট্রের ধ্বংস কামনা করে। এই ধ্বংস শুরু হয়েছিল ইরাকে আক্রমণ চালিয়ে (২০০৩)। এরপর লিবিয়া এবং সব শেষে সিরিয়া। স্বৈরশাসনের দোহাই দিয়ে জোর করে মার্কিনদের মতো করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এই স্ট্র্যাটেজির ফলাফল হচ্ছে গৃহযুদ্ধ, ইসলামি উগ্রবাদের প্রভাব বৃদ্ধি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি বা সমাজকাঠামো উদারনীতির ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে কিন্তু তার বৈদেশিক বা পররাষ্ট্রনীতি উদারনীতিবিরোধী। সেখানে রাষ্ট্রের স্বার্থের দিকটিকে প্রাধান্য দিতে গিয়ে নানা ধরনের সন্ত্রাসী কার্যকলাপে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ক্রমাগত জড়িয়ে পড়ছে। সেই নীতির ক্ষেত্রে তাত্ত্বিক ও গুণগত পরিবর্তন আনা জরুরি। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতত্ত্ব বহুকাল ধরে জাতিরাষ্ট্রের স্বার্থকেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গির ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। সেই তত্ত্বের ক্ষেত্রে আমূল পরিবর্তন আনা আজ একান্তভাবে জরুরি। বিশ্বায়নের যুগে একক দেশের স্বার্থভাবনা আর উপযোগী ভাবা যায় না।

অন্যদিকে মধ্যপ্রাচ্য বা অন্যান্য দেশে জাতিরাষ্ট্রের সংকটের কারণ নিহিত রয়েছে সুশাসনের অভাবের মধ্যে, গণতন্ত্রহীন স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থার কারণে। তার আরও কারণ নিহিত রয়েছে দারিদ্র্য, অভাব, পরমতসহিষ্ণুতার ঘাটতি এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আত্মপরিচয়ের সংকটের মধ্যে। এই অভাবগুলোই জাতিরাষ্ট্রের প্রধান শত্রু। আজ ইসলামিক স্টেটসহ অন্যান্য ইসলামি আন্দোলন এই জাতিরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে। তারা খিলাফতকে আদর্শ রাষ্ট্র হিসেবে দেখে, যার ব্যাপ্তি কোনো দেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকার কথা নয়। কিন্তু সেই আন্দোলন প্রায় ফ্যাসিবাদী রূপ ধারণ করায় তার ব্যর্থতাকেও আমরা অনিবার্য ভাবতে পারি। ফলে সামাজিক আন্দোলনের ধরন কী হবে এবং প্রতিবাদের কোনটি সবচেয়ে উপযোগী

পথ বা সন্ত্রাস একমাত্র পথ কি না—এই ভাবনাগুলোকে একত্র করে সেখানেও পরিবর্তন আনা প্রয়োজন। প্রখ্যাত লেখক ডালরিম্পল উল্লেখ করেছেন যে পবিত্র ধর্মগ্রন্থ কোরআনে ২০০ আয়াত আছে, যেখানে কেবল প্রার্থনার কথা বলা আছে। আরও প্রায় ৬০০ আয়াতে সৃষ্টিকর্তার অসীম কাজ, গ্রহ-নক্ষত্র, গাছপালা, সৌরজগৎকে অনুধ্যান করা, তাকে জানা, ভাবা এবং বিশ্লেষণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। জালাল উদ্দিন রুমির মতো প্রখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ মাদ্রাসায় লেখাপড়া করেছেন। তিনি ইসলামি আইনে বিশেষজ্ঞ ছিলেন। তবে তাদের ক্ষেত্রে যেটি তাৎপর্যপূর্ণ তা হচ্ছে তিনি বা শেখ সাদি (পারস্য) কেউই কেবল ইসলাম ধর্মের মধ্যে ওই অনুধ্যানের প্রক্রিয়াগত দিককে সীমাবদ্ধ রাখেননি। তাঁরা হিন্দু ধর্ম এবং ইসলামের মধ্যে সংশ্লেষণের কথা বলতেও ইতস্তত করেননি। জ্ঞানের অন্তর্নিহিত সত্য উদ্ধার করতে অন্যান্য ধর্মের সহায়তা নিতে তাঁদের বাধেনি। কারণ জ্ঞান কেবল একটি ধর্মের মধ্যে নিহিত থাকে না। আর সে কারণে নিজের ধর্মকে কেবল শ্রেষ্ঠ ভেবে বাকিগুলোকে উপেক্ষা করা বা ধ্বংস করার প্রত্যয় ব্যক্ত করাকেও আমি নিতান্তই মানুষের প্রকৃতিবিরোধী ভাবি। সম্ভবত সেই দৃষ্টিকোণ থেকে রুমি বা ইবনে খালদুন বা ইবনে রুশদের মতো ইসলামের প্রখ্যাত পণ্ডিতেরা উদ্যোগী হয়ে নানা ধর্মের সংশ্লেষণের উপদেশ দিয়েছেন সৃষ্টির অন্তর্নিহিত গভীর সূত্রগুলো বুঝতে। দুঃখজনকভাবে রাজনৈতিক ইসলামের প্রভাবে এসব মিশ্রণ বা সংশ্লেষণ থেকে ইসলামি জীবনকে মুক্ত করার আন্দোলন আজ প্রবল থেকে প্রবলতর হচ্ছে। বিশ্বায়নের এই যুগে ধর্মের গুরুত্ব বা মানুষের জীবনে তার স্থানকে নতুনভাবে মূল্যায়ন করা জরুরি। জঙ্গিবাদ সেই মূল্যায়নে কোনো ভূমিকা না রাখলেও বাদ বাকি মুসলিম সমাজকে নতুন করে ভাবতে হবে, নতুন পথের অনুসন্ধান আজ সে কারণে বিশেষভাবে জরুরি।

গ্রন্থপঞ্জি

১. Wahhanism to ISIS: How Saudi Arabia Exported the Main Source of Global Terrorism by Karen Armstrong in *New Stateman*.

২. The Phony Islam of ISIS, *The Atlantic,* Feb 27 2015 by Caner K. Dagli.

৩. The Problem with Vows to 'Defeat' the Islamic State in *The Atlantic*, August 21, 2016.

৪. What's the Right Way to Think about Religion and ISIS? In *The Atlantic.*

৫. The Saudi Connection: Wahhabism and Global Jihad by Carol E. B. Choksy in *World Affairs*, May/June 2015.

৬. The Question of Theodicy and Juhad in War on the Rocks, Feb 26, 2015 by Ziya Meral.

৭. The Marxist Roots of Islamic Extremism by Damon Linker, March 25, 2016 in *The Week.*

৮. The Many Facets of extremism in the Islamic World by Mahesh Sachdev in *The Hindu,* July 16 2015.

৯. The Dilemma of Pakistan's Foreign Policy by Muhammad Akbar Notezai in *The Diplomat,* August 12, 2016.

১০. Stemming the Rise of Islamic Extremism in Bangladesh, in *HR* by Carl Ciovacco and Sajeeb Wazed, November 19, 2008.

১১. Saudi Arabia and Iran: The Cold war of Islam by Susanne Koelbl, Samiha Shafy and Bernhard Zand in *SPIGEL ONLINE,* May 09, 2016.

১২. Rise of "Neo JMB" and Post-Gulshan attack developments by Rupak Bhattacharjee 28 August 2016 in bdnews24.com.

১৩. Pakistan's Islamic Schools Fill Void, but Fuel Militancy by Sabrina Tavernise, May 3 2009 in *The New York Times.*

১৪. The Influence of Al-Mawdudi and the Jamat Al Islami Movement on Sayyid Qutb Writings by Asyraf Hj. A. B. Rahman and Nooraihan Ali in *World Journal of Islamic History and Civilisation*, 2 (4): 232-236, 2012.

১৫. Mawdudi and Qutb: Two Anti-Western Intellectuals in macrohistory.com

১৬. Sayed Qutb, Islamic Extremism & Philosophy by Arif Ahmed, April 1, 2015.

১৭. ISIS has not radicalized young Muslims, it has infantilized them- and that is why it is so powerful and dangerous by Robert Fisk in *The Independent*.

১৮. Inside the Madrasas by William Dalrymple in *The New York Review of Books,* December 1, 2005.

১৯. How Pakistan's Zia Handed The Batons of Bigotry to The Next Generation by Farahnaz Ispahani, January 31, 2016.

২০. The ISIS Shock by Steve Niva in *The Immanent Frame: Secularism, Religion and the Public Sphere (SSRC).*

২১. Pakistan's Black Day by Ahsan Chaudhary in *The Diplomat,* July 8, 2016.

২২. Political Conflicts, Extremism and Criminal Justice in Bangladesh, *International Crisis Group Report*, 11 April 2016.

২৩. How Israel Helped to Spawn Hamas in *Wall Street Journal* (http:/www.wsj.com/article.SB123275572295011847).

২৪. Noam Chomsky, The Costs of Violence: Masters of Mankind (Part 2) In *TomDispatch,* May 10, 2016.

২৫. The Idea behind ISIS by H.A.Hellyer in *MENASource.*

২৬. From U.S, the ABC's of Jihad by Joe Stephens and David B. Ottaway, *Washington Post*, March 23 2002.

২৭. The symbiosis of savagery by Dan Sanchez March 1, 2015 in antiwar.com.Blog

২৮. Fox's Shep Smith Accuses Greenwald of Equating US Troops with Terrorists by Matt Wilstein, June 23 2014, *Fox News.*

২৯. ISIS's Savage Strategy in Iraq by Lawrence Wright, June 16, 2014 in *The New Yorker.*

৩০. Bunches of Guys by Owen Bennett-Jones in *London Review of Books*,19 December 2013.

৩১. How should we think about the caliphate? By Owen Bennett-Jones in *London Review of Books*, 17 July 2014.

৩২. What does Obama really mean by "Violent Extremism"? in *The Atlantic*, Feb 20, 2015.

৩৩. Confused about the US response to ISIS in Syria? Look to Saudi Arabia by Patrick Cockburn, June 17, 2016 in *The UNZ Review.*

৩৪. Beyond Authencity: ISIS and the Islamic Legal Tradition by Sohaira Siddiqui in *Jadaliyya.*

৩৫. Faisal Devji, Landscapes of the Jihad, Militancy, Morality, Modernity by Stephan Claussin, *Archives de sciences socials des religions,* October – December 2006.

৩৬. American Pravda: How the CIA Invented "Conspiracy Theories" September 5, 2016 in *The UNZ Review*

৩৭. American Imperialism and the Rise of Islamic extremism in Syria and Iraq by Niles Williamson, 9 September 2014, *World Socialist Web Site.*

৩৮. Magical Thinking about ISIS by Adam Shatz in *London Review of Books*, 3 December 2015, Vol 37, no. 23.

৩৮. এগার বছরে ভয়ংকর উত্থান : জেএমবি, টিপু সুলতান, *প্রথম আলো*, ১৭ আগস্ট ২০১৬

৩৯. কেউ রাতারাতি জিহাদি হয়ে ওঠে না, আলী রিয়াজ, *প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট ২০১৬

৪০. গোড়াপত্তন আফগান মুজাহিদদের হাতে, টিপু সুলতান, *প্রথম আলো*, ৪ আগস্ট ২০১৬

৪১. চরম নৃশংসতা নিয়ে হাজির হয়েছে আইএস মতবাদ, টিপু সুলতান, *প্রথম আলো*, ৬ আগস্ট ২০১৬

৪২. জঙ্গি তৎপরতার কারণে সংকটে তরুণেরা, আলী রীয়াজ, *প্রথম আলো*, ৯ আগস্ট ২০১৬

৪৩. যেসব কারণে কেউ জঙ্গি হয়, আলী রীয়াজ, *প্রথম আলো*, ১০ আগস্ট ২০১৬

৪৪. দীর্ঘমেয়াদি সমাধান খুঁজতে হবে, আলী রীয়াজ, *প্রথম আলো*, ৮ আগস্ট ২০১৬

৪৫. শুধু ধর্মের মধ্যে সমাধান খোঁজা নয়, আলী রীয়াজ, *প্রথম আলো*, ১১ আগস্ট ২০১৬

৪৬. সালাফি মতাদর্শের ব্যক্তিদের নিয়ে উত্থান জেএমবির, টিপু সুলতান, *প্রথম আলো*, ৫ আগস্ট ২০১৬

৪৭. ২০ দল জামায়াতকে এভাবে না রাখার পক্ষে, *প্রথম আলো*, ২ আগস্ট ২০১৬

৪৮. নব্য জেএমবি এখনো হুমকি, টিপু সুলতান, *প্রথম আলো*, ১০ অক্টোবর ২০১৬



শেখ মুজিবুর রহমান : একটি ঝড় ও বাংলাদেশের অভ্যুদয়

জন পি থর্প

সারসংক্ষেপ

যে যুদ্ধের মাধ্যমে বাংলাদেশ নামক রাষ্ট্রের সৃষ্টি, সেই যুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে একটি দীর্ঘ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে। ১৯৪৭ সালে ধর্মের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের জন্ম হলেও, শুরু থেকেই পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার বিদ্যমান ভিন্নতাগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের প্রতি, যা বর্তমানে বাংলাদেশ, পশ্চিম পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠীর বিমাতাসুলভ আচরণের ফলে সাংস্কৃতিক ভিন্নতাগুলোর সঙ্গে সঙ্গে অর্থনৈতিক বৈষম্য দিন দিন প্রকট রূপ ধারণ করে। এসব কারণে মানুষ বরাবরই নিজেদের মুক্ত দেশের, মুক্ত নাগরিক হিসেবে দেখার প্রয়োজন অনুভব করতে থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা সৃষ্টির প্রক্রিয়ায় শেখ মুজিবুর রহমানের সৃষ্ট বিশেষ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধ কীভাবে ধীরে ধীরে জন-আকাঙ্ক্ষায় পরিণত হয়, তা এই প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়। মুজিব তাঁর বক্তৃতা-বিবৃতির মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের যে নিজস্ব স্বাধীন সত্তা রয়েছে, সে বোধ সাধারণ জনগণের মধ্যে জাগ্রত করেন। মুজিব নিজে যেমন এই পরিস্থিতি-জাত একজন নেতা ছিলেন, তেমনি তিনি নিজেও এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ভূমিকা পালন করেছেন। ১৯৭১ সালের মার্চের মধ্যে মুজিব এক আদর্শ সৃষ্টি করেছিলেন, যেটা বাঙালি বিবেককে একটা সামষ্টিক রূপ দিতে সক্ষম হয়। মুজিব কিছু প্রতীক নির্মাণ করেছিলেন, যেটা মানুষের আবেগকে রাজনৈতিক লক্ষ্যে মাঠে নামার জন্য পরিচালিত করে—শেষমেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। এই প্রতীকগুলো নির্মাণে তৎকালীন বাস্তবতা, প্রাকৃতিক দুর্যোগ, বিভিন্ন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ, প্রচলিত ধর্মীয় বিশ্বাস ইত্যাদি বিষয় কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল, তা এই প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

শেখ মুজিবুর রহমান, বাংলাদেশ, ছয় দফা, নির্বাচন, স্বায়ত্তশাসন, মুক্তি, স্বাধীনতা, মুক্তিযুদ্ধ, প্রতীক ধর্ম।

ভূমিকা

না, স্রেফ 'ঔপনিবেশিক শোষণ', 'নৃতাত্ত্বিক সীমাবদ্ধতা' বা 'শ্রেণিস্বার্থ' দিয়ে মানুষকে রাস্তায় বন্দুকের ধোঁয়া ওঠা নলের সামনে পাঠানো যায় না। যদিও এসব বর্গ ব্যবহার করে অনেক লেখক (জাহান ১৯৭২ এ ও ১৯৭২ বি; মদন ১৯৭৪ ও মনিরুজ্জামান ১৯৮০ ও ১৯৮২) বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের সুচিন্তিত সামাজিক কাঠামোগত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। আবার শুধু আর্থসামাজিক বৈষম্যের কারণেও মানুষ গণহারে এভাবে আন্দোলন করেনি, এমনকি পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীর ব্যাপক বলপ্রয়োগ সত্ত্বেও। এটা বোঝার জন্য বিশ্ববীক্ষা, সামাজিক মূল্যবোধ ও সংস্কৃতি যে মানুষের মধ্যে অভিন্ন প্রতীকী মূল্যবোধ গড়ে তোলার মাধ্যমে তাকে অনুপ্রাণিত করে, তা বোঝা দরকার। এই প্রবন্ধে শেখ মুজিবুর রহমানের সৃষ্ট বিশেষ বিশ্ব দৃষ্টিভঙ্গি ও মূল্যবোধে আলো ফেলা হয়েছে।

এই প্রতীকী আচরণ মানুষের এক অপরিহরণীয় সামাজিক সত্য, মানুষ হওয়ার এক মৌলিক উপাদান। মানুষ যখন একে অপরের সঙ্গে কথা বলে, বস্তুর নামকরণ করে, কোনো কিছুর দাবি করে ও কিছু মাত্রায় পরস্পরকে বুঝতে পারে, তখন তারা একরকম প্রতীকী ব্যবহারের মধ্যে প্রবেশ করে। মানবীয় এই প্রতীকী ব্যবস্থাই আসলে মানুষের সামাজিক ও ব্যক্তিক মনস্তত্ত্বের ছাঁচ গড়ে দেয়। রাষ্ট্রের সঙ্গে রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে প্রতীকী মডেল ও বৃহত্তর বিশ্বের প্রক্রিয়াকে মেলানোর মাধ্যমে মানুষ আসলে বুঝতে পারে, সে কে। ব্যক্তি হিসেবে সমাজের মধ্যে তার স্থান কোথায়।

কথা হচ্ছে, শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুখপাত্র হিসেবে বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতাদের মধ্যে আত্মসত্তার বোধ এবং সামাজিক শ্রেণির অন্তর্গত মানুষ হিসেবে তাঁরা কোথায় যাচ্ছেন, সেই বোধ সৃষ্টি করেছেন। গার্টজের ভাষায় (১৭৩ : ২১৮-২০), মুজিব মানুষকে আদর্শের সন্ধান দিয়েছেন। পাকিস্তানের সামাজিক ব্যবস্থায় এসব ঐতিহাসিক উপাদান না থাকলে মুজিবের পক্ষে বাংলাদেশের মুখপাত্র হওয়া সম্ভব ছিল না। মুজিব বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক প্রতীকের সাপেক্ষে নিজের রাজনৈতিক অবস্থান নির্ধারণ করেছেন। এই প্রতীক ছাড়া মুখপাত্র মুজিবের বলার কিছু ছিল না। নিচের সারণি ১-এ দেখানো হয়েছে মুজিব কীভাবে বিভিন্ন ঘটনার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের প্রতীকী মডেলকে আরও দানা বেঁধে উঠতে সহায়তা করেন।[১]

আসলে ১৯৭০ সালের নির্বাচনকে ঘিরে জনপরিসরে রাজনৈতিক আকাঙ্ক্ষা গড়ে উঠতে শুরু করে, সাইক্লোন-পরবর্তী সরকারের পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে যেটা জনরোষে পরিণত হয়, নির্বাচনের পর যা আবার আনন্দময় আর মার্চের শেষের দিকে রমরমা হয়ে ওঠে। এর প্রতিটি স্তরেই এমন সম্ভাবনা ছিল যে গণতান্ত্রিক

সারণি-১ : ১৯৭০ সালের নির্বাচন ও তার পরিণাম

ধাপ	ফলাফল-১	ফলাফল-২	ফলাফল-৩
১. প্রচারণা	আগস্ট ১৯৭০ : ডিসেম্বরের নির্বাচনের প্রচারণা শুরু হয়।	নির্বাচন বাতিলের সন্দেহে আশার বেলুন চুপসে যায়।	আওয়ামী লীগ ছয় দফা নিয়ে এগিয়ে যায়।
২. সাইক্লোন	১৩ নভেম্বর দক্ষিণ উপকূলে সাইক্লোন আঘাত হানে। প্রতিযোগী দলগুলো নিজেদের নাম প্রত্যাহার করে নেয়।	বিধ্বস্ত উপকূলের মানুষের প্রতি সরকারের অবহেলায় জনরোষ সৃষ্টি।	রূপক : '১০ লাখ শহীদ' : জীবনের প্রতি হুমকিস্বরূপ সংকটের ঘনঘটা।
৩. দানা বাঁধা	ডিসেম্বর ১৯৭০ : আওয়ামী লীগ নির্বাচনের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়ে, দলীয় কর্মীর মৃত্যু, ভুট্টোর বর্জন	আত্মবিশ্বাস, উৎসাহ, কিন্তু আশঙ্কাও ছিল।	বাংলাদেশের আদর্শ, উদ্বোধনী মিছিল, সতর্ক থাকুন, রায় যাতে বদলে না যায়, লাঠি প্রস্তুত রাখুন।
৪. ক্রান্তিকালীন চূড়ান্ত পরিণতি।	১ মার্চ : জাতীয় পরিষদের অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য স্থগিত ঘোষণা।	জনরোষের জায়গায় জনমনে আনন্দ।	'দরকার হলে আরও ১০ লাখ শহীদ হবে'—অসহযোগ আন্দোলন, মুজিবের হাতে স্থানীয় প্রশাসন।

রাজনৈতিক প্রক্রিয়াকে পেছন থেকে ছুরি মারা হতে পারে। মুজিব যেমন এই পরিস্থিতি-জাত একজন নেতা ছিলেন, তেমনি তিনি নিজেও এই পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে ভূমিকা পালন করেছেন।

বিশেষ করে সাইক্লোন-পরবর্তী পরিস্থিতিকে মুজিব খুব ভালোভাবে ব্যবহার করতে পেরেছেন। এই দুর্যোগের পর তিনি প্রচারণার মাধ্যমে বাঙালিদের কেন্দ্রীয় সরকারের মুখোমুখি অবস্থানে দাঁড় করিয়ে দিলেন। বিশেষ করে স্বায়ত্তশাসনের প্রশ্নে তিনি এই প্রচারণাকে এক অনন্য জায়গায় নিয়ে গেলেন। সাইক্লোন কোনো

সংকট নয়। এটা পূর্ব পাকিস্তানের জীবনের স্বাভাবিক অনুষঙ্গ। কিন্তু এই সাইক্লোনের পর মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের জনমনে এ ধারণা সৃষ্টি করতে পারলেন, তাঁদের জীবনের ওপর এক হুমকি রয়েছে। আর যতক্ষণ তাঁরা দেশের রাজনৈতিক ব্যবস্থার বৈপ্লবিক রূপান্তর ঘটাতে না পারছেন, ততক্ষণ এই হুমকি থেকেই যাবে।

১৯৭১ সালের মার্চের মধ্যে মুজিব এক আদর্শ সৃষ্টি করলেন, যেটা বাঙালি বিবেককে একটা সামষ্টিক রূপ দিতে সক্ষম হয়। ব্যাপারটা এমন জায়গায় চলে গেল যে মানুষ তখন শুধু প্রতিবাদ করতে নয়, দীর্ঘদিনের অধীনতাকে সক্রিয়ভাবে প্রতিরোধ করার জায়গায় নিয়ে যায়। মুজিব কিছু প্রতীক নির্মাণ করলেন, যেটা মানুষের আবেগকে রাজনৈতিক লক্ষ্যে মাঠে নামার জন্য পরিচালিত করে শেষমেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র যুদ্ধের দিকে ধাবিত করে। অনেকেই মনে করতেন, মুজিব বাংলাদেশকে যে প্রতীকী রূপ দিয়েছিলেন তার জন্য লড়াইও যেমন করা যায়, তেমনি প্রাণও দেওয়া যায়।

এক. নির্বাচনী প্রচারণা

১৯৭০ সালের নির্বাচনের মাধ্যমে সংবিধান সভা গঠন করার কথা ছিল, যার মাধ্যমে পাকিস্তানে বেসামরিক শাসন ফিরে আসবে। এই নির্বাচনের মাধ্যমে প্রতিটি প্রদেশের জন্য জনসংখ্যাভিত্তিক প্রতিনিধিত্ব নির্বাচিত হওয়ার কথা ছিল, যেটা পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ছিল নতুন এক অভিজ্ঞতা। আগের নির্বাচনে পাকিস্তানের দুটি অংশের সমান প্রতিনিধিত্ব ছিল। ফলে যে অংশের জনসংখ্যা বেশি ছিল, তারা বঞ্চিত হতো। এই প্রথমবারের মতো পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতাদের সামনে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা লাভ করার সুযোগ এল। পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিরা ভাবলেন, পশ্চিম পাকিস্তান এত দিন তাঁদের সঙ্গে যে অন্যায় করে আসছিল, সেগুলো নিরসন করার সুযোগ এসেছে। ফলে নির্বাচনের প্রচারণা ছিল ব্যাপক আর মানুষের আগ্রহও ছিল তুঙ্গে।

যদিও প্রচারণার সময় মুজিবের কথামালায় এসব প্রতীকী উপাদান ছিল, যেগুলো পরবর্তীকালে বাংলাদেশের প্রতীকে রূপান্তরিত হয়, সেগুলো তখনো ক্যারিশম্যাটিক রূপ লাভ করেনি। নভেম্বরের সাইক্লোনের পর সেটা এই রূপ লাভ করে। তাঁর প্রচারণার আবেদনের সারমর্ম দাঁড়ায় এ রকম : ছয় দফার ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন জরুরি, শহীদদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন যৌক্তিক ও আইনানুগ।

নির্বাচনের প্রচারণার সময় শেখ মুজিব এ বিষয়ে জোর দেন যে প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসনের ব্যাপারে কোনো আপস করা হবে না। তিনি এই নির্বাচনকে আওয়ামী লীগের ছয় দফা দাবির ন্যায্যতার প্রশ্নে গণভোট মনে করতেন।

বাংলাদেশের জন্য যাঁরা শহীদ হয়েছেন, তাঁদের স্মৃতির উদ্দেশে এই কর্মসূচি বাস্তবায়নের প্রতিশ্রুতি দেন শেখ মুজিব, যদি তিনি জনগণের রায় পান। তাঁর ব্যবহৃত প্রতিটি শব্দের সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা দেওয়া প্রয়োজন।

স্বায়ত্তশাসন

১৯৭০ সালের মধ্যে 'স্বায়ত্তশাসন' পাকিস্তানের রাজনীতিতে বিরোধীদের পবিত্র দাবিতে পরিণত হয়। আসলে এই শব্দটি দিয়ে ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচিতে যে আলগা ফেডারেশনের প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, সেটাই বোঝানো হয়েছে, যেখানে স্বাধীন পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের মুক্ত নাগরিকত্ব দেওয়া হবে। মুজিব সব সময়ই স্বাধীনতা ও মুক্তির সঙ্গে স্বায়ত্তশাসনকে মেলাতেন। ইংরেজিতে মুজিব এই তিনটি শব্দের পার্থক্য করতে পারতেন। 'স্বাধীনতা' বলতে তিনি আসলে ১৯৪৭ সালের ব্রিটেন থেকে পাওয়া স্বাধীনতাকে বোঝাতেন। 'মুক্তি' বলতে স্বাধীন দেশে 'মুক্ত নাগরিকদের' অধিকার বোঝাতেন। ১৯৪৭ সালে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর থেকেই পাকিস্তান স্বাধীন। কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে, শেখ মুজিব বাংলা ভাষায় এই তিনটি শব্দের মধ্যে পার্থক্য করার ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন না। মুজিব ইংরেজিতে যা বোঝাতেন, বাংলাতেও যে সেটা বোঝাতেন, তা নয়। ফলে মুজিব ইংরেজিতে যা বলতেন, সেটা রাজনৈতিকভাবে আপত্তিজনক না হলেও, বাংলা ভাষা ব্যবহারের এই দ্ব্যর্থবোধকতার কারণে তাঁর বিপ্লবী ও স্বাধীনতাকামী সমর্থকেরাও সন্তুষ্ট হতেন।

ছয় দফা কর্মসূচি

আওয়ামী লীগের ১৯৬৬ সালের ছয় দফা কর্মসূচি বাস্তবায়ন করে স্বায়ত্তশাসন অর্জন করা হবে। মূলত ১৯৬৫ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর শেখ মুজিব এ প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। এই যুদ্ধের শুরুতে অধিকাংশ বাঙালি মুসলমানই পাকিস্তানের পক্ষেই ছিলেন। যদিও যুদ্ধ যত এগোতে শুরু করল, ততই এটা পরিষ্কার হয়ে গেল যে পূর্ব পাকিস্তান পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতা কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন, আর ভারতীয় আক্রমণের মুখে সে একদম প্রতিরক্ষাহীন। এই বিচ্ছিন্নতার কারণে অনেকের মনে গভীর নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি হয়। আইয়ুব সরকারের পশ্চিম পাকিস্তানকেন্দ্রিক নীতির পরিণতি কী হতে পারে, এই যুদ্ধ থেকে সেটা পরিষ্কার বোঝা গেল। ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মুজিব ছয় দফা কর্মসূচি পেশ করেন : প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকার, ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন, যার হাতে থাকবে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র, প্রাদেশিক সরকারের হাতে নিজস্ব মুদ্রাব্যবস্থা, রাজস্ব বিভাগ, বৈদেশিক বাণিজ্য ও আধা সামরিক বাহিনী থাকবে।

এই ছয় দফার সঙ্গে আগের স্বায়ত্তশাসনের দাবির পার্থক্য হলো, এতে রাজস্ব ও বৈদেশিক বাণিজ্যের চুক্তি করার ক্ষমতা প্রাদেশিক সরকারের হাতে দেওয়া হয়েছে। যাহোক, এই ছয় দফা দাবি পূর্ব পাকিস্তানের রাজনীতির গতিমুখ বদলে দেয়। এর আগে পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক তৎপরতার মাজেজা ছিল এ রকম, পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আরও বেশি কিছু করার জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের কাছে দেন-দরবার করা। এবার আওয়ামী লীগ দাবি করল, পূর্ব পাকিস্তানের বাঙালিদের নিজেদের জন্য আরও বেশি কিছু করার সুযোগ দিতে হবে।

আইয়ুব খান সরকার খুব দ্রুত এই ছয় দফা কর্মসূচি দমন করল। মুজিবসহ অন্য শীর্ষ আওয়ামী লীগ নেতাদের গ্রেপ্তার করা হয়। আর ১৯৬৭ সালের ডিসেম্বরে ষড়যন্ত্র করে পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম পাকিস্তানের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন করার অভিযোগে তাঁদের বিরুদ্ধে বিচারিক কার্যক্রম শুরু হয়। বিচারের সময় পূর্ব পাকিস্তানজুড়ে ছয় দফা নিয়ে ব্যাপক আলোচনা হয়। ১৯৭০ সালের নির্বাচনী প্রচারণায় ছয় দফার ভিত্তিতে যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি তোলা হয়েছিল, সে প্রশ্নে আর আপস করার সুযোগ থাকল না। মুজিব আর তখন ছয় দফার সঠিকতা, বেঠিকতা বা সম্ভাব্যতা নিয়ে কথা বলেননি। আওয়ামী লীগ যদি নির্বাচনে প্রয়োজনীয় সংখ্যাগরিষ্ঠতা পায়, তাহলে এসব দাবি সংবিধানে যুক্ত করা হবে।

বাংলাদেশ

মুজিবের প্রচারণায় তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ উপাদানটি ছিল দেশ (নিজের ভূখণ্ড)। বাঙালির কাছে দেশ মানে হচ্ছে বাস্তুভিটা ও তার আশপাশের খেত। সেটা হয়তো আরও একটু সম্প্রসারিত হয়ে পাশের গ্রাম, বাজার ও সংশ্লিষ্ট শহর পর্যন্ত যায়। এ ছাড়া আর সবকিছুই বিদেশ। মাটিই হচ্ছে দেশের প্রধান অনুষঙ্গ। যে মানুষেরা এই মাটির জাত, একই খাবার খায়, একই ভাষায় কথা বলে, একই পোশাক পরে, তারা একই দেশের মানুষ। আঞ্চলিক ভাষায় দেশ শব্দটি দিয়ে বাঙালিরা কাউকে সমগোত্রীয় মনে করে, আবার কাউকে আলাদা করে। বাঙালি জাতীয়তাবাদীরা এই শব্দটিকে আরও বৃহত্তর অর্থ দিতে চেয়েছেন, তাঁরা এটার অন্তজেলা ব্যঞ্জনাকে আন্তজেলায় রূপান্তরিত করার চেষ্টা করেছেন। উদাহরণস্বরূপ বলা হয়, সেই ১৯২০-এর দশকে সি আর দাশ পুরো বাংলার পরিপ্রেক্ষিতে দেশ শব্দটি ব্যবহার করেছেন। মুজিব যে বাংলাদেশ শব্দটি ব্যবহার করেছেন, তাতে তিনি বেশ নিরাপদভাবেই বাঙালি জাতীয়তাবাদী ঐতিহ্যের মধ্যেই থেকেছেন, যদিও তিনি পূর্ব পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে কথাটি বলেছেন। মুজিবের যুক্তি ছিল এ রকম : যারা বাংলাদেশের মাটিতে থাকে, তারা সবাই একই চেতনাসম্পন্ন মানুষ। ফলে এই মাটিতে যা হচ্ছে, তার নিয়ন্ত্রণ হাতে নেওয়ার নৈতিক অধিকার তাদের আছে।

পাকিস্তান প্রদেশ হওয়ায় এ অঞ্চলের মানুষ সেই অধিকার পায়নি। তারা পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণের শিকার হয়েছে।[২]

মুজিব যে দেশের কথা বলেছেন, তা মানুষের মনে এক আদিম সন্তুষ্টি উৎপাদন করেছে, যেটা আবার বাঙালির লক্ষ্যকে প্রতীকী মূল্যও দেয়। অবাঙালি মুসলমানেরা দেশকে বিদেশ (পাকিস্তান) থেকে আলাদা হিসেবেই দেখল। নির্বাচনী প্রচারণায় শেখ মুজিব খুব সতর্কতার সঙ্গে 'বাংলাদেশ' শব্দটির ব্যবহার পূর্ব পাকিস্তানের প্রদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ করেন। কিন্তু দেশের মতো একটি স্থানীয় ও আঞ্চলিক শব্দকে সর্বজনীন রূপ দেওয়ার যে অন্তর্নিহিত দ্ব্যর্থবোধকতা রয়েছে, তার ফলে মুজিবের কিছু সমর্থক বিচ্ছিন্ন হওয়ার দাবিও তোলেন। স্বাধীনতার (স্বায়ত্তশাসন ও মুক্তি) মতো দেশের নানামাত্রিক অর্থ রয়েছে। মুজিবের কথামালার এই নানাবিধ ব্যঞ্জনার কারণে তাঁর প্রচারণার আবেদন আদর্শের রূপ নেয়, অংশত। ফলে মুজিব নতুন শব্দ ব্যবহার না করেও অনেক সময় বেশ বিপ্লবী হয়ে যেতে পারতেন।

শহীদের রক্ত

মুজিব বলতেন, বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের দাবি সঠিক ও যৌক্তিক। পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক ইতিহাসে যাঁরা রক্ত দিয়েছেন, তাঁদের সবার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হয়েছে। এই শহীদদের শ্রদ্ধা জানানোর প্রথাটা ১৯৭০ সালের দিকে একরকম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। এমনিতে ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ব পাকিস্তানে শহীদ দিবস হিসেবে পালিত হতো। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার হচ্ছে ভাষা আন্দোলনের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর মূল জায়গা। সব স্কুল-কলেজেও শহীদ মিনার আছে। অন্যদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে যাঁরা মারা গেছেন, তাঁদেরও ১৯৭০ সালের মধ্যে শহীদ হিসেবে গণ্য করা হলো।[৩] ১৯৬৭ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলায় যাঁরা সামরিক কারাগারে মারা গিয়েছিলেন, তাঁরাও শহীদের কাতারে নতুন করে স্থান পান। কালো পতাকা তোলা, কালো ব্যাজ পরা ও খালি পায়ে শহীদ মিনারে যাওয়ার মধ্য দিয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর রীতি গড়ে ওঠে। ফলে ২১ ফেব্রুয়ারি সত্যিকার অর্থেই বাঙালির জাতীয় দিবসে পরিণত হয়।

বিষয়টা আরও জটিল হয়ে যায় এ কারণে, শহীদদের রক্ত যেমন পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয়তাবাদী প্রতীকে পরিণত হয়, তেমনি এই রক্ত মুসলমানদেরও প্রতীকে পরিণত হয়। এই প্রতীকের ধর্মীয় ভিত্তিও আছে। ৬৩২ খ্রিষ্টাব্দে হজরত মুহাম্মদের (দ.) মৃত্যুর পর মুসলিম উম্মাহ্‌র নেতৃত্ব নিয়ে দ্বন্দ্ব-সংঘাত সৃষ্টি হয়। নবীর নাতি বংশধর হিসেবে নেতৃত্ব দাবি করলে আরেক দল এর বিরোধিতা করে

বলে, জন্মসূত্রে নয়, যোগ্যতার গুণেই নেতৃত্ব নির্ধারিত হবে। প্রথমত, হাসানকে বিষ প্রয়োগে হত্যা করা হয়, এরপর হুসেন ৬৮০ খ্রিষ্টাব্দে কারবালার যুদ্ধে প্রাণ হারান। প্রতিবছর মহররমের সময় তাঁদের এই শাহাদাতবরণের দিবস পালন করা হয়। এ দিনটি মুসলিম ক্যালেন্ডার অনুযায়ী বছরের প্রথম দিন। তবে বাঙালি সুন্নি মুসলমানেরা এ দিনটি উত্তর ভারতের মুসলমানদের মতো জাঁকজমকের সঙ্গে পালন করে না। বাঙালিরা আসলে মহররমের মিছিলের সঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলের মিল খুঁজে পায়। এ ছাড়া যে অবাঙালি মুসলমানদের হাতে বাঙালি শহীদ হয়েছেন, তাঁদের অনেকেই আবার শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত। এই অসামঞ্জস্যটি বাঙালি মুসলমান ভুলতে পারেনি।

যে ভাষা আন্দোলনে বাঙালি প্রথম শহীদ হয়, সেটি কিন্তু নিঃসন্দেহে নৃতাত্ত্বিক, জাতীয়তাবাদী ও ধর্মনিরপেক্ষ ব্যাপার ছিল। তা ছাড়া এই আন্দোলন কিন্তু ইসলামের জাতি গঠনের ভূমিকা থেকে একদম বিচ্ছিন্ন নয়। পূর্ব পাকিস্তানের অনেক মুসলমানই এটা মনে করতেন, পাকিস্তান, যার অর্থ হচ্ছে পবিত্র ভূমি, সেই পাকিস্তান নামক দেশে কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের সঙ্গে বিমাতাসুলভ আচরণ করা হচ্ছে। সেই পাকিস্তান আবার কীভাবে বাঙালি মুসলমানদের হত্যা করছে। কথা হচ্ছে, আওয়ামী মুসলিম লীগ যে ১৯৫৩ সালে তথাকথিত ধর্মনিরপেক্ষ হলো, সেটা কিন্তু মুসলিম মূল্যবোধকে অস্বীকার করে হয়নি। পাকিস্তানের নেতারা ইসলামের নামে যে সাম্প্রদায়িকতা শুরু করেছিলেন, তাতে বিরক্ত হয়ে তাঁরা মুসলিম শব্দটি নাম থেকে বাদ দিয়েছিলেন। মুজিবুর রহমান এ সময় রাজনৈতিক নেতা হিসেবে পরিপক্ব হয়েছেন। বাঙালি শহীদের রক্ত কথাটি তখন তিনি বহুবার ব্যবহার করেছেন। আসলে এই শহীদের রক্ত ছিল পূর্ব পাকিস্তানের দাবির ইসলামি যুক্তি, যেটা বাংলা ভাষার চেয়েও অনেক কার্যকর প্রতীক ছিল।

মুজিব এ দাবিও করেছিলেন, শহীদদের রক্তের প্রতি সত্যনিষ্ঠ থাকতে বাঙালিদের দাবির ব্যাপারে অবিচল থাকতে হবে। তখন আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া শহীদদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা দেখানোর শামিল ছিল। এ ধরনের দৃঢ়তা প্রয়োজনীয় ছিল, কারণ নির্বাচন হবে কি না, সে নিয়েই অনেক সন্দেহ ছিল। তিনি বারবার এ ব্যাপারে সতর্ক করে দিতেন, ফলে মানুষের সন্দেহ আরও পাকাপোক্ত হতো। শিক্ষক, ছাত্র, দোকানদার, রিকশাচালক—সবাই এ ব্যাপারে নিশ্চিত ছিলেন যে নির্বাচন হবে না। বন্যার কারণে নির্বাচন অক্টোবর থেকে পিছিয়ে ডিসেম্বরে নিয়ে যাওয়ার কারণে এ সন্দেহ আরও ঘনীভূত হয়।

মুজিব এই সন্দেহ কাজে লাগিয়ে শহীদদের রক্তের প্রতি শ্রদ্ধা জানাতে গণ-আন্দোলন শুরু করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এতে তাঁর প্রচারণায় মানুষের উৎসাহ সৃষ্টি হয়। নির্বাচন হোক বা না হোক, তিনি ইতিবাচক ও ধারাবাহিক

আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।

শেষমেশ সাংস্কৃতিক বীর হিসেবে মুজিব যে ভাবমূর্তি গড়ে তোলেন, তাতে তাঁর বিশ্বাসযোগ্যতা বেড়ে যায়। মানুষের মনে যে জাতীয়তাবাদী শহীদ নেতাদের স্মৃতি ছিল, তার সঙ্গে মুজিবের বেশ মিল ছিল। কারণ, বাংলাদেশের জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি বহুদিন জেল খেটেছেন। আর আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার বিচার প্রকাশ্যে করার কারণে পূর্ব পাকিস্তানের সাহিত্যিক, ছাত্র, কর্মী ও জনতা এতটা সহিংস হয়ে উঠেছিল, যার জেরে আইয়ুব খানের পতন হয়। তবে তার আরও কিছু কারণ ছিল। শেখ মুজিব ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে যেদিন ছাড়া পান, সেদিন ঢাকায় এক বিশাল বিজয় মিছিল হয়েছিল। সেদিন আনুষ্ঠানিকভাবে মুজিবকে 'বঙ্গবন্ধু' উপাধি দেওয়া হয়। এ ধরনের উপাধি সাধারণত বাঙালি রাজনৈতিক বীরদের দেওয়া হয়। ১৯৬৯ সালে মুজিব বাঙালি জাতীয়তাবাদী আদর্শ ও আকাঙ্ক্ষার মূর্ত প্রতীক হয়ে ওঠেন, অন্য কোনো রাজনীতিক তাঁর ধারেকাছে যেতে পারেননি। তাঁর জনসভায় নিয়মিতই লাখ দশেক লোক হতো। মুজিব নিজের ক্যারিশমা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, সে কারণে তিনি সব সময়ই নিজেকে পূর্ব পাকিস্তানের মুখপাত্র হিসেবে দাবি করতেন।

মোদ্দা কথা হলো, মুজিব বিভিন্ন প্রতীকের এক জটিল সমন্বয় তৈরি করেছিলেন, যেটা বাঙালির আগ্রহকে রাজনৈতিক লক্ষ্যের দিকে ধাবিত করেছিল। 'বাংলাদেশ', 'স্বায়ত্তশাসন' প্রভৃতি শব্দের দ্ব্যর্থবোধকতার জন্য এবং ছয় দফা কর্মসূচির অযথার্থ ও আদর্শ রূপের জন্য মুজিবের পক্ষে এটা দাবি করা সহজ ছিল যে তিনি পাকিস্তানের অখণ্ডতাকে হুমকি জানাচ্ছেন না। ফলে একই সময়ে মুজিবের বিপ্লবী সহচরদের পক্ষে নিজের প্রতীক ও শব্দ ব্যবহার করেই বাংলাদেশের স্বাধীনতার কথা প্রচার করা সম্ভব হয়েছে। একই শব্দের এ রকম ভিন্ন ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব হয়েছে বলে এসব প্রতীক জ্যোতির্ময় হয়ে উঠেছে। আর নভেম্বরের সাইক্লোনে পূর্ব পাকিস্তানে ব্যাপক ধ্বংসযজ্ঞ হওয়ায় এসব প্রতীক পুনর্বিন্যাস করা সম্ভব হয়েছে। এতে তাঁর পক্ষে শহীদদের রক্তের প্রতীকের ওপর জোর দেওয়া সম্ভব হয়েছে।

দুই. সাইক্লোন

১২-১৩ নভেম্বর রাতে বাংলাদেশের উপকূলে যে প্রলয়ংকরী ঘূর্ণিঝড় বা সাইক্লোন হয়, তাতে লক্ষাধিক মানুষ প্রাণ হারায়। জানমালের ক্ষতিও হয় ব্যাপক। এর ব্যাপকতা সম্পর্কে জানতে একটু সময় লেগে যায়। তবে ১৬ নভেম্বর থেকে সংবাদপত্রে খবর আসতে থাকে, পাকিস্তান সরকার এ ব্যাপারে চরম ঔদাসীন্য ও অমনোযোগ দেখাচ্ছে। সংবাদপত্রগুলো অভিযোগ করে, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয়

সরকার উদ্দেশ্যমূলকভাবে ত্রাণ না পাঠিয়ে বেঁচে যাওয়া মানুষদের না খাইয়ে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিচ্ছে।

আবার অনেকেই পূর্বাভাসব্যবস্থার ব্যর্থতা নিয়ে সোচ্চার হন। বন্যানিয়ন্ত্রণ ও বাঁধ নির্মাণে সরকারের ব্যর্থতার জন্যও অনেকে সমালোচনা করেন। ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টির মওলানা ভাসানীও সরকারের বিরুদ্ধে অনাস্থা ঘোষণা করে গণ-আন্দোলনের ডাক দেন (*পাকিস্তান অবজারভার*, ২৫ নভেম্বর)।

সাইক্লোনের সময় মুজিব আক্রান্ত এলাকাতেই নির্বাচনী প্রচারণা চালাচ্ছিলেন। পরবর্তী দুই সপ্তাহে তিনি উপদ্রুত এলাকা একদম চষে ফেলেন। তিনি সরকারের অবহেলার তীব্র সমালোচনা করেন। ২৭ নভেম্বর ঢাকা ফিরে তিনি সরকারের ব্যাপক সমালোচনা করে নিজের অবস্থানের সারসংক্ষেপ পেশ করেন (রহমান ১৯৭২ : ১৩-১৯)। এই বিবৃতির কারণে তাঁর প্রচারণার আবেদন অন্য স্তরে পৌঁছে যায়। মুজিবের ভাষায়, প্রত্যেক বাংলাদেশিই তখন সত্যিকার অর্থেই হুমকির সম্মুখীন। মুজিবের নালিশই হচ্ছে এই বিবৃতির প্রাণ :

> স্বাধীন রাষ্ট্রের নাগরিক হিসেবে আমাদের জন্মগত অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। সকল সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় রাওয়ালপিন্ডি ও ইসলামাবাদে। সকল ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার ও আমলাতন্ত্রের হাতে। বাংলাদেশের প্রতি অপরাধমূলক অবহেলা ও বৈষম্য করার জন্য আমি আজ তাদের অভিযুক্ত করব, যার কারণে আমরা প্রকৃতির খেয়ালের কাছে অসহায় হয়ে পড়েছি। আমাদের ১০ লাখ মানুষ মারা গেছে। আর ৩০ লাখ মানুষ মৃত্যু ও ধ্বংসের মাঝে বেঁচে থাকার সংগ্রাম করে যাচ্ছে।

শেখ মুজিব অভিযোগ করেন, পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সাইক্লোনের মাধ্যমে সচেতনভাবে মানুষকে হত্যা করছে। তারা ১০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করেছে। হ্যাঁ, বাড়াবাড়ি করতে গিয়ে তিনি কিছুটা নিষ্ঠুর হয়েছেন। কিন্তু এই সংকটের সময় এটা শক্তিশালী রাজনৈতিক উৎপ্রেক্ষায় (metaphor) পরিণত হয়, যেটাকে স্রেফ অযৌক্তিক অতিরঞ্জন বলা যাবে না। গার্টজের (১৯৭৩ : ২১০-১৩) মতে, একটি সফল রাজনৈতিক উৎপ্রেক্ষার মধ্যে কয়েক স্তরের অর্থময়তা থাকে, যেখানে এক স্তরের অসামঞ্জস্য, আরেক স্তরে অর্থের অন্তঃপ্রবাহ সৃষ্টি করে। গার্টজ বোধ করেন, উৎপ্রেক্ষা যত বেশি নির্মম হবে, তথ্যগত দিক থেকে যত ভুল হবে আর সে কারণে অসামঞ্জস্য থাকবে, ততই সেই উৎপ্রেক্ষা সফল হবে।[৪] সন্দেহ নেই, সাইক্লোন সৃষ্টির মাধ্যমে একটি সরকার মানুষ হত্যা করেছে—এমন অভিযোগ অসামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু এই অভিযোগ বাংলাদেশিদের মনে সরকারের অবহেলার কারণে যে ক্ষোভ সৃষ্টি করেছিল, তাকে এক বিন্দুতে নিয়ে আসে। ফলে প্রত্যেক বাংলাদেশির মনে যে জীবনের হুমকিস্বরূপ যে সংকট ছিল তার তুলনায় এই অসামঞ্জস্য গুরুত্বহীন হয়ে পড়ে। ঘটনার ভয়াবহতার মাত্রা, জীবনহানি এবং

এ রকম বিপর্যয় ভবিষ্যতে আবারও ঘটবে কি না, সে-বিষয়ক যে অনিশ্চয়তা ছিল, তার কারণে পল ব্র্যাসের ভাষায় (১৯৮১ : ১-২০) সাইক্লোনটা সর্বোচ্চ রাজনৈতিক সংকটে পরিণত হয়।

মুজিব জীবনঘাতী সংকট হিসেবে সাইক্লোনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তাতে তিনি বাঙালি মুসলমানের মৃত্যুবিষয়ক মনোভাব নিয়ে খেলা করেছেন।

ইসলাম ধর্মানুসারে, মানুষের যে চারটি বিষয় আল্লাহর হাতে তার একটি হচ্ছে মৃত্যু (মওত); অন্যগুলো হচ্ছে জন্ম, রিজিক বা জীবিকা ও সম্পদ। মানুষের জীবনের এই চারটি দিক নিয়েই তার ভাগ্য গঠিত হয়। এটা প্রতিষ্ঠা করেছেন আল্লাহ স্বয়ং। প্রতিবছর শবে বরাতের (থর্প ১৯৭৮ : ৫৫-৭, ১০৯-১১) রাতে এই ভাগ্যের নবায়ন হয়। এমনকি সাইক্লোনে যে পরিমাণ মানুষের মৃত্যু হলো, তা বাঙালি মুসলমানের কাছে সংকট নয়। প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার জন্য তা হুমকিও নয়। এই এত মানুষের মৃত্যুকে আল্লাহর ইচ্ছা বলে ব্যাখ্যা করা যায়। বাংলাদেশি মুসলমান এই চারটি জিনিসের যে ধারণা পোষণ করে, তাতে বিশ্বাসীর দিক থেকেও সাড়া দেওয়ার আহ্বান থাকে। একজন মানুষ মৃত্যু, জীবিকা ও সম্পদ হারানোর ঘটনায় কীভাবে প্রতিক্রিয়া জানায়, সেটা গুরুত্বপূর্ণ। মুসলমানদের আদর্শ ও গৃহীত আচরণ অনুসারে প্রত্যেক মুসলমানকে সাড়া দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। আল্লাহ এর মাধ্যমে ইসলামের প্রতি মানুষের সমর্পণের মাত্রা পরীক্ষা করেন। ব্যক্তির কাছ থেকে যেমন যথাযথ আচরণ প্রত্যাশা করা হয়, তেমনি যাঁরা ইসলামের ভ্রাতৃত্বে বিশ্বাস করেন, তাঁদের সবার কাছ থেকে যথাযথভাবে যৌথ সাড়া প্রত্যাশা করা হয়। মুজিব সাইক্লোনের যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তার নজর ছিল সমাজের প্রতিক্রিয়ার দিকে, যেটা ভালো মুসলমানের কাছ থেকে প্রত্যাশা করা যায়। মুজিবের অন্তর্নিহিত যুক্তিটি ছিল এই রকম যে এই মাত্রার একটি প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনায় দেশের মুসলমানদের সাড়া দেওয়া উচিত। পাকিস্তান সরকার সেটা না করে মুসলমান রাষ্ট্রের মতো কাজ করেনি। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার হচ্ছে, সাইক্লোনে যাঁরা মারা গিয়েছিলেন, তাঁদের শহীদ আখ্যা দিয়ে মুজিব বোঝাতে চাইলেন, সরকারের এই অবহেলা পূর্বনির্ধারিত, সে কারণে এটা হত্যাকাণ্ড। আর মুজিব যখন একবার এটা প্রতিষ্ঠিত করলেন যে সরকার গণহারে মানুষ মেরেছে, তখন পাকিস্তান সরকারের আর কোনো বৈধতা রইল না। পাকিস্তানের মুসলিম শাসকেরা সবচেয়ে নিকৃষ্ট পর্যায়ের অবিশ্বাসীর কাজ করেছে। তারা প্রতিটি বাংলাদেশির জন্যই হুমকি। কারণ, তারা যদি একবার এত মানুষকে মারার মতো ঔদাসীন্য দেখাতে পারে, তাহলে তারা আবারও সে কাজ করতে পারে। মুজিব দেশবাসীর কাছে আবেদন জানালেন, তাঁরা যেন আবারও এভাবে মারা না পড়েন। তাঁরা যেন এই অন্যায় পরাধীনতা মেনে না নিয়ে

লড়াই করে শাহাদাতবরণ করেন। ২৭ নভেম্বর তিনি এই আলটিমেটাম দিয়ে দোষারোপের রাজনীতি শেষ করেন :

বাংলাদেশ এখন জেগে উঠেছে। যদি নির্বাচন বানচাল না হয়, নির্বাচনের মধ্য দিয়ে তারা রায় দেবে। আর তা করা হলে বাংলাদেশের মানুষ মনে করবে...

এই লাখ লাখ শহীদের উৎপ্রেক্ষাটি প্রচারণা পর্বকে সাধারণ দেওয়া-নেওয়ার রাজনীতি থেকে বের করে আনে। অর্থাৎ মুজিব এর মধ্য দিয়ে একটি প্রক্রিয়া শুরু করেন, 'সাংস্কৃতিক বন্ধন' নির্মাণের প্রচেষ্টা, যেটা এক অভিজ্ঞতা সৃষ্টি করে (টারনার, ১৯৭৭ : ৯৪-১১৮), যেটা চূড়ান্ত পর্যায়ে ওঠে মার্চ মাসে।[৫] মুসলিম পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে মুজিব পাকিস্তানের কাঠামো বদল করার চেষ্টা করেছেন। লাখ লাখ শহীদের চিত্রকল্প তৈরি করে মুজিব এক অপরিবর্তনীয় বাংলাদেশের নিয়ম প্রতিষ্ঠার অঙ্গীকার করেন। তিনি এমন এক দেশের আহ্বান জানান, যেখানে সত্যিকার অর্থেই মুসলমানদের মধ্যে ভ্রাতৃত্ব থাকবে। ফলে মুজিব আর তখন স্বাধীন পাকিস্তানের মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের অধিকার আদায়ের আন্দোলন করছিলেন না। মুজিব যেহেতু পরবর্তী মাসগুলোতে নিজের যুক্তি প্রমাণ করছিলেন, বাঙালি তখন বুঝতে পারে, অবলুপ্ত হওয়ার হাত থেকে বাঁচতে হলে নতুন ব্যবস্থা নির্মাণ নৈতিকভাবে জরুরি। মুজিবের প্রচারণার আবেদন ছিল এ রকম: লাখ লাখ শহীদের রক্তের বিনিময়ে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন লাভ করা সঠিক ও ন্যায্য/ছয় দফা দাবির আলোকে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন লাভ করা খুবই জরুরি।

মুজিবের প্রচারণার আবেদনে শুধু রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম ছিল না, তার মধ্যে নতুন এক আদর্শও ছিল, যেটা এক নতুন জাতি নির্মাণ করতে পারত।

এখন মুজিব হয়ে গেলেন বাংলাদেশের অবিসংবাদী ক্যারিশম্যাটিক মুখপাত্র (দেশের প্রতিশব্দ)। এদিকে মুজিব '১০ লাখ শহীদের' প্রতীক ও স্লোগান ব্যবহার করা শুরু করার পরপরই অন্য রাজনৈতিক দলগুলো দাবি করে বসে, নির্বাচন আবারও পেছাতে হবে। আপাতভাবে এর কারণ ছিল, ত্রাণ তৎপরতা পরিচালনা করা। তবে বাস্তবতা ছিল এ রকম, আওয়ামী লীগের কাছে তাদের পরাজয় একদম দৃশ্যমান ছিল। তাদের আন্দোলন যখন ব্যর্থ হলো ও শুধু আক্রান্ত অঞ্চলের নির্বাচন স্থগিত করা হলো, তখন তারা নির্বাচন থেকে নিজেদের প্রত্যাহার করে নিল। এরপর দেখা গেল, ৭ ডিসেম্বরের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানের ৫৮ শতাংশ ভোটার ভোট দিলেন। ৩১৩টি আসনের মধ্যে আওয়ামী লীগ ৫৩ শতাংশ আসন পেল। বিস্ময়করভাবে, জুলফিকার আলী ভুট্টোর পাকিস্তান পিপলস পার্টি দ্বিতীয় সংখ্যাগারিষ্ঠতা পেল। এরা পশ্চিম পাকিস্তানের ২৭ শতাংশ আসন পেল। মূলত পাঞ্জাব ও সিন্ধু প্রদেশে তারা বেশি

আসন পেয়েছিল (মনিরুজ্জামান, ১৯৮০: ৭১-২: সেনগুপ্ত ১৯৮১: ২২৬; জাহান, ১৯৭২ বি: ১৯০)। ওদিকে ভুট্টো প্রকাশ্যেই ছয় দফা দাবির বিরুদ্ধে ছিলেন। আর নির্বাচনে জয়ের ব্যবধানের কারণে তিনি আরও বেশি আপসহীন হয়ে ওঠেন। ওদিকে মুজিবও যে নির্বাচনে এত বড় ব্যবধানে জিতবেন, সেটা ভাবা যায়নি। তিনি জনসমক্ষে বলেছিলেন, ৯০ শতাংশ ভোট পাবেন তিনি (*ডন*, ১০ অক্টোবর)। বস্তুত, তিনি ৯৮ শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন। ফলে একটি স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশকে হাতের নাগালেই দেখা যাচ্ছিল।

তিন. শিলীভূতকরণ

মুজিব যখন গণপরিষদের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তাঁর ব্যবহৃত প্রতীকগুচ্ছ আদর্শের রূপ নিচ্ছিল। গার্টজ (১৯৭৩: ২১৮-২০) একে আদর্শ হিসেবে চিহ্নিত করেন। অর্থাৎ এটা এক মিথস্ক্রিয়ামূলক প্রতীকের ব্যবস্থা, যার মধ্য দিয়ে পরস্পর ক্রিয়াশীল অর্থের সুনির্দিষ্ট ধরন গড়ে ওঠে, যার মধ্যে অন্তত কাজের আধা বাস্তব এক পরিকল্পনা দৃশ্যমান হয় (মুলিনস, ১৯৭২: ৫০৭)। আদর্শের এই প্রতীকী বিন্যাসের মধ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট পরিস্থিতির জন্য যৌথ চেতনা গড়ে ওঠে। কথা হচ্ছে, মুজিব যে লাখ লাখ শহীদের কথা বলেছেন, তা কিন্তু তিনি শুধু রাজনৈতিক সুবিধা নেওয়ার জন্য বলেননি (জাহান, ১৯৭২ বি: ১৯১)। এই প্রতীক পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের রাগ-ক্ষোভকে ভাষা দিয়েছে। এই প্রতীকের মধ্য দিয়ে তিনি বোঝানোর চেষ্টা করেছেন, প্রতিটি মানুষের জীবনই হুমকির মুখে রয়েছে, সংকটাপন্ন। প্রত্যেক বাঙালিই শহীদ হওয়ার অপেক্ষায় রয়েছে। আর এই সংকট থেকে বেরিয়ে আসার জন্য মুজিব দেশবাসীকে একটি পরিকল্পনাও দেন। আর নির্বাচনে বিজয়ের মধ্য দিয়ে মুজিব ছয় দফা দাবি বাস্তবায়নের অঙ্গীকার করতে সক্ষম হন, যার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসন নিশ্চিত হবে। অর্থাৎ মানুষের সংকটের নিরসন হবে। ডিসেম্বর থেকে মার্চ পর্যন্ত মুজিব এ প্রতীকগুলো এস্তেমাল করেছেন। একই সঙ্গে, তিনি কাজের পরিকল্পনাও পেশ করেছেন, যাতে প্রতিটি শ্রেণি-পেশার বাঙালি বঞ্চনার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর নৈতিক বল পায়। মুজিব আসলে একগুচ্ছ প্রতীক নির্মাণ করেছিলেন, যেটা বাঙালির আবেগকে সংকল্পবদ্ধ রাজনৈতিক আন্দোলনের দিকে নিয়ে গেছে, যেটা শেষমেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে সশস্ত্র সংগ্রামের রূপ নেয়।

মুজিব নিজের নেতৃত্ব কায়েম করতে সময় অপচয় করেননি। প্রথমত, তিনি ঘোষণা দেন, বাংলাদেশের মানুষ ছয় দফা অনুমোদন করেছে, তাই সংবিধান ছয় দফার আলোকেই প্রণীত হবে (*পাকিস্তান অবজারভার*, ১০ ও ২০ ডিসেম্বর)। দ্বিতীয়ত, মুজিব সুনির্দিষ্টভাবে দাবি করেন, কেন্দ্রীয় সরকার ত্রাণ কার্যক্রমের

দায়িত্ব যেন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের হাতে দেয়। তিনি সরাসরি মঞ্জুরি দাবি করেন, ঋণ নয়। তৃতীয়ত, মুজিব সব রাজনৈতিক নেতার মুক্তি দাবি করেন (*পাকিস্তান অবজারভার*, ৩০ ডিসেম্বর)। চতুর্থত, ১৯৭১ সালের ৩ জানুয়ারি রমনার রেসকোর্সে এক বিশাল সমাবেশে মুজিব আওয়ামী লীগের নবনির্বাচিত প্রতিনিধিদের শপথবাক্য পাঠ করান। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁদের বাংলাদেশের প্রতিনিধি হিসেবে পরিচয় করিয়ে দেন। এসব ঘটনায় মুজিবের বাংলাদেশ এক নাটকীয় রূপ পায়।

৩ জানুয়ারির অভিষেক সমাবেশ এক অসাধারণ প্রথার রূপ পায়। বক্তার ডায়াসটি ছিল ১২০ ফুট লম্বা, সেটি আওয়ামী লীগের নির্বাচনী প্রতীক নৌকার আদলে বানানো হয়েছিল। পবিত্র কোরআন তেলাওয়াতের মধ্য দিয়ে সমাবেশ শুরু হয়। সেখানে সাইক্লোনে মারা যাওয়া ব্যক্তিদের জন্য বিশেষ দোয়াও করা হয়। সমাবেশের সভাপতি হিসেবে আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকেরা মুজিবকে গার্ড অব অনার দেন। বিউগলের সুরে পার্টির পতাকাও তোলা হয়। 'জয় বাংলা, বাংলার জয়' গানের সঙ্গে মুজিব নৌকা-আকৃতির ডায়াসের পর্দা উন্মোচন করেন। নৌকার পালে বাংলাদেশের মানচিত্র ও পার্টির স্লোগান 'জয় বাংলা' লেখা ছিল। মুজিব ১৭টি সাদা পায়রা উড়িয়ে দেন, ছয় দফার জন্য ছয়টি এবং ১১ দফার জন্য ১১টি সাদা পায়রা। দেখা গেল, একটি পায়রা পালের জয় শব্দটার ওপর গিয়ে বসল। লোকে এটাকে শুভ লক্ষণ হিসেবেই দেখল। দর্শকেরা রবীন্দ্রসংগীত 'আমার সোনার বাংলা' গাইলেন। এরপর প্রায় ১০ লাখ মানুষের সামনে মুজিব শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। তিনি আল্লাহ ও শহীদদের নামে তাঁদের প্রতি আহ্বান জানান, তাঁরা যেন জীবনের বিনিময়ে হলেও ছয় দফা ও ১১ দফার প্রতি আস্থাভাজন থাকেন। প্রতীকী কাজ ও মৃদুস্বরে কথা বলা হচ্ছে যেকোনো আচার-অনুষ্ঠানের প্রাণ। এসব সুনির্দিষ্ট কাজ ও শপথের ভাষা আওয়ামী লীগের একতা ও সংকল্পকে দৃষ্টিগ্রাহ্য রূপ দিয়েছিল। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল যে বাংলাদেশিদের সামষ্টিকভাবে এই আবেগ লালন করতে আকৃষ্ট করা হলো।

এরপর মুজিব সমাবেশের মূল ভাষণটি দিলেন। তাঁর ভাষণের মধ্যে বিজয়ের আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। কিন্তু তার মধ্যে আসন্ন বিপদের আশঙ্কাও ছিল। তিনি ১০ লাখের বেশি জনতাকে উদ্দেশ করে বলেন, যদিও তাঁরা নির্বাচনে জিতেছেন, আসল সংগ্রাম কেবল শুরু হয়েছে :

> আমরা জনগণের প্রতিনিধি, আমরা একটি সংবিধান রচনা করব। আমাদের মহান নেতা সোহরাওয়ার্দীর কথা উদ্ধৃত করি : 'জাতির কাজ-কারবারে জনগণের রায়ই চূড়ান্ত।' কেউ যদি এই রায়ে নাক গলায়, তাহলে রক্তপাত হবে। আর সঙ্গে হবে বিদ্রোহ, যেটা কেউ দমিয়ে রাখতে পারবে না। (রহমান ১৯৭২ : ৩৬)

এই নাক গলানোর ব্যাপারে উদ্বিগ্ন হওয়ার যথেষ্ট কারণ ছিল। কারণ, ডিসেম্বরে আওয়ামী লীগের নেতাদের ওপর কয়েক দফা হামলা চালানো হয়েছিল। এমনকি এমন গুজবও ছিল, মুজিবকে হত্যার চেষ্টা করা হয়েছে (*ডন*, ১৩ ডিসেম্বর)। চট্টগ্রাম ও খুলনায় আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীদের হত্যা করা হয়েছে (*পাকিস্তান অবজারভার*, ১২ ও ২৪ ডিসম্বের)। মুজিব সমবেত জনতাকে বলেন, তাঁরা যেন তাঁদের মধ্যকার সন্ত্রাসীদের প্রতিরোধ করেন :

> রাতের বেলা ছুরি মেরে মানুষ হত্যা করে বিপ্লব করা যায় না। আমি এই তথাকথিত সন্ত্রাসী, তাদের দালাল ও উপদেষ্টাদের সতর্ক করে দিচ্ছি, এ রকম সহিংসতা তারা যেন আর না করে। দলের লোকদের বলব, তারা যেন এদের প্রতিহত করতে প্রস্তুত থাকে। প্রতিটি গ্রামে দলকে সংগঠিত করুন। বাঁশের লাঠি ও সুন্দরী কাঠ দিয়ে এই সন্ত্রাসীদের প্রতিহত করুন। কিন্তু আমি না বলা পর্যন্ত আপনারা এই লাঠি ব্যবহার করবেন না। আপনারা এমন কিছু করবেন না, যাতে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। এখন শান্তিও দরকার। সে কারণেই উসকানি, যেমন—আমাদের দলের লোকেদের খুন করা, সত্ত্বেও আমরা সহিষ্ণুতা দেখাচ্ছি। (রহমান, ১৯৭২ : ৩৯)

নির্বাচনের পর এক মিশ্র পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। ছিল দোদুল্যমানতা। একদিকে যেমন আনন্দ ছিল, অন্যদিকে তেমনি ছিল আশঙ্কা—এরপর কে শহীদ হবেন? আবার সাইক্লোনের কারণে যে জীবন হারানোর সংকট সৃষ্টি হয়েছিল, সেটিও চলছিল। আওয়ামী লীগের বিজয়ের ব্যবধানের কারণে দেশে উত্তেজনার মাত্রা বেড়ে যায়। বাঙালিদের একটি পার্টি এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা পেয়েছে, এটা পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক নতুন বিষয় হিসেবে আবির্ভূত হয়। এর মধ্য দিয়ে আগের রাজনীতি থেকে একটা বিচ্যুতিও ঘটে। আবার মার্চের অসাধারণ ঘটনার জন্য প্রস্তুতিও ছিল।

এই সময় মুজিব মানুষকে সতর্ক থাকার যে আহ্বান জানিয়েছেন, তাতে তিনি বারবার লাখ লাখ শহীদের স্মৃতি জাগানোর চেষ্টা করেছেন। তিনি আদর্শ উপস্থাপনের এক নতুন প্রতীকী তরিকা পেশ করেন। তিনি আবার বারবার মানুষকে লাঠি প্রস্তুত রাখার আহ্বান জানান। যারা মানুষের ইচ্ছাকে নাকচ করার চেষ্টা করবে, তাদের প্রতিহত করে শহীদের রক্তের প্রতি সম্মান দেখাতে হবে। লাঠি বাংলাদেশের নিজস্ব এক অস্ত্র। লাঠিখেলায় এর ব্যবহার হয়। মহররমের মিছিলেও কখনো কখনো লাঠিখেলার আয়োজন করা হয়। তবে মুজিব যে লাঠি প্রস্তুত রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা কোনো নতুন রাজনৈতিক রীতি ছিল না। সেই ১৯ শতকের ফরায়েজি আন্দোলনে লাঠি প্রতীকী শক্তি ও সংকল্পের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে (এম খান, ১৯৬৫)। ১৯৭১ সালে লাঠি এক জনপ্রিয় প্রতীকে পরিণত হয়, যার মধ্যে সাংস্কৃতিক, ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় উপাদানের সমন্বয় ঘটেছিল। আর অস্ত্র হিসেবে তো তার একটা উপযোগিতা

ছিলই। বিশেষ করে, শেখ মুজিবের বাড়িতে ছুরি বহন করার সময় এক কথিত হত্যাকারীকে ধরার পর লাঠি আরও জনপ্রিয় হয়ে ওঠে (*পাকিস্তান অবজারভার*, ৯ জানুয়ারি)। সংসদের অধিবেশন বসতে কোনো কারণে দেরি হতে পারে, এই আশঙ্কা থেকে মুজিব বাংলাদেশিদের একতার ওপর জোর দেন। তিনি আহ্বান জানালেন, নিজেদের অধিকার রক্ষায় প্রয়োজনে রক্ত দিতে হতে পারে। আর যারা জনগণের আকাঙ্ক্ষা নস্যাৎ করার চেষ্টা করবে, তাদের রক্ত ঝরানোর জন্যও প্রস্তুত থাকতে হবে।

মধ্য ফেব্রুয়ারিতে যখন ঘোষণা করা হলো, ৩ মার্চ ঢাকায় অধিবেশন বসবে, তখন ভুট্টো ঘোষণা দিলেন, তাঁর পার্টি অধিবেশনে যোগ দেবে না (*পাকিস্তান অবজারভার*, ১৬ ফেব্রুয়ারি)। বাংলাদেশের মানুষ বুঝে গেল, সব অপকর্মের কলকাঠি কে নাড়ে। ভুট্টোর যুক্তি মুজিবের মনে ধরল না। ভুট্টো বলেছিলেন, পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ আওয়ামী লীগের শাসন চলতে পারে, কিন্তু সংবিধান প্রণয়ন করতে হবে পঞ্চায়েতের মতো সম্মতির ভিত্তিতে (*পাকিস্তান অবজারভার*, ২২, ২৮ ও ৩১ জানুয়ারি)। ২১ ফেব্রুয়ারি শেখ মুজিব আহ্বান জানালেন, বাঙালিদের অবিচলিত থাকতে হবে। সামনে লড়াই হবে, তার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। বাঙালিদের আর শহীদ হলে চলবে না, তাদের গাজি (বিজয়ী) হতে হবে (*পাকিস্তান অবজারভার*, ২১ ফেব্রুয়ারি)। সেদিনের অনুষ্ঠানে সব বক্তাই আসন্ন শক্তি প্রদর্শনের ওপর ব্যাপক জোর দিলেন। কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে একতা ও রক্তের বদলে রক্ত নেওয়ার অঙ্গীকার করা হলো। ১৯৭১ সালে কেউ হালকাভাবে এই শপথ নেননি। তদুপরি, বহু মানুষ এই শপথ নেন। তবে মুজিবের বাংলাদেশ আদর্শের প্রতীকগুচ্ছের আন্তসম্পর্কিত অর্থময়তার গতি-প্রকৃতির কারণে আপস-রফার সম্ভাবনা কঠিন হয়ে ওঠে।

চার. ক্রান্তিকালীন চূড়ান্ত পরিণতি

এই ব্যাপারটা মূলত ধর্মীয় আচারের সঙ্গে সম্পর্কিত (টারনার, ১৯৭৭ : ৯৪-১১৩)। ধর্মীয় আচারে অংশগ্রহণকারীরা সাধারণ সামাজিক কার্যক্রম থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়ে অনুষ্ঠানের বিশেষ সময়ে ধর্মীয় গুরু হিসেবে নিজেদের হাজির করেন। এই সময় তাদের সত্তাগত অবস্থানের এক ধরনের পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তনের ধারায় সাধারণ সামাজিক জীবনের এক ক্রান্তিকালে রাষ্ট্রীয় কাঠামোর বিরোধিতায় সমাজের ভূমিকা বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। সেই সাথে সামাজিক কাঠামোগত পার্থক্যগুলো যেমন বয়স, লিঙ্গ, শ্রেণি, বর্ণ, ধর্ম, পেশা প্রভৃতি অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যায়। ধর্মগুরুরা এ সময় তাঁদের ব্যক্তিত্বেও পূর্ণাঙ্গ সত্তার অভিজ্ঞতা লাভ করেন। সাধারণ সামাজিক কাঠামোতে তাদের যে ব্যক্তিসত্তা

থাকে, এ সময় যেন তাঁদের সেখান থেকে উত্তরণ ঘটে (টার্কল, ১৯৭৫ :৯১)। এসব কারণে তাঁরা নিজেদের চূড়ান্ত মূল্যবোধগুলো অনুধাবন করতে পারেন, জীবনের পূর্ণাঙ্গতা অনুভব করতে পারেন।

কথা হচ্ছে, ১৯৭১ সালের মার্চ মাসেও এ দেশের মানুষ সাধারণ সত্তা থেকে মুক্ত হয়ে এক ক্রান্তিকালীন চূড়ান্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল। আগে থেকেই এমন একটা পরিস্থিতি ছিল, যার কারণে ওই সময়টা বিশেষ হয়ে উঠেছিল। ওটা সাধারণ পরিস্থিতি ছিল না। বিষয়টা হচ্ছে, আনুপাতিক প্রতিনিধিত্বের জন্য প্রাপ্তবয়স্কদের সর্বজনীন ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচন পাকিস্তানের রাজনীতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল না। নভেম্বরের সাইক্লোনে লাখো মানুষের মৃত্যু, মুজিবের মৃতদের শহীদ আখ্যা দেওয়া এবং আওয়ামী লীগের এমন সর্বব্যাপক বিজয়ের কারণে বাংলাদেশে এক বিশেষ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়। এরপর যখন ১ মার্চ অধিবেশন স্থগিত করা হলো, তখন পরিস্থিতি বদলে গেল। ব্যাপারটা এমন মনে হলো, যেন এক সর্বব্যাপক রাজনৈতিক ক্রান্তিকাল উপস্থিত হয়েছে, যেটা পরবর্তী সময়কে সাধারণ সময় থেকে আলাদা করে ফেলল। বিশেষ করে, ঢাকা নগরের মানুষের কাছে ব্যাপারটা এমন মনে হলো, কারণ এ শহরটি ছিল সব রাজনৈতিক কার্যক্রমের কেন্দ্র। সরকার সাধারণ ও প্রতিষ্ঠিত রাজনৈতিক কাঠামো বজায় রাখতে চাইল। তাদের কাছে স্বায়ত্তশাসিত বাংলাদেশ ছিল চূড়ান্ত মাত্রার কাঠামোবিরোধী। সংসদের অধিবেশন বসলে যেসব পরিবর্তন হতো, সেটা তারা মেনে নিতে পারত না। অন্যদিকে বাংলাদেশ অনেক দিন ধরেই নতুন কাঠামোর প্রয়োজনীয়তা মেনে নিয়েছিল। ফলে অধিবেশন স্থগিত করার কারণে তারা পাকিস্তানের পুরোনো ও বাংলাদেশের নতুন কাঠামোর মধ্যে পড়ে গেল। তার অবস্থা হলো এ রকম—না ঘরকা, না ঘাটকা।

মুজিব তাঁর আদর্শের প্রতীকের সাপেক্ষে বাংলাদেশের ব্যাপারে মানুষের এমন আগ্রহ সৃষ্টি করলেন, যার কারণে মার্চ মাস সময়ের সেরা সময় হয়ে উঠল। বাংলাদেশ যেন তখন 'সমাজ' গঠনের এক অনাবিল আনন্দে মেতে ওঠে, যে সমাজ পেশা, শ্রেণি, ধর্ম ও আত্মীয়তার বেড়াজাল কাটিয়ে উঠেছিল। দৃশ্যত, বাংলাদেশে তখন এক নিখুঁত ও পূর্ণাঙ্গ ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছিল। প্রায়ই যে সমাবেশ হতো, তাতে এই সমাজ গঠিত হওয়ার ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। একই সঙ্গে এখান থেকে এক উৎসবমুখর পরিবেশ সৃষ্টি হয়। মানুষ একটা মিছিল থেকে আরেকটি মিছিল বা বিক্ষোভ সমাবেশে যাওয়ার মধ্যবর্তী সময়ে এই উৎসবমুখর পরিবেশটা বজায় রাখতে চেয়েছে। এ ছাড়া মার্চের মধ্যভাগের মধ্যে দেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমের অনেক কিছুই মুজিবের হুকুমে চলতে থাকে। ফলাফল হিসেবে বাঙালি দেখল, তাদের কাঠামোবিরোধী দাবি বাংলাদেশের

ব্যবস্থায় রূপ নিচ্ছে। মার্চের ঘটনাপ্রবাহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করলে এই ব্যাখ্যাই পাওয়া যাবে।

মুজিব প্রায়ই যে গণ-আন্দোলনের ভবিষ্যদ্বাণী করতেন, অধিবেশন স্থগিত করার পর তা শুরু হলো। মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে রাস্তায় নেমে এল। শেখ মুজিব তখন আওয়ামী লীগের এক বৈঠকে ছিলেন, মানুষ তাঁর কাছেই গেল। মুজিব এতে সত্যিই বিস্মিত হন। তিনি ছিলেন অপ্রস্তুত। ক্ষুব্ধ জনতার উদ্দেশে তিনি বললেন, ৭ মার্চ শনিবার কর্মসূচি ঘোষণা করা হবে। অর্থাৎ কিছুটা সময় নিলেন তিনি। তিনি ২ মার্চ ঢাকায় ও ৩ মার্চ সারা দেশে হরতাল আহ্বান করেন। আক্ষরিকভাবেই মানুষ সব দিক থেকে প্রতিবাদে শামিল হতে শুরু করল। ফলে পরিস্থিতির নিয়ন্ত্রণ করতে মুজিব সমস্যায় পড়ে গেলেন।

২ মার্চ ঢাকা মিছিলের শহরে পরিণত হয়। সকালের দিকে সেনাবাহিনী বিমানবন্দরে সড়কের এক গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে জনতার ওপর গুলি করে, এতে দুজন নিহত হন। গুলির খবর ছড়িয়ে পড়লে মানুষ লাঠি মিছিল নিয়ে ওই মোড়ের দিকে আসতে শুরু করে, যেখানে গুলি করা হয়েছিল। একপর্যায়ে সব মিছিল একত্র হয়ে এক মিছিলে পরিণত হলো। এরপর তারা অত্যন্ত দৃঢ়সংকল্প নিয়ে ঢাকার রাস্তায় মিছিল করতে থাকে। ব্যাপারটা এমন দাঁড়াল, ঢাকার একটি বাণিজ্যিক এলাকা অতিক্রম করতে এই বিশাল মিছিলের ৪৫ মিনিট সময় লাগল। মিছিলকারীদের হাতে লাঠি, লোহার রড, কালো পতাকা ছিল, আক্ষরিকভাবেই তারা রক্ত নেওয়ার গর্জন করছিল। ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় বিচ্ছিন্ন সহিংসতা হচ্ছিল। রাত নয়টায় সেনাবাহিনী কারফিউ জারি করে। কিন্তু জনতা কারফিউ অগ্রাহ্য করল। পরিণামে সেনাবাহিনী জনতার ওপর গুলি চালাল। কারফিউয়ের সময় মিছিলের স্লোগানও বদলে গেল। এর আগে মিছিলকারীরা বলত, 'জাগো বাঙালি, জাগো', এবার তারা বলল, 'আমরা জেগেছি'। পূর্ব পাকিস্তানে এর আগের সব মিছিলের মতো এই মিছিলও স্বতঃস্ফূর্ত ও লক্ষ্যহীনভাবে ঘুরতে থাকল। কিন্তু পার্থক্য একটাই, এবার সেনাবাহিনী মিছিল থামাতে পারল না।

প্রতিশ্রুতিমাফিক গণ-আন্দোলন সৃষ্টি করতে হলে মুজিবকে এই মিছিলের নিয়ন্ত্রণ নিতে হতো, যাতে এটা সহিংসতা ও বিশৃঙ্খলায় পর্যবসিত না হয়। ১৯৬৮-৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময়ও এ পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল (জাহান, ১৯৭২ বি : ১৬৮-৯; মনিরুজ্জামান, ১৯৮০ : ৬১-৬)। তাঁর উদ্বেগের মূল কারণ ছিল, অবাঙালিদের বিরুদ্ধে চলমান সহিংসতা, যার রাশ তাঁকে টানতে হতো। একই সঙ্গে, এই অধিবেশন স্থগিতের বিরুদ্ধে তাঁকে কার্যকর একটা অবস্থানও নিতে হবে। গণমাধ্যমে বিবৃতি ও ৩ মার্চ ঢাকার এক সমাবেশে বক্তৃতা দেওয়ার মধ্য দিয়ে মুজিব নিজের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে শুরু করেন। এর মধ্য দিয়ে মার্চ

মাস বাঙালির রাজনৈতিক জীবনের এক বিশেষ ক্রান্তিকালীন অভিজ্ঞতা হিসেবে হাজির হয়।

৩ মার্চ বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য কী করতে হবে, মুজিব তাঁর রূপরেখা পেশ করলেন। নির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর থেকেই তিনি একটি বিষয়ে কথা বলছিলেন। এবার তিনি সেটার বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিলেন (*পাকিস্তান অবজারভার*, ১ ও ৪ জানুয়ারি)। তিনি বললেন, বাংলাদেশের মাটিতে যাঁরা বসবাস করছেন, তাঁরা সবাই বাংলাদেশি। বিশেষ করে, যে মুসলমানেরা ভারত থেকে এখানে এসেছেন, তাঁদের বেলায় এটা বিশেষ করে সত্য, অর্থাৎ বিহারিরা। মুজিব এই মুসলমানদের বারবার উৎসাহিত করেছেন, যাতে তাঁরা এই মাটির মানুষ হয়ে বাংলাদেশের দাবিতে ঐক্যবদ্ধ হন। বাঙালি মুসলমানের সাংস্কৃতিক ধারণায় মাটি একটা ক্ষমতায় ঠাসা জিনিস (থর্প, ১৯৭৯)। মুজিব ও তাঁর সামনের অন্য রাজনীতিকদের কাছে এই মাটির স্পর্শ ও তার খাদ্য গ্রহণই এই বাংলাদেশের নাগরিকত্ব লাভের জন্য যথেষ্ট। মুজিব জোর দিয়ে বললেন, এই মাটির নাগরিকত্ব দেওয়ার ক্ষমতা আছে, তার জন্য বন্ধুত্বপূর্ণ উপায়ে সকল ভিন্নতার অবসান ঘটাতে হবে। এরপর মুজিব চেষ্টা করলেন, সেনাবাহিনীর হাতে যে বাঙালিরা একের পর এক মারা পড়ছেন, শ্রোতাদের মনোযোগ সে দিকে নেওয়ার। জনতার ওপর সেনাবাহিনীর এই গুলিবর্ষণকে তিনি গুপ্তহত্যা আখ্যা দিলেন। কেউই নিরাপদ নয়, যে কেউ ওই লাখো শহীদের কাতারে চলে যেতে পারে। সাইক্লোনের হুমকি এখনো দূর হয়নি। এই বক্তৃতায় তিনি মাটি ও শাহাদাতবরণের আদর্শিক প্রতীকের যে সমন্বয় ঘটালেন, তার তাৎক্ষণিক প্রভাব টের পাওয়া গেল। আওয়ামী লীগের স্বেচ্ছাসেবকদের পাহারাদারির কারণে এটা আরও সহজ হয়। এরপর মুজিব বিহারিদের ওপর সহিংসতা কমাতে যথেষ্ট সক্ষম হলে ৫ মার্চ থেকে রাতের বেলা কারফিউ তুলে নেওয়া হয়।

৩ মার্চের সমাবেশে মুজিব দ্বিতীয় আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় উল্লেখ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, বাংলাদেশজুড়ে যেভাবে মানুষের প্রতিরোধের আকাঙ্ক্ষা দেখা গেছে, তাতে পশ্চিম পাকিস্তান ও বিশ্ববাসীর কাছে এটা স্পষ্ট হওয়া উচিত, বাংলাদেশিদের আর দাবিয়ে রাখা যাবে না (রহমান, ১৯৭২ : ৮০)। এরপর মুজিব সরকারের বিরুদ্ধে অহিংস অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জনগণের প্রতিনিধিদের হাতে কার্যকর ক্ষমতা হস্তান্তর হওয়া পর্যন্ত এ আন্দোলন চলবে। মুজিব সবাইকে কাজ বন্ধ করার আহ্বান জানালেন। কিন্তু বিশেষভাবে ঢাকার আমলাতন্ত্র অচল করে দেওয়ার ব্যাপারে আগ্রহী ছিলেন। এই আহ্বানে সবাই সাড়া দেন। সব কার্যালয় ও শিল্প বন্ধ হয়ে যায়। ঢাকায় সবার ছুটি হয়ে যায়। কিন্তু এটা অন্যান্য ছুটির মতো নয়, যখন মানুষ গ্রামের বাড়িতে ছোটে।

৭ মার্চ মুজিব রমনার রেসকোর্সে আবারও এক বিশাল সমাবেশে বক্তৃতা দেন। শহীদদের রক্তের নামে মুজিব ঘোষণা করেন, সেনাবাহিনী ব্যারাকে না ফেরা পর্যন্ত এবং গুলিবর্ষণের ঘটনার তদন্ত না হওয়া পর্যন্ত এই অহিংস অসহযোগ আন্দোলন চলবে। সামরিক আইন প্রত্যাহার ও জনগণের প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর না হওয়া পর্যন্ত অধিবেশন বসবে না। এই সমাবেশের পর ঢাকার আকাশে-বাতাসে একধরনের আনন্দ[৭] বইতে শুরু করে। মুজিব সহিংসতার রাশ টেনে ধরেন। অন্যদিকে তিনি আমলাতন্ত্র অচল করে দেওয়ার ঘোষণা দিয়ে সেনা সরকারকে ভালো রকম হুমকিই দেন। শহরের মানুষের মধ্যে ক্রমেই এ ধারণা ছড়িয়ে পড়ে যে দেশের নিয়ন্ত্রণ কার্যত বাংলাদেশিদের হাতেই। মার্চ মাসটা সত্যিই ছিল এক অসাধারণ ও বিশেষ সময়। বাংলাদেশিরা বিশ্বাস করতে শুরু করে, সবকিছুই করা সম্ভব। আর পাকিস্তানের জায়গায় নতুন এক নিখুঁত ব্যবস্থা গড়ে উঠতে যাচ্ছে। মুজিব নিজ আদর্শের গুরুত্বপূর্ণ উপাদানে পুনরায় জোর দিয়ে মার্চের প্রথম সপ্তাহে রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের নিয়ন্ত্রণ হাতে নেন। আরও আরও শহীদের রক্তে মাটি ভিজতে থাকায় দেশ নিজেই হুমকির মুখে পড়ে যায়। ছয় দফার ভিত্তিতে যে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ছিল, সেটা স্রেফ মুক্ত দেশের মুক্ত নাগরিকের অধিকারে পরিণত হলো। আর মুজিব যে কাজের মধ্যে নানা সময় বিরতি দিতেন, সেটা ছয় দফার চেয়ে আরও সুনির্দিষ্ট ও তাৎক্ষণিক হলো।

মার্চের প্রথম সপ্তাহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ঘোষণার জন্য মুজিবের ওপর ব্যাপক চাপ প্রয়োগ করা হলো। অনেকেই আশা করেছিলেন, মুজিব মার্চের জনসভায় ওই ঘোষণা দেবেন। তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে স্বাধীনতার ঘোষণা না দিলেও মুক্ত দেশে মুক্ত নাগরিকত্বের যে আহ্বান তিনি জানালেন, ছয় দফার চেয়ে তা অনেকটা স্বাধীনতার কাছাকাছিই ছিল। ১৫ মার্চের মধ্যে অসহযোগ আন্দোলনের ওপর মুজিবের দৃঢ় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়, যার কারণে আমলাতন্ত্র ও ব্যবসা-বাণিজ্য একরকম স্থবির হয়ে পড়েছিল। ১৫ মার্চ তিনি বাংলাদেশের প্রশাসনিক কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নেওয়ার যে বিবৃতি দেন, তাতে আন্দোলন আরেক ধাপ এগিয়ে যায়। তিনি এমন কিছু নির্দেশনা দেন, যার মাধ্যমে বাংলাদেশের সরকারের ওপর তাঁর কার্যকর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। মুজিব ঘোষণা করেন, তিনি এ পদক্ষেপ নিচ্ছেন এই কারণে, যাতে বাংলাদেশের মানুষ মুক্ত ভূমিতে মুক্ত নাগরিক হতে পারে। তিনি ঘোষণা দেন, বাংলাদেশিদের পরাজিত করা যাবে না, কারণ এ দেশের প্রতিটি মানুষ এই লক্ষ্যের জন্য প্রাণ দিতে পারে (রহমান, ১৯৭২ : ১০৫-১১)। মনে হচ্ছিল, মুজিব স্বাধীনতার ঘোষণা না দিয়ে বাংলাদেশকে স্বাধীন করতে চাচ্ছিলেন। সামরিক সরকারের কর্তৃপক্ষ তখন পর্যন্ত কোনো স্তরে হস্তক্ষেপ করেনি, আর মুজিব একের পর এক সতর্ক পদক্ষেপ নিয়ে যাচ্ছিলেন।

এর মধ্যে ইয়াহিয়া খান মুজিবের সঙ্গে বৈঠক করার জন্য ১৫ মার্চ ঢাকা এলেন। সংবাদপত্রগুলো এমনভাবে এর প্রতিবেদন করছিল, যাতে তা বাংলাদেশের জন্য অনুকূল হয়। ২১ মার্চ ভুট্টোও ঢাকায় এলেন। তখন শোনা যাচ্ছিল, একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন করা হতে পারে (*পাকিস্তান অবজারভার*, ২১ মার্চ)। ২৩ মার্চ মনে হলো, মুজিব ইয়াহিয়া খান ও ভুট্টোর কাছ থেকে সব দাবি আদায় করে নিয়েছেন। এই দিনটি তাৎপর্যময় ছিল। কারণ, সেদিন ছিল পাকিস্তান দিবস। সেদিন ছিল সরকারি ছুটি। ১৯৪০ সালের এই দিনে লাহোর প্রস্তাব পেশ করা হয়, যার ভিত্তিতে ভারত ভাগ হয়। মুজিব দাবি করলেন, ২১ মার্চ হচ্ছে লাহোর প্রস্তাবের বাস্তবায়ন দিবস। কারণ, মূল লাহোর প্রস্তাবটি ছিল ছয় দফা দাবির ভিত্তি (রহমান, ১৯৭২ : ১২৫-৮)। ঢাকার ছাত্র সংগঠনগুলো এ দিনটিকে প্রতিরোধ দিবস হিসেবে ঘোষণা করল। তারা সব সরকারি ভবনে বাংলাদেশের পতাকা উত্তোলনের আহ্বান জানাল। ৩ জানুয়ারি আওয়ামী লীগের ওই শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠানে এই পতাকা দেখা গিয়েছিল, আওয়ামী লীগের ৭ মার্চের জনসভায়ও এটা দেখা গেছে। লাহোর প্রতিরোধ দিবসে ঢাকার প্রতিটি ভবনে এই পতাকা ওড়ানো হয়েছে। তবে স্বাভাবিকভাবেই, গভর্নর হাউস, সেনানিবাস ও প্রেসিডেন্ট হাউসে পাকিস্তানের চাঁদ-তারাখচিত পতাকা ওড়ানো হয়েছে। ঢাকার প্রতিটি যানবাহনে এই পতাকা লাগানো হয়েছিল। মানুষ জামার ওপর ছোট লাল, সবুজ ও স্বর্ণালি পতাকা পরেছে। বাংলাদেশি 'সমাজ' যেন তখন শিখরে উঠে গেছে। মানুষ অনুভব করছিল, তাদের আন্দোলন সফল হয়েছে, যদিও তারা আসলে কী অর্জন করেছে এটা তখনো পরিষ্কার নয়।

২৩ মার্চ আসলে ছিল উদ্‌যাপনের দিন। সেদিন মুজিবের আদর্শের প্রতীকী ছাঁচ সুস্পষ্টভাবে প্রদর্শিত হয় ওই লাল-সবুজের পতাকার মধ্য দিয়ে, যেটা পাকিস্তানের চাঁদ-তারাখচিত পতাকার জায়গায় ঢাকার আকাশে শোভা পাচ্ছিল। এই পতাকা ব্যতিক্রমীভাবে মুজিবের আদর্শের এক বহুস্বরিক প্রতীক হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। এর মধ্যে বাংলাদেশি হওয়ার অবধারণ বোধ ও শারীরবৃত্তীয় (টার্নার, ১৯৬৯ : ৯-১০) দিক উভয়ই ছিল। পতাকার রঙের মধ্যেও দেশের নানা বৈশিষ্ট্য আছে, যেমন সবুজ হচ্ছে উর্বর মাঠের প্রতীক, লাল হচ্ছে উষ্ণতা-বিকিরণকারী সূর্যের প্রতীক আর সোনালি পাকা ধানের। এই চিত্রকল্পেও অনেকটাই কিন্তু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'আমার সোনার বাংলা' গানে পাওয়া যায়। একই সঙ্গে, এই রঙের সঙ্গে বাংলাদেশি হওয়ার শারীরবৃত্তীয় যোগ আছে। সবুজ হচ্ছে জীবনের প্রতীক, যেটা জীবনের অন্যান্য রঙের সঙ্গে সম্পর্কিত। লাল তো রক্তের প্রতীক। এখানে তা বিশেষভাবে শহীদের রক্ত। শারীরবৃত্তীয়ভাবে সবচেয়ে লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, সোনালি রঙে দেশের রূপরেখা কল্পনা করা। সাধারণভাবে 'সোনা' নারীর যৌনাঙ্গের সুভাষণ

হিসেবে ব্যবহৃত হয়। বাংলাজুড়ে 'দেশ' একদম নির্ভুলভাবে নারী হিসেবে বিবেচিত হয়। কিন্তু নারীত্ব কদাচিৎ পরিষ্কারভাবে প্রদর্শিত হয়। শহীদের রক্ত জীবন সৃষ্টি করেছে, আর এই রক্তে স্নাত হয়েই জন্ম নিয়েছেন বাংলাদেশের নাগরিকগণ। শহীদেরা তাঁদের পিতা, আর দেশ মা। আর নিশ্চিতভাবে সূর্যের কিরণ মাটিতে পড়ে সোনালি ধান উৎপাদন করেছে।

বাংলাদেশের পতাকার প্রতীকী তাৎপর্য

মান-নির্ধারক		**আকাঙ্ক্ষা-সংক্রান্ত**
মাটি=সবুজ		সোনা=মাতৃভূমি
	সূর্য=লাল=শহীদ	
ধান=সোনা		সবুজ=জীবন

কথা হচ্ছে, পতাকার প্রতীকী তাৎপর্যের সচেতন মান নির্ধারক অংশের সঙ্গে এর মূলত অসচেতন প্রতীকী তাৎপর্যের মিশ্রণের ফলে তা বাংলাদেশি সত্তার শক্তিশালী মূর্ত রূপ হিসেবে দাঁড়িয়ে যায়। ২৩ মার্চ যাঁরা পতাকা উড়িয়েছিলেন ও গায়ে জড়িয়েছিলেন, তাঁরা মুক্ত স্বদেশে মুক্ত নাগরিক হিসেবে বাঁচতে সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। অথবা এই বাস্তবতা সৃষ্টি করতে বুকের রক্ত ঢেলে দিতে প্রস্তুত ছিলেন। তাঁদের বেশি দিন অপেক্ষা করতে হয়নি।

ধর্মীয় আচার বা প্রথাগত অনুষ্ঠানে যেমন 'ভ্রাতৃত্বের শক্তিশালী অনুভূতির' একটা জায়গায় এসে থামতে হয়, তেমনি মার্চের এই ক্রান্তিকালীন অভিজ্ঞতারও একটা সমাপ্তি থাকে। তা ছাড়া পাকিস্তানের সামাজিক গড়নের সাধারণ ধরনের পুনঃ আবির্ভাব ঘটেনি। এদিকে পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ২৫ মার্চ রাতে শেখ মুজিবকে হঠাৎ পুনরায় গ্রেপ্তার করে এই 'শক্তিশালী ভ্রাতৃত্ববোধের' অবসান ঘটায়। তাঁর বিরুদ্ধে দেশদ্রোহের অভিযোগ আনা হয়। ছাত্র, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে পূর্ণাঙ্গ অভিযান চালানো হয়। বিশেষ করে, ঢাকার হিন্দু অধিবাসীরা সন্দেহের তালিকায় ছিলেন। তাঁদের ওপর নির্মম নির্যাতন চালানো হয়। পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ ভেবেছিল, ইয়াহিয়া খান যেমন ১৯৬৯ সালে সামরিক আইন পুনরায় জারি করে হঠাৎই গণ-আন্দোলন থামিয়ে দিয়েছিলেন, এবারো তিনি সেভাবেই তা থামিয়ে দেবেন। কিন্তু এবার মুজিবের জনপ্রিয় বাংলাদেশ আদর্শের জের দীর্ঘস্থায়ী হয়, মানুষ পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে দীর্ঘ প্রতিরোধ লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়।

মুজিব দেশ প্রতীকের মধ্যে সফলভাবে বাংলাদেশিদের স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধারণ করেছিলেন, যেটা লাখো শহীদের রক্তের বিনিময়ে সৃষ্টি হয়েছে। একই সঙ্গে তিনি মানুষকে সাধারণ ও আধা বাস্তব কর্মসূচিও দিয়েছিলেন। প্রথমত,

পাকিস্তানের মধ্যে ছয় দফা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। দ্বিতীয়ত, মার্চের অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে। মার্চের মানুষের মধ্যে যে অভিন্ন 'ভ্রাতৃত্ববোধ' গড়ে ওঠে, তাতে পশ্চিম পাকিস্তানি কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে বাঙালিদের লড়াই করার সংকল্প আরও তীব্র হয়। মার্চের শেষ নাগাদ বাংলাদেশিদের মধ্যে অভিন্নপরিচয় ও লক্ষ্যের বোধটা একদম চূড়ান্ত জায়গায় পৌঁছে। ওদিকে মুজিব বারবার দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাতে থাকেন, বাংলাদেশের সম্মান ও অখণ্ডতা রক্ষা করতে প্রয়োজনে আরও ১০ লাখ মানুষকে জীবন দিতে হবে। ২৫ মার্চ রাতে সেনা অভিযানে সেই শহীদের তালিকা প্রস্তুত হতে শুরু করে। পুলিশ সদস্য, পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস ও সেনাবাহিনীর কিছু বাঙালি ইউনিট সীমিত আকারে প্রতিরোধযুদ্ধ শুরু করে। তাঁদের অনেকেই শহীদ হন। তবে মুজিব যে সবকিছু বাজি রাখার আহ্বান জানিয়েছিলেন, তার পরিপ্রেক্ষিতে দেখা গেল, ১৬ ডিসেম্বর স্বাধীনতালাভের আগ পর্যন্ত মুক্তিবাহিনীতে যোদ্ধার সংখ্যা বাড়তেই থাকে।

উপসংহার

আমরা এখানে যেভাবে সংজ্ঞায়িত করলাম, তাতে আদর্শ একধরনের প্রতীকী ব্যবস্থা। এটা সামাজিকব্যবস্থার একটা ছকবদ্ধ রূপ তৈরি করে, যার কারণে স্বায়ত্তশাসনের (মানুষের জন্য লক্ষ্য নির্ধারণ ও বাস্তবায়ন) রাজনীতি সম্ভব হয়ে ওঠে। আদর্শ থেকে একধরনের কর্তৃত্বপরায়ণ ধারণা সৃষ্টি হয়, যার কারণে রাজনীতি করা সম্ভব হয়ে ওঠে। আদর্শ নৈতিক চিত্রকল্প তৈরি করে, যার বদৌলতে রাজনৈতিক কার্যক্রমের লক্ষ্য ও প্রক্রিয়াকে কাণ্ডজ্ঞানে বোঝা যায়, তাকে রূপ দেওয়া যায়। সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক চাপের মুখে আদর্শ নির্মাণ হয়। এটা সেখানেই গড়ে ওঠে, যেখানে মানবীয় আচরণের গৃহীত ও প্রথাগত ছক আর কোনোভাবে প্রযোজ্য হয় না (গার্টজ, ১৯৭৩ : ২১৮-৯)।

বাংলাদেশের পরিপ্রেক্ষিতে সেই ঐতিহ্যবাহী ধারা, অর্থাৎ ব্যক্তি মালিক সম্মতিভিত্তিক সমাজে সমমনা মালিকদের সঙ্গে বাস করছে ও আদমের প্রতি আল্লাহর মাটি চাষ করার নির্দেশ মেনে চলছে, অভিজাতকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতিতে কখনোই প্রযোজ্য ছিল না। দেশভাগের আগে ও পরে কখনোই এটা ছিল না। এই গোষ্ঠীটি গ্রামের ঐতিহ্যবাহী ধারা ও আধুনিক সমাজের ব্যক্তিকেন্দ্রিক ধারার মধ্যে আটকে পড়েছিল (ডুমন্ট, ১৯৭০ : ৩১-২)। প্রথাগত গ্রামীণ সমাজে মুসলিম মূল্যবোধ অন্য সব বিবেচনার ঊর্ধ্বে। তার ভিত্তিতেই সামাজিক বিন্যাস হয়ে থাকে। কিন্তু আধুনিক সমাজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে, এখানে মানুষ নিজের মতো করে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও শৈল্পিক কার্যক্রম করে থাকে। আধুনিকতার প্রবক্তারা অনেক কষ্ট করে আদর্শ সৃষ্টি করেছেন। এই আদর্শ

তাঁদের উক্ত ক্ষেত্রে স্বাধীন তৎপরতা চালানোর ভিত্তি নির্মাণ করে। কিন্তু এখানে হলো কি, এই আদর্শকে আবার গ্রামে বসবাসরত সিংহভাগ ঐতিহ্যবাহী মানুষকে স্পর্শ করতে হতো, যাদের এখন ভোটার বলা হচ্ছে। ব্যক্তিকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী রাজনীতির এই জনপ্রিয় ভোটের প্রয়োজন হয়ে পড়ে। আর সেটা পেতে হলে তাদের স্বীয় কর্মকাণ্ডের ব্যাখ্যা দিতে হতো, যেটা একদিকে সুপ্রতিষ্ঠিত আধুনিক সমাজের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে হবে, তেমনি ব্যক্তিকেন্দ্রিক ইস্যুভিত্তিক রাজনীতিতেও তাকে অর্থবহ হতে হতো।

শেখ মুজিবুর রহমান যে অবিভক্ত পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোতে বাংলাদেশের স্বায়ত্তশাসনের প্রতীকীব্যবস্থা গড়ে তুলতে চেয়েছিলেন, এই পত্রে তা ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মুজিব যে বাস্তবতার সামনে পড়েছিলেন, তার আলোকে তিনি ইসলামের অনুপ্রেরণায় একটি জাতীয়তাবাদী রাজনৈতিক প্ল্যাটফর্ম গড়ে তোলার চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর এই আদর্শ দেশভাগের আদর্শের মতো ছিল না, যেটা খোলাখুলিভাবে ধর্মভিত্তিক ছিল। মুজিব শক্তিশালী মুসলিম ধারণাগুলো ধারণ করলেন ইসলামের নাম না নিয়েই। এতে কাজ হলো। কারণ, তিনি এটি দিয়ে আধুনিক ও নাগরিক অভিজাতদের সঙ্গে গ্রামের প্রথাগত মানুষদেরও এক কাতারে আনলেন। আর এই আদর্শকে সংহত করার ক্ষেত্রে লাখ লাখ শহীদের উৎপ্রেক্ষাটি কেন্দ্রীয় ভূমিকা পালন করেছে, যার মধ্যে নানা অসদৃশ্য অর্থের সমন্বয় ঘটেছিল। আবার এই বিসদৃশ অর্থের আন্তসম্পর্কের মধ্য দিয়েই চূড়ান্ত প্রতীকের প্রকাশ ক্ষমতা ও অলংকারবহুলতার শক্তি গড়ে ওঠে (গার্টজ, ১৯৭৩ : ২১৩)। এই প্রতীক মানুষের মধ্যে এক শক্তিশালী বোধ গড়ে ওঠে। সেটা হলো, মুসলমান পশ্চিম পাকিস্তানিদের হাতে বাংলাদেশিদের মারা পড়ার আশঙ্কা সৃষ্টি হয়েছে। লাখ লাখ শহীদ—চিত্রকল্প হিসেবে এটি যথেষ্ট বোধগম্য, যার কারণে মুজিব বাংলাদেশের মুখপাত্রের কর্তৃত্ব পেয়ে যান। এই শহীদদের কেন্দ্র করে মুজিব অন্যান্য যে চিত্রকল্প সৃষ্টি করেন, তার কারণে যাঁরা এটি ব্যবহার করেছেন, তাঁরা জনসমক্ষে ও যথোচিতভাবে এই শহীদদের সঙ্গে নিজেদের সম্পৃক্ত করতে পেরেছেন। শেষমেশ পাকিস্তান সেনাবাহিনী এই শহীদের কাতারে আরও অসংখ্য মানুষকে যুক্ত করে।

বাংলাদেশের জন্মের জন্য মুজিব যৌক্তিক ও শক্তিশালী এক শক্তিশালী আদর্শ নির্মাণ করেন। তা সত্ত্বেও এই আদর্শ ছিল সীমিত ও সুনির্দিষ্ট। এটা ক্রান্তিকালের মুসলিম প্রতীকগুচ্ছের এক জটিল সমন্বয়। আমরা যে ঐতিহাসিক কালের প্রসঙ্গে এখানে আলোচনা করলাম, সেখানে এটা কাজ করেছে। কিন্তু স্বাধীন বাংলাদেশে এটি নিজস্ব রাজনৈতিক ধারা নির্মাণ করতে পারেনি। এই আদর্শ কিছু দ্বান্দ্বিক প্রতীকের সমন্বয়ে গঠিত হয়েছিল, যার কার্যকারিতার জন্য বহিঃস্থ অন্যায্য কর্তৃপক্ষের উপস্থিতি দরকার ছিল। কিন্তু সেই শক্তিটি তিরোহিত হলে সংকটেরও

অবসান ঘটে। কথা হচ্ছে, স্বাধীনতাযুদ্ধে আরও ১০ লাখ মানুষ মারা গিয়ে থাকতে পারে, কিন্তু পাকিস্তান সেনাবাহিনী একবার আত্মসমর্পণ করলে আর কোনো বাংলাদেশির শহীদ হওয়ার সুযোগ থাকে না। জীবনের ওপর হুমকিস্বরূপ যে সংকট ছিল, তা-ও শেষ হয়ে যায়। দেখা যায়, মুজিব স্বাধীন বাংলাদেশের 'চার স্তম্ভ' (জাতীয়তাবাদ, ধর্মনিরপেক্ষতা, সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র) ঘোষণার পর এই শহীদের উপমা খুব কমই ব্যবহার করেছেন। যদিও তিনি এটাকে ইসলামের পাঁচ স্তম্ভের (বিশ্বাস, নামাজ, রোজা, জাকাত ও হজ) সঙ্গে তুলনা করে গ্রামীণ ভোটারদের আকৃষ্ট করার চেষ্টা করলেন। কিন্তু তিনি মানুষের আবেগকে জাতি গঠনের কাজে ব্যবহার করতে পারলেন না। যদিও তিনি আগে লাখো শহীদের উপমা ব্যবহার করে জনপ্রিয় আবেগকে স্বাধীনতাকামী তৎপরতায় রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন।

আদর্শ প্রথাগত প্রতীকের মতো নয়। প্রথাগত প্রতীক মানুষের মধ্যে এক পূর্ণাঙ্গতা ও দীর্ঘস্থায়ী ব্যবস্থার অনুভূতি তৈরি করে। কিন্তু আদর্শ এর ধারকদের মধ্যে ক্ষণস্থায়ী ও পরিস্থিতি-নির্দিষ্ট ব্যবস্থার বোধ তৈরি করে। আধুনিক ও ব্যক্তিবাদী বিশ্বের মানুষেরা মনে করে, প্রতিটি জগতের জন্য আলাদা আলাদা ব্যবস্থা হবে। কোনো ব্যবস্থায় কিছু অসম্পূর্ণতা থাকলে বা কোনো কিছুর ঘাটতি থাকলে তারা সামাজিক মানদণ্ডের বিভিন্ন মাত্রার অনুপস্থিতি বোধ করে। বাস্তবে আধুনিক মানুষ ক্রমপরিবর্তনশীল জীবনে শৃঙ্খলা বজায় রাখতে হিমশিম খায়। আর রাজনীতির নিজস্ব জগতে এর অর্থ হলো, আদর্শকে সব সময় সংশোধন ও বদলাতে হয়। পাকিস্তানের পরিপ্রেক্ষিতে মুজিব খুবই শক্তিশালী একগুচ্ছ শৃঙ্খলা-উৎপাদনকারী প্রতীক তৈরি করেন। তবে বাংলাদেশ একবার পাকিস্তান থেকে স্বাধীন হলে তিনি এমন কোনো শক্তিশালী ধারণা ও বোধগম্য চিত্রকল্প তৈরি করতে পারেননি, যা শক্তিশালী রাজনৈতিক ব্যবস্থা গড়ে তুলতে পারে, যেটা তাঁর আগের আদর্শে ছিল। তাঁর ব্যর্থতা বাংলাদেশের জন্য দুর্ভাগ্যজনক। আর তাঁর পরিবার ও নিজের জন্য বিয়োগান্ত।

তথ্যসূত্র ও টীকা

১. *পাকিস্তান অবজারভার* এবং *ডন* পত্রিকাতে এই ঘটনাগুলো এবং এই ঘটনাগুলোর প্রতি মুজিবের প্রতিক্রিয়া বিস্তারিতভাবে প্রকাশ করা হয়। মাঝেমধ্যে এগুলোতে অনিশ্চিত পরিস্থিতির কথা উঠে আসত। তবে এখানে ক্রমবর্ধমানভাবে ক্ষুব্ধ জনপরিস্থিতির (public atmosphere) যে বর্ণনা দেওয়া হয়েছে, তা আমার নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা এবং উল্লিখিত ঘটনাগুলোর পর্যবেক্ষণনির্ভর। ঢাকার একটি বেসরকারি কলেজের শিক্ষক হিসেবে রাজনৈতিকভাবে সক্রিয় শিক্ষার্থীদের সঙ্গে আমার প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ছিল, যদিও আমি তাদের প্রেষণাকে ধারণ করতাম না।

২. আওয়ামী লীগের প্রচারণার পোস্টারগুলোতে (সেনগুপ্ত, ১৯৭৪ :৮০) নিচের তুলনাগুলো উপস্থাপন করা হয় :

বৈষম্যের ক্ষেত্রসমূহ	**বাংলাদেশ**	**পশ্চিম পাকিস্তান**
রাজস্ব ব্যয়	১,৫০০ কোটি রুপি	৫,০০০ কোটি রুপি
উন্নয়ন ব্যয়	৩,০০০ কোটি রুপি	৬,০০০ কোটি রুপি
বৈদেশিক সহায়তা	২০%	৮০%
আমদানি	২৫%	৭৫%
কেন্দ্রীয় সরকারি চাকরি	১৫%	৮৫%
সামরিক বাহিনীতে চাকরি	১০%	৯০%
প্রতি মণ চাল	৫০ রুপি	২৫ রুপি
প্রতি মণ আটা	৩০ রুপি	১৫ রুপি
প্রতি সের সরিষার তেল	৫ রুপি	২.৫ রুপি
প্রতি তোলা স্বর্ণ	১৭০ রুপি	১৩৫ রুপি

৩. যাঁরা ১৯৬২, ১৯৬৬ এবং ১৯৬৮-৬৯-এর বিক্ষোভের সময় শহীদ হন (মনিরুজ্জামান, ১৯৮০ : ২৪, ৬০-৬৬)।

৪. অন্য রাজনীতিবিদেরা উপমা (metaphor) ব্যবহার করলেও, সেগুলো ততটা গুরুত্ব লাভ করেনি। সাইক্লোনের ত্রাণ বিতরণ অবস্থার সমালোচনা করতে গিয়ে ভাসানী 'একটি স্বায়ত্তশাসিত এবং সার্বভৌম বাংলাদেশ' দাবি করেছিলেন (*পাকিস্তান অবজারভার*, ৫ ডিসেম্বর)। তাঁর উপমার এই ব্যবহার খুব কম মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল এবং পরে মানুষ তা ভুলেও যায়।

৫. এখানে আলোচিত অভূতপূর্ব ঘটনাগুলোর অভিজ্ঞতা অর্জন এবং পরে তা বিশ্লেষণ করার সুযোগ খুব অল্পসংখ্যক সমাজ বিজ্ঞানীই পান। দুজন লেখক ১৯৬৮ সালে ফ্রান্সে সংঘটিত শিক্ষার্থীদের প্রতিবাদের কথা আলোচনা করেছেন (টার্কল, ১৯৭৫ : ৬৮-১০০; জলবার্গ, ১৯৭২ : ১৮৩-২০৪)। দুজনের মতেই ওই সময়কার সামাজিক-মনস্তাত্ত্বিক পরিস্থিতি বিশেষ ধরনের ছিল এবং তা ঘটনাপ্রবাহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে, এ রকমটা কেন ঘটে, তা সমাজ বিজ্ঞানীরা বেশ জড়তার সঙ্গেই ব্যাখ্যা করেন এবং অধিকাংশই আচরণের এই বিষয়টি এড়িয়ে যান। ফলে ক্ষণস্থায়ী কিন্তু খুব প্রভাবশালী বড় মাত্রার জনঘটনাগুলোর (public occurrences) একটি তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা উপস্থাপন শুরু করার জন্য টার্নারের করা ধর্মীয় আচরণের বিশ্লেষণ একটি যথাযথ ক্ষেত্র। মার্চ মাসের ঘটনাগুলোতে অংশগ্রহণকারীরা তাঁদের অভিজ্ঞতাগুলোকে নতুন কিছুর দিকে যাত্রা হিসেবে বর্ণনা করেছিলেন। এই পর্যবেক্ষকের কাছে, জ্ঞাতিসুলভ মনোভাব (fellow-feeling), টার্নারের কাছে যা 'কমিউনিটাস', ঢাকাতে বেশ প্রগাঢ় ছিল। এটি কোনো ব্যক্তি যেকোনো ধর্মীয় আচরণের অভিজ্ঞতা যেভাবে অর্জন করেন বা সেখানে একজন অংশগ্রহণকারী পর্যবেক্ষক হিসেবে তিনি যে অনুভূতি পোষণ করেন, ঢাকায় আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ব্যক্তিদের মনোভাব তেমনটিই ছিল। সাইক্লোন-পরবর্তী ঘটনাগুলোর আচরণগত প্রবণতা সম্পূর্ণ ধারণাটির একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রায়োগিক অংশ, যা অন্তত পক্ষে একবার হলেও ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করা প্রয়োজন।

৬. আওয়ামী লীগকে সমর্থন করে শিক্ষার্থীদের ১১ দফা আন্দোলনের সময় প্রথম এই পতাকা তৈরি করা হয়। আওয়ামী লীগের সমান্তরালে শিক্ষার্থীদের কার্যক্রম চলতে থাকে। মুজিব এই আন্দোলনের সুবিধা গ্রহণ করেন এবং এটিকে নির্দেশনা দিয়ে সহায়তা দেন; একই সঙ্গে তিনি এই আন্দোলন দ্বারা প্রভাবিতও হন (মনিরুজ্জামান, ১৯৮০ : ৫২-৬৮)। এই মিছিল যখন হয়, তত দিনে এই স্বেচ্ছাসেবকেরা একটি আধা সামরিক সংগঠনে পরিণত হয়েছিল। তাদের নিজস্ব পরিচয় চিহ্নও ছিল : ছয়টি সাদা তারকাচিহ্নিত সবুজ ক্যাপ।

৭. এখানে 'আনন্দ' (euphoria) শব্দটি জিল্লুর খানের (১৯৭৪) পরামর্শে ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা এই সময়ের ইতিবাচক উত্তেজনা এবং একই সঙ্গে তীব্র সন্দেহের সঙ্গে সরকারের পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য মানুষের অপেক্ষাকে নির্দেশ করা হয়েছে।

অনুবাদ : **প্রতীক বর্ধন**

গ্রন্থপঞ্জি :

Brass, Paul, 'Draft Statement for South Asian Political Economy III Project', paper prepared for Social Science Research Council Conference on Order and Anomie in South Asian Society and Culture, New Delhi, 28-30 December 1982.

Dumont, Louis, 'Religion, Politics, and Society in the Individualistic Universe', Proceedings of the Royal Anthropological Institute, 1970, pp. 31-41.

Geertz, Clifford, *The Interpretation of Cultures* (New York,1973).

Greenough, Paul, 'The Death of Chittaranjan Das', paper prepared for Social Science Research Council Conference on Order and Anomie in South Asian Society and Culture, New Delhi, 28-30 December 1982.

Hughes, Thomas P., *Dictionary of Islam* (New Delhi, 1976).

Jahan, Rounaq, 1972a, 'East Pakistan during the Decade of Ayub', in P. Bertocci (ed.), *Prelude to Crisis: Bengal and Bengal Studies in 1970* (East Lansing, 1972), pp.1-28.

---1972b, *Pakistan: Failure in National Integration* (New York, 1972).

Khan, Muin-ud Din Ahmed, *The History of the Fara'idi Movement in Bengal* (1818-1906) (Karachi, 1965).

Khan, Zilur R., personal communication, 1974.

Madan, T.N., 'The Dialectic of Ethnic and National Boundaries in the Evolution of Bangladesh', in S. Navlakha (ed.), *Studies of South Asian Social Development*, No.2 (Delhi, 1974), pp.158-83.

Maniruzzaman, Talukder, *The Bangladesh Revolution and its Aftermath* (Dacca, 1980).

Group Interests and Political Changes: Studies of Pakistan and Bangladesh (New Delhi, 1982).

Mullins, W.A., 'On the Concept of Ideology in Political Science', *American Political Science Review 66, 1972*, pp. 498-510.

Rahman, Sheikh Mujibur, *Bangladesh, My Bangladesh: Selected Essays and Statements, 28 October 1970 to 26 March 1971*, edited by Ramendu Majumdar (New Delhi 1972).

Sengupta, Jyoti, *Bangladesh in Blood and Tears* (Calcutta, 1981).

Thorp, John P., 'Master of Earth: Conceptions of "Power" among Muslims of Rural Bangladesh', PhD thesis, University of Chicago, 1978.

---'Bengali Muslims and the Symbolism of Earth: A Geertzian Analysis', in J. Morgan (ed.), *Understanding Religion and Culture: Anthropological Perspectives* (Washington, D.C., 1979).

Turkle, Sherry R., 'Symbol and Festival in the French Student Uprising (May-June 1968)', in Sally Moore and Barbara Myerhoff (eds.), *Symbol and Politics in Communal Ideology* (Ithaca, 1975), pp. 68-100.

Turner, Victor, 'Forms of Symbolic Action', in Victor Turner (ed.), *Forms of Symbolic Action* (Seattle, 1969), pp. 3-25.

---The Ritual Process (Ithaca, 1967).

Zolberg, Aristide, 'Moments of Madness', in *Politics and Society*, Winter 1972, pp. 183-207.

খ্যাতি ১৯৭১ চিন্তা

বাংলার ডায়েরি

বরিস কালিয়াগিন
ভ্লাদিমির স্কসিরিওভ

প্রাক্-কথন

১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে জন্ম হলো একটি নতুন রাষ্ট্রের, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ। স্বাধীনতা অর্জনের পথটি ছিল খুবই কঠিন একটি পথ। নতুন রাষ্ট্রের পতাকা দেশটিতে পতপত করে ওড়ার আগেই লাখ লাখ মানুষ ঘরছাড়া হয়েছে, আশ্রয় নিয়েছে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারতে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নির্যাতনের শিকার হয়ে মৃত্যুকে বরণ করে নিয়েছে। পূর্ব পাকিস্তানের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনকে গলা টিপে মারার অপচেষ্টার কারণে উপমহাদেশে যুদ্ধ পরিস্থিতির উদ্ভব হয়, এই সংকটের ফলে পাকিস্তানি প্রতিক্রিয়াশীল সরকারের পতন ঘটে।

এই বইয়ের লেখক, সোভিয়েত টেলিভিশনের প্রতিবেদক বরিস কালিয়াগিন এবং *ইজভেস্তিয়া* পত্রিকার প্রতিবেদক ভ. স্কসিরিওভ ছিলেন এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী। সাংবাদিকতার প্রতি বিশ্বস্ত থেকে তাঁরা প্রথমে গেছেন শরণার্থী শিবিরে, তারপর গিয়েছেন পাকিস্তান-ভারত সীমান্তে, যেখানে চলছিল যুদ্ধ এবং তারপর তাঁরা গেছেন সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত বাংলাদেশের ভূখণ্ডে। তাঁরা দুজন তাঁদের ডায়েরিতে যা লিখেছেন, তারই নির্যাস হলো এই 'বাংলার ডায়েরি'।

লেখক দুজনই সংকটের ধারাবাহিক বিশ্লেষণ করেননি, বাংলাদেশের সামনে কী ধরনের সংকট আছে, তা নিয়েও কথা বলেননি। তাঁরা আসলে যুদ্ধের মাঠ থেকে যে ধরনের প্রতিবেদন লিখতে হয় এবং তা লেখার জন্য যে তথ্য সংগ্রহ করতে হয়, তারই বয়ান করে গেছেন। ১৯৭১ ও ১৯৭২ সালে যখন রাষ্ট্রটির জন্ম হলো এবং যখন রাষ্ট্রটি তার জীবনের প্রথম পদক্ষেপগুলো ফেলছে, সে সময়ের কিছু কথাই ধরা থাকল এখানে। আশা করি এই ঘটনাগুলো সাধারণ পাঠকের মনোযোগ আকর্ষণ করবে।

এই ট্র্যাজেডির ভূমিকা

সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়েছে, তখন ঢাকার রাস্তা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে সেনা প্রহরা নিয়ে রাষ্ট্রপতির কালো 'মার্সিডিজ'। মুহূর্তের জন্য বিমানবন্দরে ঢোকার দরজার কাছে একটু থামে, তারপর গাড়িটি সোজা চলে আসে রানওয়েতে, পাকিস্তান বিমানবহরের সাদা-সবুজ বোয়িংয়ের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্লেনটি ওড়ার জন্য তৈরি। তেল নেওয়া হয়েছে, প্লেনের স্টাফরা উড়ানোর জন্য প্রস্তুত। গন্তব্য করাচি।

পাকিস্তানের তদানীন্তন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান তাঁর পূর্বদিকের প্রদেশের এই রাজধানীতে আগেও এসেছেন অনেকবার। এর আগে প্রতিবারই তাঁর বিদায়ের সময় উপস্থিত ছিল স্থানীয় প্রশাসনের লোকজন। কিন্তু এবার, ১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতে, সেখানে ছিল উর্দিপরা লোকেরা। পুরো রাস্তা দখল করে দাঁড়িয়ে ছিল সৈন্যদল। বিমানবন্দরে তারাই ছিল সতর্ক প্রহরায়। বালুর বস্তা সামনে রেখে নিজেদের প্রতিরক্ষার ব্যবস্থা করে তারা রাজধানীর দিকে উঁচিয়ে রেখেছিল তাদের স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র।

পরিবেশ ছিল অসম্ভব রকম থমথমে। অপেক্ষমাণ যাত্রীদের মনে তখন আতঙ্ক। এই যাত্রীদের বেশির ভাগই পশ্চিম পাকিস্তানি—পাঞ্জাবি, পশ্‌তুন। মূলত ঢাকা ও বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে এসেছিলেন ব্যবসা করতে। পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে এখানকার রাজনৈতিক নেতারা অসহযোগ আন্দোলন শুরু করার পর এই ব্যবসায়ীরা পেয়েছেন প্রচণ্ড ভয়, তাঁরা পশ্চিম পাকিস্তানে ফেরার জন্য মরিয়া হয়ে বিমানবন্দরে এসেছেন, প্লেনের টিকিটের জন্য কেরানিদের কাছে ধরনা দিয়েছেন। বিমানবন্দরে প্রেসিডেন্টের আগমন যাত্রীদের উৎকণ্ঠা দূর করল, যাত্রীদের মধ্যে যে ভয়ার্ত ফিসফিস চলছিল, তার অবসান ঘটল। অপেক্ষমাণ ব্যক্তিরা জানালা দিয়ে দেখতে লাগলেন প্রেসিডেন্টকে। আর তখন ঢাকার কেন্দ্রভাগে চলছিল মিছিলের পর মিছিল, অগণিত মানুষ এগারো তলার নির্মেদ 'ইন্টারকন্টিনেন্টাল হোটেল'-এর পাশ দিয়ে এগিয়ে চলেছিল ধানমন্ডির '৩২ নম্বর' সড়কের দিকে। সেখানেই আওয়ামী লীগ সভাপতি শেখ মুজিবুর রহমানের বাড়ি।

যেদিন ইসলামাবাদে বসে জেনারেল ইয়াহিয়া খান রেডিওতে ভাষণ দিয়ে জানালেন, ১৯৭১ সালের জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে বিজয়ী দলের হাতে এখনই ক্ষমতা ছেড়ে দিতে তিনি প্রস্তুত নন, সেই পয়লা মার্চ থেকেই ঢাকায় বিক্ষোভ চলছে, থামছেই না। সামরিক স্বৈরাচার এর আগে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন, এই ঘোষণার সঙ্গে তার কোনো মিল ছিল না। বাংলার কোটি জনতা, যাঁরা আওয়ামী লীগকে ভোট দিয়েছিলেন, তাঁরা একে প্রেসিডেন্টের ওয়াদার বরখেলাপ হিসেবে চিহ্নিত করলেন। ঢাকায় এর প্রতিবাদে শুরু হলো হরতাল। প্রদেশের রাজধানীর জনজীবন থমকে গেল। সরকারি প্রতিষ্ঠান ও কলকারখানা বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধ

হয়ে গেল দোকানপাট, থেমে গেল যানবাহন। পরদিনই সারা প্রদেশে ছড়িয়ে পড়ল হরতাল। ইসলামাবাদের নির্দেশ এখানে কোনো কাজেই আসছিল না।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে কথা বলার জন্য মার্চের মধ্যভাগে ঢাকায় এলেও কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে এই অসহযোগ আন্দোলন চলতেই থাকল। এই স্বৈরাচারী সেনা সরকার সত্যিই ক্ষমতা হস্তান্তর করবে, বাঙালিরা এ কথা একেবারেই বিশ্বাস করত না। জনসভায় নেতারা সরাসরি বলতে লাগলেন, প্রেসিডেন্ট ঢাকায় এসেছেন শুধুই কালক্ষেপণ করতে, আর তৈরি হচ্ছেন ঢাকায় দেশপ্রেমিক নাগরিকদের বিরুদ্ধে সামরিক হামলা চালানোর জন্য।

এই আশঙ্কাই সত্য হলো। জেনারেল ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানের সঙ্গে বৈঠক চালিয়ে যাওয়ার কথা ভাবলেন না। ২৫ মার্চের প্রথম অর্ধবেলা কাটালেন সেনানিবাসে পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের সঙ্গে বৈঠক করে এবং তারপর চলে গেলেন বিমানবন্দরে। প্রেসিডেন্টকে বিদায় দেওয়ার আনুষ্ঠানিকতা শেষ করা হলো খুব দ্রুত। সাদা-সবুজ বোয়িং বিমানটি আকাশে উড়ে গেল। এই বিমানটি পাকিস্তানে অবতরণ করার চার ঘণ্টা পর করাচির সেনানিবাস থেকে ঢাকায় এল কোড বার্তা। সেই নির্দেশ পেয়ে অপারেশনের জন্য প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করল পাকিস্তানি বাহিনী। পূর্ব বাংলার রাজধানীতে আঁধার নেমে আসতেই সৈনিকেরা অস্ত্র হাতে বেরিয়ে পড়ল, বের করা হলো ট্যাংক। প্রথম অস্ত্রের ঝংকার শোনা গেল রাত ১১টা ৩০ মিনিটের দিকে। রাতের আঁধারের সহায়তায় সামরিক শাসকের দল নির্যাতন চালাতে শুরু করল।

আমরা আবার এই হৃদয়বিদারক কাহিনির কাছে ফিরে আসব, কিন্তু তার আগে এই সংকটের কারণটা খুঁজে বের করা দরকার, যে কারণটি দক্ষিণ এশিয়ার এই এলাকার রাজনৈতিক মানচিত্রটাকেই বদলে দিয়েছে। এই সংকটের শুরু ১৯৪৭ সালে, যখন ব্রিটেনের সাম্রাজ্যবাদ তাদের ভারত উপনিবেশটিকে ধর্মীয় কারণে দুভাগে ভাগ করল। ভারত উপমহাদেশের একেবারে বিপরীত দুই প্রান্তে থাকা দুটি ভূখণ্ড মিলে হলো পাকিস্তান।

প্রাকৃতিকভাবে পশ্চিম পাকিস্তান আর পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে কোনো মিল নেই। পশ্চিম পাকিস্তানে রুক্ষ জমি, মরুভূমি আর পাহাড়ে ঘেরা তা। জনঘনত্ব এখানে খুব কম, ৬১ মিলিয়ন মানুষ বাস করে যে ভূখণ্ডে, তা ফ্রান্স ও ইংল্যান্ডের মিলিত ভূখণ্ডের সমান। অন্যদিকে পূর্ব বাংলাকে বলা হয় সারা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম জনঘনত্বসম্পন্ন দেশ, এখানে বাস করে ৭৫ মিলিয়ন মানুষ। এই দেশের সমতলে ধান ও পাটের চাষ হয়, পুরো দেশজুড়ে বয়ে চলে এশিয়ার দুটি বিশাল নদী : গঙ্গা ও ব্রহ্মপুত্র। বন্যা এখানকার প্রতিবছরের ঘটনা, চলাচলের ক্ষেত্রে প্রধান যানবাহন নৌকা। পশ্চিম ও পূর্ব প্রদেশকে শুধু ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটারের দূরত্ব আর

প্রাকৃতিক বৈসাদৃশ্যই আলাদা করেনি, আলাদা করেছে ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য। পূর্ব প্রদেশটির সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণই বাঙালি (৯৮ শতাংশ), পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবি, পশতুন, সিন্ধি, বেলুচি ও বেশ কিছু ক্ষুদ্র জাতিসত্তার বসবাস। পূর্ব ও পশ্চিমের দুই দিকেই মূল জনগোষ্ঠী ইসলাম ধর্মে বিশ্বাসী, তবে পূর্ব বাংলায় হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেক মানুষই বাস করে। ১৯৬১ সালের আদমশুমারি অনুযায়ী এই সংখ্যা ১৮ দশমিক ৪ শতাংশ।

পশ্চিম ও পূর্ব পাকিস্তানিদের মধ্যে চেহারায়ও কোনো মিল নেই। বাঙালিরা শ্যামলা। যেসব পার্থক্যের কথা বলা হয়েছে, রাজনৈতিক সংকট সৃষ্টির জন্য এগুলোই মুখ্য নয়। সংকটের মূল কারণ হলো ইসলামাবাদের শাসকগোষ্ঠী, তারা পশ্চিম পাকিস্তানের সামন্তশ্রেণির একচেটিয়া রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক প্রভাব চাপিয়ে দিত পূর্ব বাংলার ওপর, বাঙালি তা অনুসরণ করতে বাধ্য হতো।

ব্রিটিশ ভারতের দেশভাগ দুই দেশের জন্যই ভয়াবহ ক্ষতি ডেকে এনেছে। তবে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে পাকিস্তানের পূর্ব দিকের অংশটি। বিশ্বে উৎপাদিত তিন-চতুর্থাংশ পাটের জন্মস্থান বাংলা। কিন্তু পাটের সঙ্গে যুক্ত সব কারখানা, যন্ত্রপাতি ইত্যাদি ছিল কলকাতায়, মানে এখনকার ভারতে। পূর্ব বাংলায় শিল্প গড়ে ওঠেনি (অল্প কয়েকটি পাটের, কয়েকটি চায়ের কারখানা আছে কেবল)। বাংলায় প্রাকৃতিক সম্পদ নেই বললেই চলে, যা দিয়ে দেশের বিকাশ ঘটানো সম্ভব। পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার ক্ষেত্রে এই দুর্বলতা তাদের পিছিয়ে রাখে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর পশ্চিম পাকিস্তানে ধনসম্পদ নিয়ে ভারত থেকে আসা মুসলিম বুর্জোয়ারা বাণিজ্য শুরু করে দেয়। 'যখন লন্ডন তার পুরোনো উপনিবেশের ওপর ছুরি চালাল, ঠিক তখনই সংঘাতের তিক্ত বীজ রোপিত হয়ে গেল, যার ইতি ঘটল এক পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার মাধ্যমে।' ব্রিটিশ সাংবাদিক ডেভিড লোশাক, যিনি দীর্ঘদিন পত্রিকার প্রতিনিধি হয়ে এশিয়ায় কাটিয়েছেন দিন, এ ভাষ্য তাঁরই।

পাকিস্তানের সংবাদপত্রে প্রকাশিত খবর ও অর্থনীতিবিদদের তথ্য-উপাত্ত থেকে জানা যায়, সামরিক স্বৈরশাসনের সময়টাতে দেশের শিল্প খাতের দুই-তৃতীয়াংশ এবং ব্যাংক খাতের চার-পঞ্চমাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের ২২টি পরিবারের একচেটিয়া সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে (এই পরিবারগুলোর মধ্যে আছে আদমজী, সায়গল, ভালিকা, হারুণ, হাবিব পরিবার)। বড় বাণিজ্যের এই প্রতিভূরা অর্থনৈতিক ক্ষমতা নিজেদের হাতে কুক্ষিগত করে রাখার কারণে পূর্ব বাংলার মানুষ ও সম্পদকে শোষণ করতে পারে। পশ্চিম পাকিস্তানের একচেটিয়া কারবার পূর্ব বাংলাকে তাদের বাজারে পরিণত করেছে। নিম্নমানের কাপড়শিল্প তার মধ্যে একটি। রাষ্ট্রীয় সম্পদ বা রসদ বিতরণের ক্ষেত্রেও পূর্ব বাংলাকে অবহেলা করা হতো। পূর্ব বাংলায় বাস করত পাকিস্তানের ৫৫ শতাংশ মানুষ। এই অংশের মানুষ

পাট ও চা উৎপাদন করত। এই পাট ও চা রপ্তানি করেই পাকিস্তান বিদেশি মুদ্রার দুই-তৃতীয়াংশ আয় করত। অথচ পঞ্চাশের দশকে কেন্দ্রীয় সরকার অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য যে অর্থ খরচ করত, তার মাত্র ২০ থেকে ২৬ শতাংশ ব্যয় করা হতো পূর্ব বাংলায়। ষাটের দশকে তা দাঁড়ায় ৩২ থেকে ৩৬ শতাংশে। দেশের এই অঞ্চলে আমদানি পণ্যের এক-তৃতীয়াংশেরও কম এবং বিদেশি সাহায্যের মাত্র এক-চতুর্থাংশ আসত। যার ফলে স্বাভাবিকভাবেই দেশের দুই অংশের জনগণের মাথাপিছু আয়ে চরম বৈষম্যের সৃষ্টি হলো। ১৯৫৯-৬০ সালে এই ব্যবধান ছিল ৩২ শতাংশ। ১০ বছর পর তা বেড়ে দাঁড়াল ৬১ শতাংশে!

পূর্বের প্রদেশটিতে বেকারত্ব বাড়ল চরমভাবে, বিশেষত এই বেকারত্ব বাড়ল কলেজ শেষ করা যুবকদের মধ্যে। সরকারি ও সেনাবাহিনীর চাকরির ক্ষেত্রে বাঙালিদের সঙ্গে চরম বৈষম্য দেখানো হয়। কেন্দ্রীয় সরকার ও বাঙালিদের মধ্যে আরেকটি বড় সংকট চলছিল ভাষা নিয়ে। উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছিল, যদিও পূর্ব বাংলার ২ শতাংশ মানুষেরও মাতৃভাষা উর্দু ছিল না। উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার পর পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই পূর্ব বাংলায় চলতে থাকে বিক্ষোভ, মিছিল। অবশেষে ১৯৫৪ সালে পৌঁছে সরকার বুঝতে পারল জেলজুলুম কিংবা হত্যাযজ্ঞ ভাষা প্রশ্নে বাঙালিদের অবস্থানকে টলাতে পারবে না, তখন বাংলাকে প্রজাতন্ত্রের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু তাতে সংকট খুব একটা কাটেনি। ১৯৫৪ সালের পরও শিল্পকারখানার বড় পদগুলো, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের বড় পদগুলো, যানবাহন পরিচালনার বড় পদগুলো যারা আঁকড়ে ধরে ছিল, তাদের বেশির ভাগই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানি কিংবা ভারত থেকে আসা লোকেরা, যাদের বেশির ভাগই ছিল উর্দু ভাষাভাষী। ফলে ভাষার প্রশ্নটি ছিল খুবই উচ্চকিত।

বাঙালিদের শোষণ এমন একপর্যায়ে চলে গিয়েছিল যে তা নিয়ে খোদ ইসলামাবাদেই সমালোচনা শুরু হয়। 'আমার ধারণা (বাঙালির, লেখক) তাদের এই অসন্তোষ অবোধ্য বা ব্যাখ্যাতীত নয়'—১৯৬৯ সালের গ্রীষ্মে এই ঘোষণা দিয়েছিলেন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান। সবাই তা ভাবছিল বটে, কিন্তু প্রয়োজনীয় সংস্কার করার কাজে কেউ এগিয়ে এল না। ক্ষমতার কাছে থাকা বুর্জোয়া আমলা ও সেনা আমলারা এই সংস্কারকাজে সব সময়ই বাধা দিয়ে এসেছে। জাতীয় অধিকার আদায়ে বাঙালিদের আন্দোলন আরও সক্রিয় হলো। দেশের দুই অংশের মানুষই তখন সেনা স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছে। এ ছাড়া তাদের দাবি ছিল গণতন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদী জোট সিয়েটো ও সেন্টো থেকে পাকিস্তানের বেরিয়ে আসা।

ষাটের দশকের শেষ দিকে বাঙালির জাতীয় নেতায় পরিণত হন শেখ মুজিবুর রহমান। তিনি ১৯২০ সালের ২২ মার্চ (তথ্যটি হবে ১৭ মার্চ—অনুবাদক) পূর্ব

বাংলার একটি ক্ষুদ্র কৃষক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কলকাতার ইসলামিয়া কলেজে পড়াশোনা করেন, পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়েন। ছাত্রাবস্থায়ই শেখ মুজিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ছিলেন। ১৯৪৯ সালে তাঁকে নবগঠিত আওয়ামী লীগের সম্পাদক করা হয়। এই সময় তিনি পাকিস্তানের সরকারবিরোধী আন্দোলনের কারণে জেলে ছিলেন। এরপর বহুবার তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে, সব মিলে বছর এগারো তিনি জেলে ছিলেন। কিন্তু জেল-জুলুম তাঁকে তাঁর আদর্শ থেকে একচুলও সরাতে পারেনি। তিনি লিখেছেন অসাধারণ প্যামফ্লেট *আমাদের অধিকার, আমাদের জীবন*, যেখানে প্রথমবারের মতো উচ্চারিত হয়েছে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের প্রস্তাব।

এই কর্মসূচি নিয়েই পরবর্তীকালে নির্বাচনে অংশ নিয়েছিল আওয়ামী লীগ। কর্মসূচিতে এই দফাগুলো ছিল :

১. লাহোর প্রস্তাবের ভিত্তিতে সংবিধান রচনা করে পাকিস্তানকে একটি ফেডারেশনে পরিণত করতে হবে, যেখানে সংসদীয় পদ্ধতির সরকার থাকবে এবং প্রাপ্তবয়স্ক নাগরিকদের ভোটে নির্বাচিত আইন পরিষদ সার্বভৌম হবে;

২. ফেডারেল সরকারের হাতে থাকবে শুধু দুটি বিষয়, প্রতিরক্ষা ও বৈদেশিক সম্পর্ক এবং অপর সব বিষয় ফেডারেশনে অন্তর্ভুক্ত রাজ্যসমূহের হাতে ন্যস্ত থাকবে;

৩. পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য দুটি পৃথক অথচ সহজে বিনিময়যোগ্য মুদ্রা চালু করতে হবে। যদি তা সম্ভব না হয় তাহলে সমগ্র পাকিস্তানের জন্য ফেডারেল সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন একটিই মুদ্রাব্যবস্থা থাকবে, একটি ফেডারেল রিজার্ভ ব্যাংক ও দুটি আঞ্চলিক রিজার্ভ ব্যাংক থাকবে। তবে এ ক্ষেত্রে পূর্ব পাকিস্তান থেকে পুঁজি যাতে পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হতে না পারে তার ব্যবস্থাসংবলিত সুনির্দিষ্ট বিধি সংবিধানে সন্নিবিষ্ট করতে হবে;

৪. দুই অঞ্চলের বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের পৃথক হিসাব থাকবে এবং অর্জিত বৈদেশিক মুদ্রা রাজ্যের হাতে থাকবে। তবে ফেডারেল সরকারের জন্য প্রয়োজনীয় বৈদেশিক মুদ্রা দুই অঞ্চল থেকে সমানভাবে কিংবা উভয়ের স্বীকৃত অন্য কোনো হারে আদায় করা হবে;

৫. দুই অংশের মধ্যে দেশীয় পণ্য বিনিময়ে কোনো শুল্ক ধার্য করা হবে না এবং রাজ্যগুলো যাতে যেকোনো বিদেশি রাষ্ট্রের সঙ্গে বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে, সংবিধানে তার বিধান রাখতে হবে।

৬. প্রতিরক্ষায় পূর্ব পাকিস্তানকে স্বাবলম্বী করার লক্ষ্যে আধা সামরিক রক্ষীবাহিনী গঠন, পূর্ব পাকিস্তানে অস্ত্র কারখানা স্থাপন এবং কেন্দ্রীয় নৌবাহিনীর সদর দপ্তর পূর্ব পাকিস্তানে স্থাপন করতে হবে।

দেশের ইতিহাসে প্রথমবারের মতো প্রাপ্তবয়স্ক সব নাগরিকের অংশগ্রহণে জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে। নির্বাচনে আওয়ামী লীগ জাতীয় ও প্রাদেশিক নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করে, তাই এটা পরিষ্কার যে দেশের সরকার গঠনের দায়িত্ব পাবে এই দলটিই। কিন্তু আইন পরিষদের সভা ডাকতে জেনারেল ইয়াহিয়া নানা রকম টালবাহানা করতে থাকেন। পরের বছরের শুরুতে পাকিস্তানের প্লেনে করে সৈন্যরা আসতে থাকে ঢাকায়। কেউ যেন অভিসন্ধি বুঝতে না পারে, সেটা নিশ্চিত করতে সৈন্যদের পরিয়ে আনা হয়েছিল সাধারণ পোশাক। ২৫ মার্চের মধ্যেই প্রস্তুতি সম্পন্ন হয়েছিল আর সে রাতেই সেনারা ঝাঁপিয়ে পড়েছিল শান্তিকামী সাধারণ বাঙালিদের ওপর।

সেনা স্বৈরাচারের এই পদক্ষেপে শঙ্কিত হয়ে পড়ল পৃথিবীর শান্তিপ্রিয় সব দেশ। সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রিম সোভিয়েতের প্রেসিডেন্ট ন. ভ. পদগোর্নি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্টকে এই মুহূর্তে রক্তপাত ও নৃশংসতা বন্ধ করার ও শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সংকট উত্তীর্ণ হওয়ার আহ্বান জানালেন। এ ধরনের মানবিক আবেদন, যা লেনিনের পররাষ্ট্রবিষয়ক ভাবনার প্রতিফলন, পাকিস্তান ভারতের সঙ্গে যুদ্ধ বাধানোর আগ পর্যন্ত তা নিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন আহ্বান জানিয়ে গেছে। কিন্তু সে ন্যায় ও মানবতার আহ্বান সেনা স্বৈরাচারের কানে ঢোকেনি। ২৬ মার্চেই পাকিস্তান সরকার পূর্ব বাংলা থেকে বিদেশি সব সাংবাদিককে বের করে দেয়। তাই যুদ্ধের প্রথম কয়েক সপ্তাহের খবরাখবর বিচ্ছিন্নভাবে নানা মারফতে শোনা যায়। এই বিশাল হত্যাযজ্ঞের খবর কেবল তখনই প্রকাশিত হলো, যখন লাখ লাখ মানুষ নিজের মাটি ত্যাগ করে, ভিটা ত্যাগ করে ভারতে শরণার্থী হলো।

দারিদ্র্যের পথ ধরে

কলকাতা, ৭ অক্টোবর ১৯৭১

বনগাঁ, কলকাতার উত্তর-পূর্বদিকে ৮০ কিলোমিটার দূরের একটি শহর। রাস্তাটা বিশাল নারকেলগাছ পরিবৃত। দুই ধারেই ধানখেত, পাটের খেত। এ দৃশ্য সবখানেই। পূর্ব ভারতের সবখানেই আমরা এ দৃশ্য দেখেছি। কিন্তু এ পথে কিছুটা এগোনোর পর ছবির মতো প্রাকৃতিক দৃশ্যগুলো পরিবর্তিত হয়ে গেল। গাড়ি চলছে অসংখ্য খড়ের জীর্ণ কুঁড়ের পাশ দিয়ে, তার সামনে শুকনো, ভেঙে পড়া শরীরের মানুষ। অনেক অনেক শিশু। তারা ধুলোয় গড়াগড়ি খাচ্ছে, চলে আসছে একেবারে গাড়ির চাকার কাছে। 'এরা সবাই পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তু। সীমান্তের কাছাকাছি এলাকায় তাদের বাড়ি ছিল'—এ কথা বলে গাড়ির চালক প্রবলভাবে ব্রেক চাপল। ব্রেক চাপল একটি ট্রাককে যাওয়ার রাস্তা করে দিতে, যে ট্রাকটি যাচ্ছিল

চালের বস্তা নিয়ে। ট্রাকের গায়ে লেখা 'উদ্বাস্তুদের সাহায্য করার জন্য'। যে মুহূর্ত থেকে পাকিস্তান সেনাবাহিনী তাদের পূর্ব দিকের প্রদেশের ওপর অস্ত্র হাতে ঝাঁপিয়ে পড়ল, সেদিন থেকেই ভারতে উদ্বাস্তুদের আসা শুরু হয়েছে। প্রায় ৯০ লাখ মানুষ এখানে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয়েছে। পূর্ব পাকিস্তান লাগোয়া ভারতের চারটি প্রদেশে এসে তারা আশ্রয় নিয়েছে। তবে সবচেয়ে বেশি মানুষ আশ্রয় নিয়েছে ভারতের পশ্চিম বাংলায়, সরকারি হিসাবেই এই মানুষের সংখ্যা প্রায় ৭০ লাখ।

এই মানুষেরা কোথায় আশ্রয় পাবে? তারা কী খেয়ে বাঁচবে? কীভাবে মহামারি ঠেকানো হবে, এই প্রশ্নগুলোর ব্যাপারে দরকার ছিল ত্বরিত সিদ্ধান্তের। অন্য কিছু ভাবার উপায় যেমন ছিল না, সামর্থ্যও ছিল না। জানালেন বনগাঁর উদ্বাস্তু বিষয়ের প্রধান আ. সুর। তিনি বললেন, 'আমরা বেশির ভাগ মানুষকে শরণার্থী শিবিরে জায়গা করে দিয়েছি। কিন্তু তাতে ঠাঁই নেই। কিছুদিন আগে ভয়াবহ সাইক্লোন হয়ে যাওয়ায় শিবিরের কিছু অংশ পানিতে তলিয়ে গেছে। বের হওয়ার পথ একটাই, যারা এরই মধ্যে এসে পৌঁছেছে, তাদের এখান থেকে সরিয়ে দেশের আরও ভেতরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। তাদেরই আপনারা দেখেছেন কলকাতা থেকে এদিকে আসার পথে...।'

উপস্থিত উদ্বাস্তুদের কোলাহলের সুরে কথা তলিয়ে যায়। সেখানে নতুন উদ্বাস্তুরা রেডক্রসের তাঁবুর সামনে ভিড় জমিয়েছে। তাদের দেওয়া হচ্ছে কলেরার টিকা। একই সময়ে তাদের দেওয়া হচ্ছে বিনা পয়সায় খাদ্য পাওয়ার জন্য কার্ড। সুর আমাদের জানালেন খরচের হিসাবটাও, যা অবশ্য কলকাতাতেই আমরা জেনেছিলাম। এই উদ্বাস্তুদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য প্রতিদিন ভারত সরকারের ব্যয় হচ্ছে আড়াই কোটি রুপি। খুব কাছের শিবির থেকে শহরের উদ্বাস্তু সমন্বয় কেন্দ্রের দূরত্ব পাঁচ মিনিটের হাঁটা পথ। কেন্দ্রের প্রধান বিমানবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এ শংকর সামনের দিকে হাত উঁচিয়ে বললেন, '১০ হাজার মানুষের জন্য এই শিবিরটা করা হয়েছিল, কিন্তু এরই মধ্যে এখানে বাস করছে ১৮ হাজার মানুষ।' 'শিবির' শব্দটা আসলে প্রতীকী শব্দ হিসেবেই ব্যবহার করা হয়েছে। কারণ, আদতে এটা বাঁশ আর খড় দিয়ে তৈরি তাঁবু, যার ওপরে প্লাস্টিকের ছাউনি। ৩০ মিটার লম্বা আর ৬৭ মিটার চওড়া একেকটা তাঁবুতে ৫৫টা পরিবার বসবাস করছে।

পরিবারের প্রতিটি পূর্ণবয়স্ক সদস্যের জন্য দিনে ৪০০ গ্রাম চাল, ৫০ গ্রাম সবজি, অল্প পরিমাণ তেল আর লবণ বরাদ্দ। এই রেশন নিয়মিত সরবরাহ করা যায় না। সব সময় খাদ্য আসে না, যানবাহনের সংকট, বহু রাস্তা পানির নিচে। বন্যার কারণে পয়োনিষ্কাশন ও স্বাস্থ্যরক্ষায় সমস্যা বিদ্যমান। মি. শংকর জানালেন, কলেরার প্রকোপ থামানো গেছে, তবে পেটের পীড়া ধরনের রোগ বাড়ছে। একটু নীরব থেকে আবার বললেন তিনি, শীতকাল আসছে, খুব

শিগগিরই দরকার হবে শীতের পোশাক, কম্বল, না হলে বাঁচা কঠিন হয়ে যাবে...। এখানে সমবেত হয়েছে নানা ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের মানুষ: ধনী কৃষক, খেতমজুর, ব্যবসায়ী আর শ্রমিক, শিক্ষক আর ছাত্র। দুঃখ সবাইকে এক করেছে। কয়েকজন ঘরছাড়া মানুষের সঙ্গে আমরা কথা বলি। প্রায় মাস খানেক ধরে এই শিবিরে আছেন রাজেন্দ্রনাথ। বয়স তাঁর ষাটেরও কম, কিন্তু দেখে মনে হয় একেবারে বৃদ্ধ। তিনি বললেন, 'জুলাই মাসে ফরিদপুরে আমাদের গ্রামে পাকিস্তানি সেনারা হানা দিয়েছিল। জেরা করা শুরু করেছিল, আওয়ামী লীগের সদস্যদের খুঁজে চলেছিল তারা। আমাদের পরিবারকেও দেখছিল সন্দেহের চোখে, যদিও আমাদের পরিবারের কেউ আওয়ামী লীগ করত না। তখন আমরা পালিয়ে আত্মীয়দের বাড়িতে আশ্রয় নিই। যখন আমরা ফিরে এলাম, দেখলাম, বাড়ি পুড়িয়ে দিয়েছে, আসবাবপত্র সব ধ্বংস করে দিয়েছে।'

হালিম মিয়ার পরিবারের ভাগ্যেও ঘটেছে একই ঘটনা। কালিকাপুর গ্রামের একজন ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী তিনি। তাঁর এবং তাঁর গ্রামের মানুষের জীবনে এই দুর্ভাগ্য নেমে এসেছিল শুধু এই কারণে যে, তাঁরা সবাই গত নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের দলকে ভোট দিয়েছে। 'আমি অবশ্যই আমার গ্রামে ফিরতে চাই।' বললেন হালিম মিয়া। 'কিন্তু এখন কেউ জানে না, কাল কী হবে। যত দিন পর্যন্ত পরিস্থিতি শান্ত না হয়, আমরা এখানেই থাকব।'

৪ জুলাই ব্যানার্জি নামের যশোরের একজন ছাত্র নাম লিখিয়েছেন এই শিবিরে। তিনি জানালেন, তাঁদের গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর হামলা চালিয়েছিল মুক্তিবাহিনী। হামলার সময় দুজন পাকিস্তানি সৈন্য নিহত হয়েছিল। মুক্তিবাহিনী সরে পড়েছিল। পাকিস্তানিরা চেয়েছিল গ্রামবাসীকে উচিত শিক্ষা দিতে। পরদিন গ্রামের অর্ধেক বাড়িই তারা জ্বালিয়ে দিয়েছিল, ১২ জন গ্রামবাসীকে হত্যা করেছিল। আমরা শহরের হাসপাতালে গেলাম। ওয়ার্ডগুলোতে অসংখ্য রোগী। দুই বিছানার ফাঁকেও রোগীর অবস্থান। 'আমাদের বেশির ভাগ রোগীই উদ্বাস্তু। উদ্বাস্তু শিবিরের মতোই এখানেও স্থান সংকুলান করা কঠিন।' হাসপাতালের পরিচালক শুরুতেই এ কথা স্বীকার করে নেন। 'যে রোগীদের অবস্থা খুব বিপজ্জনক নয়, তাদের ঠাঁই হচ্ছে মেঝেতে...'। হাসপাতাল থেকে যখন আমরা বের হলাম, তখন তীব্র বাতাস বয়ে যাচ্ছে, মুষলধারে বৃষ্টির আভাস এটা। আমরা খুব দ্রুত বনগাঁ ছাড়ার চেষ্টা করলাম, কিন্তু রাস্তাজুড়ে মানুষের ভিড়ে গাড়ি দ্রুতগতিতে চালানো যাচ্ছিল না। শেষপর্যন্ত শেষ বাড়িটিও পেছনে পড়ে রইল। রাস্তার ধারে আবার দেখা গেল একে অন্যের সঙ্গে লেগে থাকা তাঁবু আর কুঁড়ে। আমরা হিসাব করে দেখলাম, যাদের ভারত সরকার উদ্বাস্তু শিবিরে জায়গা করে দিতে পারেনি, তারা প্রায় তিন কিলোমিটারজুড়ে নিজেদের ঠাঁই খুঁজে নিয়েছে।

প্রথম শট

অমৃতসর-দিল্লি, ৫ ডিসেম্বর

৩ ডিসেম্বর, শুক্রবার। এই দিনটিতে কোনো অঘটনের পূর্বাভাস ছিল না। লোকসভায় চলছিল সাধারণ বিতর্ক। সরকারি কর্ণধারেরা ছিলেন রাজধানীর বাইরে। ইন্দিরা গান্ধী ছিলেন কলকাতায়, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী জগজীবন রাম ছিলেন পাটনায়, অর্থমন্ত্রী চ্যাবন ছিলেন মুম্বাইয়ে। এমনকি ছয়টা বাজতে তিন মিনিট আগে যখন বিমান হামলার সতর্ক সাইরেন বেজে উঠেছিল, আলো নিবিয়ে দেওয়ার সংকেত দেওয়া হচ্ছিল, তখনো কেউ তা গা করেনি : এ ধরনের প্রশিক্ষণ দিল্লিতে নতুন কিছু ছিল না। তবে ঘণ্টা খানেক পর ভারতের কেন্দ্রীয় রেডিও থেকে জরুরি বার্তা দেওয়া হলো যে পাকিস্তানি বিমানবাহিনী সীমান্তসংলগ্ন শহর অমৃতসর, পাঠানকোট ও শ্রীনগরে হামলা করেছে। সরকারি তথ্য বিভাগ থেকে আমাদের টেলিফোনে জানানো হলো রাত ১১টায় সাংবাদিকদের জন্য সংবাদ সম্মেলন হবে। দারুণ কষ্ট করে অন্ধকার শহরের পথ বেয়ে আমরা সম্মেলনস্থলে হাজির হলাম। ব্ল্যাকআউটের চুল পরিমাণ ব্যত্যয় হলেই বেজে উঠছে বাঁশি, সতর্ক করে দেওয়া হচ্ছে নাগরিকদের।

সংবাদ সম্মেলনের বিশাল মিলনায়তনটিকে মনে হলো খুবই ছোট। তিল ধারণের ঠাঁই নেই। কয়েক মিনিট উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষার পর তথ্য মন্ত্রণালয়ের সচিব এলেন এবং উপস্থিত সবাইকে অবহিত করলেন, প্রেসিডেন্ট ভি ভি গিরি দেশে জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছেন। কয়েকজন দেশি ও বিদেশি সাংবাদিককে সরকার আমন্ত্রণ জানাচ্ছে পশ্চিম পাকিস্তানের সীমান্তসংলগ্ন শহরগুলোতে এবং পাকিস্তানি বিমান হামলায় ক্ষতিগ্রস্ত এলাকা পরিদর্শন করে আসতে। সে রাতে প্রায় ঘুম হলো না। রাত একটার সময় ভারতীয় কেন্দ্রীয় রেডিও থেকে ভেসে এল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর কণ্ঠস্বর, যিনি দ্রুত ফিরে এসেছেন রাজধানীতে। খুবই শান্তস্বরে কথা বললেন তিনি। সীমান্ত এলাকার সামগ্রিক অবস্থার ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, এই আগ্রাসন প্রতিহত করতে হবে এবং জানালেন, দেশের সব রাজনৈতিক দল সরকারকে সমর্থন করছে। ভোর পাঁচটায় আমাদের বাস রাজধানী ছাড়ল। তখনো সারা শহর অন্ধকার। কারও ঘুম আসছিল না। সবাই ছিল উত্তেজিত, পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনা চলছিল, কেউ রেডিওর নব ঘুরিয়ে কিছু শোনার চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছিল।

আক্রমণ যে হয়েছিল, তার লক্ষণ বোঝা যাচ্ছিল সীমান্তের ২০০ কিলোমিটার আগ থেকেই। পশ্চিম প্রান্তে ধাবমান সৈন্য ও অস্ত্রবাহী গাড়ির সংখ্যা বেড়ে গিয়েছিল রাস্তায়। আবার উল্টো দিক থেকে আহত ও ঘরছাড়া মানুষদের নিয়ে আসছিল ছোট ছোট গাড়ি আর বাস। কেউ কেউ ছুটছিল নিরাপদ আশ্রয়ের জন্য। ফিলিং স্টেশনগুলোতে পড়ে গিয়েছিল গাড়ি, মোটরসাইকেলের বিশাল লাইন। জ্বালানি তেল

রেশন করে দেওয়া হচ্ছিল। রাস্তার ওপরই বিক্রি হচ্ছিল সারি সারি সাজানো হারিকেন। এগুলো এত বেশি পরিমাণে ছিল যে দেখে সত্যিই বিস্ময় জাগে মনে। হঠাৎ করেই বেড়ে গিয়েছিল এর চাহিদা : পুরো উত্তর ভারতেই ছিল ব্ল্যাকআউট।

আমরা প্রথম গেলাম অমৃতসরে। পাঁচ লাখ মানুষের বসবাস এই শহরে। শহরটি এই অঞ্চলের বিশাল শিল্পকেন্দ্র। পাঞ্জাবের বড় জংশনও এটা। সীমান্ত থেকে ৩০ কিলোমিটার দূরত্বে এর অবস্থান। ৩ ডিসেম্বর অমৃতসরে হামলা হয়েছিল। পশ্চিমা রেডিওগুলো শুরুতেই এমন খবর পরিবেশন করতে শুরু করল, যাতে মনে হলো অমৃতসর শহরে বিশাল ধ্বংসযজ্ঞ চলেছে। কিন্তু তা ছিল অনেক বাড়িয়ে বলা। যদিও শঙ্কার মধ্যে ছিল সবাই, কিন্তু শহরের জীবনযাত্রায় তা সে রকম প্রভাব ফেলেনি। না থেমেই কাজ করে চলেছিল শিল্পকারখানা, বাজারে চলছিল স্বাভাবিক কেনাকাটা, সিনেমা হলে চলছিল চলচ্চিত্র প্রদর্শন।

অমৃতসরে বিমান হামলার কথা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমরা জানতে শুরু করি এয়ারপোর্টে বসে। এখান থেকেই সাধারণ বিমান ও যুদ্ধবিমান একই সঙ্গে ওড়ে। বেসামরিক বিমান চলাচল বিভাগের প্রধান ড. গিল আমাদের বললেন, 'গোধূলিলগ্ন তখন, এ সময় ১৫০-২০০ মিটার ওপরে অজানা দুটো প্লেনের আনাগোনা দেখা গেল। বিস্ফোরণের শব্দ শোনা গেল তারপর। কিছু সময় পরে হামলার পুনরাবৃত্তি হলো। তখন আমাদের বিমানও সক্রিয় হলো। সে রাতে কম করে হলেও চারবার বোমা হামলা হয়েছে।' 'ক্ষতির পরিমাণ কেমন?' আলোচনার সময় উপস্থিত বিমানবাহিনীর মেজর টেংরির কাছে আমরা জানতে চাইলাম। তিনি বললেন, 'আমাদের নাগরিক ও যানবাহন নিরাপদেই আছে। হতাহত নেই। হামলায় ক্ষতি হয়েছে রানওয়ের। তবে কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা তা ঠিক করে নিয়েছি।' হ্যাঁ, আমরা দেখতে পেলাম, রানওয়ের অন্তত পাঁচটি জায়গায় গাঢ় ছাইরঙের বিটুমিনের প্রলেপ। 'হামলার ফলে গর্তগুলো হয়েছিল দেড় থেকে দুই মিটার গভীর। বিমানবন্দর আবার কাজ করা শুরু করেছে।' জানালেন টেংরি। তাঁর কথা প্রমাণ করার জন্যই বুঝি একটি যুদ্ধবিমান এসে নামল বিমানবন্দরে। দুটো প্যারাস্যুট উড়িয়ে দিয়ে ব্রেক কষল।

অমৃতসর থেকে পাঠানকোটের দিকে যাওয়া রাস্তায় দুই মানুষসমান ঘাস। তা থেকে শস্য বের করে নেয় গ্রামের মেয়েরা। আমাদের আর্মি জিপ পার হয়ে যায় শস্যভরা মহিষ বা গরুর গাড়ি। যুদ্ধের কিছুই এখান থেকে বোঝা যায় না। যুদ্ধ চলে গেছে উত্তর পাঠানকোটে। শুধু আকাশে টহল দেওয়া বিমানের কর্কশ আওয়াজ স্মরণ করিয়ে দেয় অনতিদূরেই বাজছে যুদ্ধের দামামা। শহরতলি দাসুইতে এসে আমরা পড়ে গেলাম একটি জনসভার মধ্যে। সোভিয়েত সাংবাদিকদের কাছে এসে হাজির হলেন অজানা নাগরিকেরা, স্বতঃস্ফূর্তভাবে হাতে

মেলালেন হাত। বুঝলাম, জাতিসংঘের নিরাপত্তা পরিষদে সোভিয়েত প্রতিনিধির রাখা বক্তব্যের খবর এখানে পৌঁছে গেছে। তাসের খবরও পৌঁছে গেছে, যেখানে বলা হয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাকিস্তানের ভারত আক্রমণের তীব্র সমালোচনা করেছে। অনতিবিলম্বে রক্তপাত বন্ধের আহ্বান জানিয়েছে। সোভিয়েত ইউনিয়নকে ধন্যবাদ জানিয়ে আইনজীবী ব. কাপুর ও স্থানীয় বিদ্যালয়ের শিক্ষক আভতার সিং বললেন যে ভারত কখনোই যুদ্ধ চায়নি। দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে যে সংকট চলছে, তার আশু সমাধান প্রয়োজন। কাশ্মীর যাওয়ার পথে গুরুত্বপূর্ণ কৌশলগত স্থান এই পাঠানকোটে পশ্চিম ফ্রন্টের কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল ই. প. কানদেত সাংবাদিকদের বরণ করে নিলেন। তিনি তাঁর ধারণার কথা বললেন। বললেন, পাকিস্তানিদের লক্ষ্য কাশ্মীর দখল করে নেওয়া।

পাঠানকোটের এয়ারপোর্টে দেখা হলো অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্ট ব্যাটালিয়ানের মেজর মালহোত্রার সঙ্গে। তিনি বসে ছিলেন বালু দিয়ে ঘেরা, জাল দিয়ে জড়ানো, সাধারণ মানুষের চোখ থেকে লুকানো অ্যান্টিএয়ারক্রাফ্ট অস্ত্র নিয়ে। তিনি দেখালেন পাকিস্তানি বাহিনীর বিমান হামলার গতিপথ। আমরা এখানে এসে পৌঁছানোর পাঁচ ঘণ্টা আগে এখানে চারবার বিমান হামলা হয়েছে। মালহোত্রা বললেন, প্লেনগুলো খুব নিচু হয়ে উড়ছিল, যেন রাডারে ধরা না পড়ে আর ইতস্তত যেখানে যেভাবে পেরেছে রকেটবোমা বর্ষণ করেছে যত্রতত্র। একটি হামলার সময় মালহোত্রার ব্যাটালিয়ন একটি বিমানকে ভূপাতিত করেছে। বৈমানিক আত্মসমর্পণ করেছে। তাকে স্থানীয় জনগণ ধরে এনে সেনাবাহিনীর হাতে সঁপে দিয়েছে। মেজরের কাছ থেকে যখন আমরা বিদায় নিচ্ছি, তখন এখানে রকেট টারবাইনের শব্দে কানে তালা লেগে গেল। ভারতীয় বাহিনী এখানে মহড়া করছে।

কঠিন সময়

৭ ডিসেম্বর দিল্লি

সীমান্তে সংঘাত ভারতীয় রাজধানীর মুখেও তার পরশ রাখল। কলেজ ও সরকারি বিদ্যায়তনগুলোর সামনে শিক্ষার্থীরা বিমান হামলা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য ট্রেঞ্চ খুঁড়তে শুরু করল। চিকিৎসকদের সমিতি বেশি বেশি রক্ত দেওয়ার জন্য দেশের নাগরিকদের আহ্বান জানাল। এখন সকাল থেকেই হাসপাতালগুলোয় রক্ত দিতে ইচ্ছুক মানুষের সারি দেখা যাচ্ছে প্রতিদিন।

পার্লামেন্টে বক্তৃতা করার সময় ইন্দিরা গান্ধী দেশের জনগণকে সতর্ক করে দিয়ে বলেছেন, সামনে কঠিন সময়। যুদ্ধের সংকটের মুখে প্রথমেই পড়ল শ্রমিকেরা, এমনিতেই তাদের জীবন খুব একটা সুখকর ছিল না। দিল্লির দক্ষিণভাগের আবাসন শ্রমিকেরা আমাদের জানাল, এরই মধ্যে আটা, চাল, কেরোসিন আর চিনির দাম বেড়ে গেছে। কোনো কোনো পণ্য দোকান থেকে হাওয়া হয়ে গেছে। বিশাল কাঁধের লম্বা ৪০ বছর বয়সী লোকটা, বনওয়ারি লাল যাঁর নাম, তিনি দেশি সস্তা তামাক দিয়ে বানানো সিগারেটে টান দিয়ে সেটা পাশে বসা আরেকজনকে দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন বিষয়টা, 'সিগারেটের দামও বেড়ে গেছে! যদি আমাদের সেনাবাহিনীর জওয়ানদের ভালো খাওয়া, পরার জন্য সরকার জিনিসপত্রের দাম বাড়াত, তাহলে আমরা তা সানন্দে মেনে নিতাম। কিন্তু এই মুদ্রাস্ফীতি তো সরকারের কারণে ঘটছে না। এটা ঘটাচ্ছে অসাধু ব্যবসায়ীরা।' বনওয়ারি লালের পাশে বসা মুনশী রাম যোগ করলেন, 'কালোবাজারিদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম আরও জোরদার করতে হবে।'

সরকার খুবই চেষ্টা করছে পণ্য পরিবহন ও জনগণকে পণ্যপ্রাপ্তির নিশ্চয়তা দিতে। রাজধানী ও অন্যান্য শহরে কার্ডের মাধ্যমে রেশন দেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছে, যেন ন্যায্যমূল্যে পণ্য পাওয়া যায়। শীতের ফসলপ্রাপ্তির ওপর এই সংকটের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে। দেশের কৃষিমন্ত্রী ঘোষণা করেছেন, এবার দেশজুড়ে ফসল খুব ভালো হয়েছে। গুদামে প্রচুর পরিমাণে খাবারের মজুত আছে, সুতরাং দেশের মানুষের আতঙ্কিত হওয়ার কিছু নেই। এ সময়টায় পূর্ব পাকিস্তান থেকে আসা উদ্বাস্তুদের ঠিকভাবে রাখার জন্য জোরদার কাজ করে যাচ্ছিল সরকারের একটি বিভাগ। এই বিভাগের প্রধান গ. কাহলোনের টেলিফোনটা সকাল থেকে নিশুতি রাত পর্যন্ত বাজতেই থাকত, বাজতেই থাকত...।

'আগে যেমন, তেমনই' তিনি বলতে থাকেন, 'আমাদের প্রতিদিন অসংখ্য প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমাদের প্রথম দায় শিশুরা, যারা না খেতে পেরে কাহিল অবস্থায় আছে। আমরা শিবিরে বিশেষ ধরনের খাবার পাঠানোর চেষ্টা করছি। আসামের পাহাড়ি এলাকায় আর পশ্চিম বাংলার সমতলে আশ্রয় নেওয়া উদ্বাস্তুরা সামনের শীতে কাহিল হয়ে পড়বে, তাদের বাঁচানোর জন্য এখনই কম্বল আর গরম কাপড় পাঠানো শুরু করেছি। দুঃখের বিষয় হলো, মুষলধারে বৃষ্টি কোনো কোনো জায়গায় ট্রেন চলাচলে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। রাস্তাও ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, তাই সময়মতো পণ্য পৌঁছানো কঠিন হয়ে পড়েছে। 'এই অর্থনৈতিক বছরে আমরা উদ্বাস্তুদের জন্য ৭০০ মিলিয়ন ডলার খরচ করব। ভারত সরকারের অর্থনৈতিক অবস্থার জন্য এটা দারুণ কঠিন সময়' বললেন কাহলোন। স্বয়ং জীবন এখন যুদ্ধের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে এবং এই সংকটের শান্তিপূর্ণ মীমাংসার জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে।

যাব কোথায়

কলকাতা, ১২ ডিসেম্বর

অমৃতসর থেকে ফেরার পর থেকে শুরু হলো আমাদের ভয়াবহ প্রতীক্ষা। আমরা

খুবই মনোযোগ দিয়ে ভারতীয় রেডিও শুনছিলাম, যেখানে প্রতি ঘণ্টায় ফ্রন্টের অবস্থা জানিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। ভারতীয় সরকারের প্রতি সন্ধ্যার 'ব্রিফিং' (সংক্ষিপ্ত সংবাদ সম্মেলন) আমাদের যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে অবহিত করত এবং আমরা মস্কোতে খবরগুলো পৌঁছে দিতে পারতাম। কিন্তু আমাদের সম্পাদকমণ্ডলীকে কি এই খবরটুকু তৃপ্তি দিতে পারত? সরকারি এই ব্রিফিং তো আমাদের দিল্লির তাস থেকেই সরবরাহ করা হতো। তাসের কর্মীরা দিনরাত ২৪ ঘণ্টা টেলিটাইপের সামনেই থাকত। আমরা বুঝতে পারছিলাম, সংবাদের স্বার্থে আমাদের আবার যেতে হবে মূলত ঘটনাগুলো যেখানে ঘটছে, ফ্রন্টে। কিন্তু একটা প্রশ্নের উত্তর পাওয়ার খুব দরকার ছিল : যাব কোথায়, পশ্চিম ফ্রন্টে নাকি পূর্ব ফ্রন্টে? আবার এমন না হয়ে বসে, খবরের জন্য আমরা গেলাম একদিকে কিন্তু ঘটনা ঘটল অন্যদিকে। এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেলাম সপ্তাহ খানেক পরে, যখন তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। বোঝা গেল, পশ্চিম ফ্রন্টে কঠিন যুদ্ধ হলেও, ট্যাংকে ট্যাংকে টক্কর হলেও এদিকটায় নাটকীয় কিছু ঘটবে না। ইন্দিরা গান্ধী ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী জগজীবন রামের দেওয়া ঘোষণায় প্রতিফলিত হয়েছিল ভারতীয় সরকারের অবস্থান, তাঁরা বলেছিলেন, ভারত এখানে কোনো সীমান্তযুদ্ধে অবতীর্ণ হয়নি, ভারত যা করছে তা আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। পাকিস্তানি সেনাবাহিনী সম্ভবত হামলা করার মতো যথেষ্ট শক্তি জড়ো করে উঠতে পারেনি। এই সময়ে পূর্ব ফ্রন্টে মুক্তিবাহিনী আর ভারতের মিত্র বাহিনী একই সঙ্গে সামনে এগিয়ে চলেছিল। বাংলাদেশ প্রজাতন্ত্রের নিয়ন্ত্রণে থাকা অঞ্চল দিনকে দিন বাড়ছিল।

আমরা ঠিক করে ফেললাম, কী করতে হবে আর তাই পরদিনই কলকাতায় ফেরার প্লেন ধরলাম (প্লেনের নিয়মিত ফ্লাইট বাতিল করা হয়নি, যদিও ফ্লাইটের সংখ্যা কমিয়ে দেওয়া হয়েছে)। আমরা খুবই অবাক হলাম কলকাতাবাসীর মনে বিমান হামলার ভয় একেবারেই নেই দেখে। জানতে পারলাম, পূর্ব ফ্রন্টে ভারতের বিমানযুদ্ধে ভারত এতটাই এগিয়ে ছিল যে কলকাতাবাসীর বিমান হামলার বিপদ একবারেই ছিল না। স্থানীয় তথ্যকেন্দ্রে যোগাযোগ করলে তারা আমাদের পাঠিয়ে দিল কর্নেল রিকখির কাছে, তিনি ভারতের পূর্বাঞ্চলীয় সেনাবাহিনীর প্রেসের দিকটা সামলাচ্ছেন। শহরের একেবারে কেন্দ্রে তাঁর অফিসে অনেক সাংবাদিক কাজ করছিলেন। এখানে ভারতীয় সাংবাদিকদের চেয়ে পশ্চিম ইউরোপ ও যুক্তরাষ্ট্রের সাংবাদিকদেরই সংখ্যাধিক্য ছিল। তাঁরা সবাই ফ্রন্টে যাওয়ার অনুমতির জন্য কর্নেলের কাছে আবেদন করছিলেন। আমাদের উত্তেজনা ধাক্কা খেল...।

তবে খুব শিগগিরই আমরা বুঝতে পারলাম, যতটা ভেবেছি, অবস্থা ততটা খারাপ নয়। ভারতীয় বাহিনী ঠিক করল সীমানা পেরিয়ে বাংলাদেশে ঢুকবে আর যাদের তারা নিয়ে যাবে, সেই দলে জায়গা হবে আমাদের। এরপর ভারতীয় বাহিনীর কমান্ডার আমাদের একটি ঘোষণা বা অঙ্গীকারপত্রে স্বাক্ষর করতে বললেন। সেখানে লেখা ছিল যুদ্ধসাংবাদিক হিসেবে আমরা যদি কোনো সরাসরি যুদ্ধের মধ্যে পড়ি, তাহলে ভারতীয় সরকার তার দায় বহন করবে না। বলা যায়, এই অঙ্গীকার করাটা ছিল শুধু আনুষ্ঠানিকতা। আমাদের সাংবাদিকদের যে অফিসার ফ্রন্টে নিয়ে যাচ্ছিলেন, তাঁরা সেই রাস্তাটাই ধরেছিলেন, যেখানে পাকিস্তানিদের হম্বিতম্বি শেষ হয়ে গেছে। শুধু একদিন, আকস্মিকভাবেই গোলাগুলির মধ্যে পড়তে হয়েছিল আমাদের। শিল্পশহর খুলনায় আমরা মুক্তিবাহিনী ও পাকিস্তানি বাহিনীর গোলাগুলির মধ্যে পড়েছিলাম, তখনো পাকিস্তানিরা সেখানে অস্ত্র সমর্পণ করেনি।

যশোরে ভোর

যশোর-কলকাতা, ১৪ ডিসেম্বর

জনা পনেরো মানুষ, যার মধ্যে আছে নারী, তরুণ, নানা বয়সের কচি ছেলেমেয়ে, সামনের দিকে দ্রুত এগিয়ে যাচ্ছিল যুদ্ধশকটের দিকে কোনো রকম ভ্রুক্ষেপ না করে। সবার আগে লাঠি হাতে এগিয়ে চলেছিলেন বছর আশি বয়সের এক বৃদ্ধ। তিনি এই পরিবারের প্রধান। বোঝা যাচ্ছিল, পথ চলতে কষ্ট হচ্ছে তাঁর। শ্বাস নেওয়ার জন্য একটু থেমে তিনি তাকাচ্ছিলেন পূর্বদিকে যত দূর চোখ যায়। কলকাতা থেকে বাংলাদেশের সীমান্তের দিকে ধাবমান মানুষের অভিযাত্রায় এদেরই প্রথম দেখেছি তা নয়। হাজার হাজার সাময়িক উদ্বাস্তু মানুষ ভারতের শিবির ছেড়ে স্বাধীন হওয়া ভূখণ্ডে পা রাখছে। না ভারত সরকার না বাংলাদেশ সরকার, কেউই এ বিষয়টি নিয়ন্ত্রণ করছিল না, এক কোটি মানুষকে স্বাধীন ভূখণ্ডে ফেরত পাঠানোর মতো অবস্থায় তারা ছিল না, স্বতঃস্ফূর্তভাবেই মানুষ ফিরে যাচ্ছিল নিজ গ্রামে, নিজ দেশে, কিন্তু স্বাধীন ভূখণ্ড এখনো তাদের গ্রহণে প্রস্তুত হয়নি, কিন্তু নিজ বাসভূমিতে ফিরে যাওয়ার এই গতিকে থামানোর সাধ্য কার?

দেশ তাদের জন্য কী নিয়ে অপেক্ষা করছে? এই প্রশ্নটি প্রত্যেক শরণার্থীর চোখে দৃশ্যমান, আমরা যে সাংবাদিকেরা পূর্ববঙ্গের বড় প্রশাসনিক কেন্দ্র যশোরের দিকে যাচ্ছিলাম, তাদেরও প্রশ্নটি তাড়িত করছিল। রাস্তাটা নয়নাভিরাম : ছবির মতো আম, কলার বাগান, প্রথম দর্শনে বিশ্বাসই হতে চায় না এ রকম অসাধারণ সৌন্দর্যমণ্ডিত অঞ্চলে কী করে এ রকম বিয়োগান্তক ঘটনা ঘটতে পারে, কী করে সেই বেদনাময় আখ্যান লাখ লাখ মানুষের জীবন কেড়ে নিতে পারে? কিন্তু একটু এগোলেই যখন দেখা যায় নদীর ওপর ভাঙা সেতু, শস্যহীন খেত, সন্ত্রাসের রাজত্ব শুরু হওয়ার পর কৃষকেরা জমিতে আর শস্য বুনতে পারেননি। যশোর আমাদের বরণ করে নিল অবিশ্বাস্য এক স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে। একতলা বাড়িগুলো থেকে লতিয়ে উঠেছে লালরঙা বাগানবিলাস। চারপাশের পরিস্থিতি দেখে মনে হলো

হতবিহ্বল পাকিস্তানি বাহিনী তড়িঘড়ি শহর ছেড়ে পালিয়েছে। তাই শহরের এই এলাকায় ক্ষতির ছাপ দেখা গেল না। মনে হলো, শেষ কয়েক মাসের ঘটনা এই শহরকে রক্ষা করেছে। কিন্তু আমাদের এই ধারণা পরিবর্তিত হতে বেশি সময় লাগল না। স্থানীয় ডাকঘরের একজন কর্মী আমাদের নিয়ে গেলেন শংকরপুরের এক পতিত জমিতে। আমাদের চোখের সামনে উঠে এল বীভৎস এক চিত্র: অগভীর পাথরের কুয়ো ভরে আছে করোটি আর মানুষের হাড়ে। কাছেই, জঙ্গলের মধ্যে আরও বড় এক বধ্যভূমি।

গণহত্যা থেকে বেঁচে যাওয়া প্রত্যক্ষদর্শীরা হত্যার শিকার হওয়া মানুষের সংখ্যা বলতে পারলেন না। তাঁরা বললেন, গত দুই মাস এই পতিত জমিটি হত্যাকাণ্ডের জন্য ব্যবহৃত হতো। প্রতিদিন রাতে পাকিস্তানিদের কাছ থেকে পয়সা খাওয়া রাজাকারেরা বাঙালিদের রুমালে চোখ বেঁধে, হাত পিছমোড়া করে বেঁধে এখানে নিয়ে আসত। যশোরের প্রশাসনিক ভবনে দেখা পাওয়া গেল বেশ কিছু মানুষের, যাঁরা অলৌকিকভাবে মৃত্যুর হাত থেকে বেঁচে গেছেন। মার্চ মাসে যখন সবাই অসহযোগ আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন, তখন খুলনার জনপ্রশাসনের কর্মী সানোয়ার আলীও অফিস করেননি। তাঁকে গ্রেপ্তার করার কারণ ছিল সেটাই। 'আমাকে সকাল সাতটার সময় বাড়িতে এসে ধরে নিয়ে গেল' স্মৃতিচারণা করলেন সানোয়ার আলী। 'যশোরের সেনাছাউনিতে নিয়ে গেল। আমাকে জেরা করল গোয়েন্দা বিভাগের মেজর ওমর খুশিদ। তবে এটাকে জেরা বলা যায় কি না, তা নিয়ে সন্দেহ আছে। তিনি আমার নাম লিখে ফেলার পরই সৈন্যরা আমাকে পেটাতে শুরু করে দিল। এরপর একটা ঘরে আটকে রাখল। সেখানে পাথরের মেঝেতে একজন অপরিচিত বন্দী পড়ে ছিলেন। তাঁর চোখে-মুখে কালশিটে পড়ে গিয়েছিল, সারা শরীর ছিল রক্তে মাখামাখি। তখন আমি তাঁকে চিনতে পারিনি। কয়েক ঘণ্টা পর আমাকে নিয়ে যাওয়া হলো আরেকটি ঘরে। পরদিন আমার সঙ্গী বন্দীকে দুবার নিয়ে গেল জেরা করার জন্য। সেদিন বিকেলে আমি প্রথমবারের মতো তাঁর দুর্বল কণ্ঠস্বর শুনতে পেলাম, সে কণ্ঠ যন্ত্রণায় কাঁপছিল। আমি তাঁর মুখের কাছে কান রাখলাম, শুনলাম তিনি বিড়বিড় করে প্রার্থনা করছেন, যে প্রার্থনা প্রতিটি ধর্মভীরু মুসলমান মৃত্যুর আগে করে। পরে আমি জানতে পারলাম, তিনি ছিলেন আওয়ামী লীগের জনপ্রিয় নেতা মশিয়ুর রহমান। তিনি ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের সদস্য হিসেবে নির্বাচিত হয়েছিলেন। সেদিনের পর থেকে তাঁকে কেউ দেখেনি। আমি নিশ্চিত, তিনি শহীদ হয়েছেন' কথা শেষ করলেন সানোয়ার আলী।

সামরিক সরকারের পক্ষে স্বাধিকার আন্দোলনের কণ্ঠ রোধ করার চেষ্টা সফল হয়নি। নেতাদের বড় একটি অংশ গা-ঢাকা দিয়েছিল। এখন পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদ ও প্রাদেশিক পরিষদের জনপ্রতিনিধিরা যশোরে আঞ্চলিক কমিটি গঠন

করেছেন। এই কমিটি এখানকার নতুন প্রশাসন গড়ে তুলছে। এই প্রশাসনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন ওয়ালিউল ইসলাম। তিনি আগে যশোরেই কাজ করতেন। তাঁর কাজের জায়গা ছিল অস্ত্রাগার। যখন পাকিস্তানি বাহিনী সাধারণ মানুষের ওপর নৃশংসতা শুরু করল, তখন ওয়ালিউল ইসলাম অস্ত্রাগারের দরজা খুলে দিয়েছিলেন এবং নিজে যোগ দিয়েছিলেন মুক্তিবাহিনীতে। এখন এই ৩০ বছর বয়সী লোকটির কাঁধে অনেক বড় দায়িত্ব। তাঁকে এখন এই অঞ্চলের স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে হবে। এখানে বাস করে প্রায় এক কোটি মানুষ।

'পলায়নের সময় পাকিস্তানি বাহিনী আমাদের যোগাযোগব্যবস্থা, যানবাহন, জ্বালানি তেলের পাম্প—সব ধ্বংস করে দিয়ে গেছে। আমাদের এখানে জ্বালানি তেল আর খাদ্যপণ্যের অভাব। তবে প্রজাতন্ত্রের সরকার শক্তিশালী হচ্ছে।' ওয়ালিউল ইসলাম বলতে থাকেন কথা। 'টেলিফোন, ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ এরই মধ্যে কাজ করতে শুরু করেছে। কলেরার হাত থেকে বাঁচানোর জন্য ইতিমধ্যেই জনগণকে টিকা দেওয়া শুরু হয়েছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এ ব্যাপারে আমাদের সাহায্য করছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী এরই মধ্যে আমাদের বিদ্যুৎকেন্দ্র সচল করার জন্য জ্বালানি দিয়েছে, অবকাঠামো গড়ে তোলার জন্য পণ্য সরবরাহ করছে। এ কথা সত্যি, সবকিছু নতুন করে শুরু করা খুব কঠিন। এখন তো ধ্বংসযজ্ঞ কাটিয়ে ওঠাটাই একমাত্র কাজ নয়, দেশে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া শুরু করাও দরকার। আমাদের শক্তি শ্রমিক, কৃষক ও ছাত্র; তারাই তো স্বাধীনতার আন্দোলনকে বেগবান করে তুলেছে।'

হঠাৎ করেই তাঁর সঙ্গে কথা থামাতে হলো। তাঁর কাছে এসেছে ছাত্ররা। ছাত্রলীগের সভাপতি সিদ্দিকী (নূরে আলম সিদ্দিকী) বললেন, 'আমাদের সমর্থন করার জন্য আপনাদের দেশকে ধন্যবাদ জানাই। আমাদের দেশের বিরুদ্ধে চীন-মার্কিন ষড়যন্ত্র ব্যর্থ করে দিয়েছে সোভিয়েত ইউনিয়ন। যুক্তরাষ্ট্রের অবস্থান আমাদের জানা, কিন্তু চীন কেন এ ধরনের আচরণ করল, তা আমি একেবারেই বুঝে পেলাম না। জনগণ আন্দোলন অগ্রাহ্য করে সাম্রাজ্যবাদের পক্ষে দাঁড়াল। আমি ৭ ডিসেম্বর ছাত্রদের উদ্দেশে রেডিওতে দেওয়া আমার ভাষণে এ কথাই বলেছি।' দিনের মধ্যভাগে আমরা আমাদের নব্যপরিচিত মানুষের কাছ থেকে বিদায় নিলাম। রাস্তায় মানুষের সংখ্যা ক্রমাগত বাড়ছে। রিকশার হ্যান্ডেলে, বাড়ির বাগানে, ছাদে, এমনকি তালগাছের মাথায়ও উড়ছে বাংলাদেশের পতাকা, সবুজ জমিনে লাল গোলক, মাঝখানে দেশের মানচিত্র (দেশ স্বাধীন হওয়ার পর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, সবুজ জমিনে লাল গোলকই হবে বাংলাদেশের পতাকা)। যশোর থেকে তিন কিলোমিটার দূরে হঠাৎ করে থেমে গেল জিপ: রাস্তা ভাঙা। কোদাল হাতে ভারতীয় সেনাবাহিনী সে ভাঙা রাস্তা জোড়া দেওয়ার চেষ্টা করে যাচ্ছে।

তাদের সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করে যাচ্ছে রঙিন কাপড়ে নিজেদের মোড়ানো কৃষকেরা। তারা মাটি সরাচ্ছে, ইট আনছে।

'স্থানীয় জনগণ স্বেচ্ছায় আমাদের সাহায্য করছে।' কাছে-ধারে থাকা অফিসার আমাদের বললেন, 'আমরা তাদের এক পয়সাও দিচ্ছি না, তবে তাদের কাজ করার জন্য জোরও করছি না। কিন্তু প্রতিদিন শত শত মানুষ কাজ করার জন্য চলে আসে। এটা তাদের দেশের মাটি, তাই তারা দ্রুত সবকিছু ঠিকঠাক করে ফেলতে চায়।' যখন ফিরলাম, তখন রাত হয়ে গেছে। রাজপথ শূন্য। গাড়ির আলোয় কখনো কখনো স্পষ্ট হয় কর্তব্যপালনরত কোনো মুক্তিসেনার অবয়ব। পূর্ব বাংলার আকাশে নতুন ভোর আসছে।

মুক্ত ঢাকায় প্রথম দিন

ঢাকা, ১৭ ডিসেম্বর

২৬ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় সবাই জেনে গেল, পূর্ব বাংলায় পাকিস্তান বাহিনীর কমান্ডার লেফটেন্যান্ট জেনারেল নিয়াজি আত্মসমর্পণের দলিলে স্বাক্ষর করেছেন। কলকাতার 'গ্রান্ড ইস্ট হোটেল'-এ বসে আমরা মাথা কুটে মরছি, কী করে ঢাকায় পৌঁছানো যায়। একের পর এক পরিকল্পনা আসছে মাথায়, কিন্তু সে পরিকল্পনাগুলো বাস্তবে রূপায়ণ করা অসম্ভব। ভারতীয় প্রশাসন বিদেশি সাংবাদিকদের সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকা যাওয়ার প্রশ্নে একেবারেই বাদ সাধেনি। ব্যাপারটা হচ্ছে, কী করে যাবে। ঢাকা বিমানবন্দরের রানওয়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছে, ঢাকায় প্রবেশের সময় তিন দিক থেকে যে তিনটি নদীর ওপর সেতু ছিল, সেগুলো ভেঙে ফেলা হয়েছে, রেলপথও ধ্বংস করা হয়েছে।

কোনো উপায় বের করতে না পেরে অগত্যা আমরা ঘুমানোর কথাই ভাবলাম। রুশ প্রবাদ বলে, 'রাত পোহালে বুদ্ধি খোলে'। প্রাচীন এই রুশ প্রবাদ আমাদের ঠিক পথেই নিয়ে গেল। সকাল ৯টা ৩০ মিনিটে টেলিফোন বেজে উঠল, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রেস সেন্টার থেকে লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিকলি ফোন করেছেন। তিনি বললেন, ৪৫ মিনিট পর কলকাতার দমদম বিমানবন্দর থেকে একটি যুদ্ধ হেলিকপ্টার ঢাকায় যাবে, সেই হেলিকপ্টারে আমরা চাইলে যেতে পারি। তৈরি হতে আমাদের ১০ মিনিটের বেশি লাগল না। ক্যামেরায় নতুন ফিল্ম ভরলাম, নতুন ক্যাসেট ভরলাম টেপরেকর্ডারে, ডায়েরি এবং ফিল্ম ঢুকালাম ব্রিফকেসে। ব্যস তৈরি। ছোট, কিন্তু আরামদায়ক কাচঘেরা হেলিকপ্টারটি প্রথমে একটু এদিক-ওদিক দুলল, তারপর না কেঁপে উড়ে গেল আকাশে, ধরল উত্তর-পূর্ব পথ। নামার আগে ঢাকার আকাশে বেশ কয়েকবার ঘুরপাক খেল হেলিকপ্টার। আমরা দেখতে পেলাম ছোট ছোট বাড়ির মসৃণ ছাদ, সবুজে ঢাকা পড়ে যাওয়া রাজপথ।

রাজধানীর মানুষের মনের অবস্থা কোন পর্যায়ে, সেটে বুঝলাম এয়ারপোর্টের লাইন দিয়ে নির্দিষ্ট করে দেওয়া জায়গায় হেলিকপ্টারটি নামার পরপরই হাজার হাজার মানুষ এসে উচ্ছ্বসিত স্লোগান দিতে লাগল হেলিকপ্টারের কাছে এসে। 'জয় বাংলা', 'জয় ভারত' স্লোগানে কাঁপছিল চারদিক। হেলিকপ্টারের চালকদের আলিঙ্গনাবদ্ধ করা হলো, করমর্দন করতে হলো তাদের। কিছুক্ষণের মধ্যেই হেলিকপ্টারের সামনে হাজির হলো যুদ্ধট্রাক। সে ট্রাক নির্দিষ্ট পোশাক ও সাদা পোশাকের যুবকে ঠাসা। তারা বলছিল, 'ভারতবাসী আমাদের বন্ধু। আমাদের দেশের মাটিতে তাদের স্বাগত জানাই। কিন্তু এয়ারপোর্টে ভিড় বাড়িয়ে সমস্যা তৈরি করা ঠিক হবে না। মিটিং করুন অন্য কোথাও, এখানে নয়।' কথা শুনল মানুষ। সরে গেল হেলিকপ্টার ছেড়ে। লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিকলি বললেন, ট্রাকের এই যুবকেরা মুক্তিবাহিনীর সদস্য। নতুন প্রশাসন এসে ক্ষমতা হাতে নেওয়ার আগে ওরাই শহরের নিরাপত্তা নিশ্চিত করছে।

আমাদের চারদিকে মানুষের ঢল, সবাই ঘিরে রেখেছে আমাদের, তার মাঝ দিয়েই আমরা বিমানবন্দর থেকে বের হওয়ার রাস্তার দিকে এগোই। ট্যাক্সি থাকার কোনো প্রশ্নই আসে না, কিন্তু বেশ কয়েকজন গাড়ির মালিক স্বেচ্ছায় আমাদের স্বাধীন বাংলাদেশের রাজধানী ঘুরে দেখানোর প্রস্তাব করলেন। আমাদের সঙ্গে থাকলেন সিকলি, আমরা গিয়ে উঠলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক মনজুরের ছোট ফিয়াট গাড়িতে। মাত্র তিন ঘণ্টার মধ্যে আমাদের ঘুরে বেড়াতে হবে ঢাকা, এরপর আবার আমাদের হেলিকপ্টার কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেবে। দারুণ ব্যাপার। তার ওপর আমাদের গাইড মনজুর একসঙ্গে জমে থাকা সব কথা বলে দিতে চাইছে, এক মুহূর্তের জন্য তার মুখ থামছে না। সারা ঢাকা শহর আনন্দ-উল্লাসে মত্ত। বাড়িতে, দরজায়, দেয়ালে, গাছে, সবখানেই নতুন প্রজাতন্ত্রের জাতীয় পতাকা। তিলধারণের ঠাঁই নেই, এমন ট্রাকগুলো যাচ্ছে যুবকদের নিয়ে, তাদের কণ্ঠ থেকে 'জয় বাংলা' স্লোগান নামতেই চায় না। চারদিকে তৃপ্ত, সুখী সব মুখ। মানুষ একে অন্যকে অভিনন্দন জানাচ্ছে, গান গাইছে, স্লোগান দিচ্ছে, পাকিস্তানি সৈন্যদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া অস্ত্র থেকে ফাঁকা গুলি করছে।

শহরটাকে দেখে মনে হয়, এ যেন বড় এক যুদ্ধশিবির। ট্রাকে করে আসছে সশস্ত্র মুক্তিযোদ্ধারা, ট্রাকে করে আসছে ভারতীয় সৈন্যরা। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালের সামনে ট্যাংক, সেখানে সশস্ত্র পাহারা। ছাদে বিশাল কাপড়ে লেখা রেডক্রস। এই ভবনটি যুদ্ধাবস্থায় নিরপেক্ষ এলাকা হিসেবে বিবেচিত হতো। রেডক্রসের কার্যক্রম এখান থেকে পরিচালিত হতো। মূল শহরে ক্ষতি হয়েছে খুব কম। ভারতীয় সেনাবাহিনী বোমা ফেলেছে শহরের বাইরে শুধু সামরিক স্থাপনার ওপরই। সেনা চেকপোস্টের কাছে এসে ব্রেক করল আমাদের গাড়ি। এই রাস্তা

গেছে ক্যান্টনমেন্টের দিকে। সেখানে যুদ্ধবন্দী পাকিস্তানি সেনারা যাচ্ছে। তাদের দেখে মনে হলো না, তারা খুব শঙ্কার মধ্যে আছে। বরং যুদ্ধ শেষ হয়েছে, এ কথা ভেবে তাদের মনে বেশ খানিকটা তৃপ্তি।

ঢাকায় পাকিস্তানি সৈন্যসংখ্যা কত? ভারতের ৩১১ মাউনটেন্ট পদাতিক বাহিনীর অফিসার, যাঁরা প্রথম ঢুকেছে এ শহরে, ক্যাপ্টেন চক্রবর্তী বললেন, এখনো মোট আত্মসমর্পণ করা সেনাদের সংখ্যা নিরূপণ হয়নি। আন্দাজে বললে সংখ্যাটা হবে ১৫ হাজার। 'আত্মসমর্পণের আন্তর্জাতিক সব নিয়ম কঠোরভাবে মেনে চলছি আমরা। যুদ্ধবন্দীদের সঙ্গে আমরা মানবিক আচরণ করছি' বললেন তিনি। ঢাকায় যখন আমাদের অবস্থানের সময় প্রায় শেষ, সে সময় আমরা গেলাম সোভিয়েত দূতাবাসে। এটা ছিল শহরের এক প্রান্তে। খুব কঠিন সময় পার করলেও দূতাবাসের সবাই কাজ করে যাচ্ছিলেন নিয়মমতো। আমাদের দেখে দূতাবাসের কর্মকর্তা ও কর্মীরা খুব খুশি হলেন। থেকে যেতে বললেন। দূতাবাসে আমাদের থাকার মতো ঘর আছে বলে জানালেন। আমরা লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিকলিকে জানিয়ে দিই, ঢাকায় আমাদের দূতাবাসে আমরা কয়েক দিন থাকব। অফিসার চলে গেলেন কিন্তু ঠিক তারপর থেকেই আমরা খুব দ্বিধাদ্বন্দ্বে পড়ে গেলাম। জানা গেল, বহির্বিশ্বের সঙ্গে ঢাকার টেলিফোন ও টেলিগ্রাফের যোগাযোগ এখনো স্থাপিত হয়নি। এর মানে, আমরা এখানে থেকে গেলে আমাদের দেশে কোনো খবরই পাঠাতে পারব না।

খুব অল্প সময়ের মধ্যে সংশয় কাটিয়ে আমরা ছুট দিলাম বিমানবন্দরের দিকে। বিমানবন্দরে এরই মধ্যে কিছুটা নিয়মানুবর্তিতা যোগ হয়েছে। বাইরের মানুষদের সরিয়ে নেওয়া হয়েছে রানওয়ে থেকে। রানওয়েতে যাওয়ার দরজায় দাঁড়িয়ে আছে অস্ত্র হাতে সেনা। আমরা নিশ্চিত এই সেনারা আমাদের মতো বিদেশিদের রানওয়েতে যেতে অনুমতি দেবে না। বিস্মিত হয়ে দেখলাম, আমাদের হেলিকপ্টারের পাখা এরই মধ্যে ঘুরতে শুরু করেছে। এখন কী করব? ভাবনায় ডুব দেওয়ার সময় নেই। সেনাদের ভড়কে দিয়ে এয়ারপোর্টের দেয়াল টপকে গেলাম এবং সেনাদের সতর্ক হুইসেল ও চিৎকার-চেঁচামেচি অগ্রাহ্য করে হেলিকপ্টারের দিকে ছুট লাগালাম। ছুটতে ছুটতেই দেখলাম, অফিসার সেনাদের জানিয়ে দিলেন, আমাদের যেন হেনস্তা করা না হয়। লেফটেন্যান্ট কর্নেল সিকলি হেলিকপ্টারের কাচের দরজার ভেতর দিয়ে আমাদের দিকে হাত নাড়ছেন।

যুদ্ধের পদচিহ্ন ধরে

খুলনা, ১৯ ডিসেম্বর

বাংলাদেশের সীমান্তসংলগ্ন গ্রামগুলোয় যুদ্ধের চিহ্ন নেই বললেই চলে। সাবেক পাকিস্তানের কাস্টমস হাউসের জানালা ভাঙা, গাছগুলোতে শেলের আঘাত,

বেনাপোল থেকে খুলনা যাওয়ার পথে এটুকুই শুধু কয়েক দিন আগের যুদ্ধের কথা মনে করিয়ে দেয়। বেনাপোল থেকে পাঁচ কিলোমিটার দূরে গর্ত খুঁড়ে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়েছিল পাকিস্তানি সেনারা। পাকিস্তানের প্রতিরক্ষার মূল ঘাঁটিই ছিল এটা। কিন্তু মুক্তিবাহিনী ও ভারতীয় বাহিনী এ জায়গা দিয়ে এ দেশে প্রবেশ করেনি, এই শক্ত ঘাঁটির সঙ্গে সংঘাত এড়িয়ে গেছে। আত্মসমর্পণের পর এখানে সব ধরনের গোলাবারুদ, যুদ্ধ সরঞ্জাম ফেলে গেছে পাকিস্তানিরা।

একটি ফার্মে প্রহরায় ছিল ভারতীয় এক সৈন্য। খুশিতে গদগদ হয়ে সে সাংবাদিকদের খুলে দিল দরজা। এখানে স্তূপ করে রাখা হয়েছে পাকিস্তানি বাহিনীর ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র। ১০৫ মিমি গোলা, ট্রাক, জিপ, আর্টিলারির বাক্সে মার্কিন ছাপ মারা, পাকিস্তানের জন্য আমেরিকার সামরিক সহযোগিতার চিহ্ন। তার পাশেই মাইনের বাক্স। আর তাতে চীনা অক্ষর, ইয়েরোপ্লিফ। এ যেন প্রতীকী দহরম-মহরম। ওয়াশিংটন ও পিকিং সরাসরি সাহায্য করেছে পাকিস্তানি খুনি সরকারকে। স্বাধীন খুলনার রাস্তায় মানুষ আর মানুষ। এখানে নতুন প্রশাসনের কাউকে যে পেয়ে যাব, এমনটা ভাবা কঠিন। সাংবাদিকদের নিয়ে কয়েকটি গাড়ি গিয়ে থামল একটি দ্বিতল বাড়ির সামনে। সে বাড়ির দরজায় দাঁড়িয়েছিল গোটা বিশেক শ্মশ্রুমণ্ডিত যুবক। *শিকাগো ডেইলি নিউজ*-এর প্রতিনিধি বাড়িতে ঢুকেই সাক্ষাৎকার নেওয়ার জন্য মরিয়া হয়ে পড়লেন। যাঁর সঙ্গে কথা হচ্ছে, তাঁর নাম জানার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি প্রশ্ন করতে শুরু করলেন, 'কতজন পাকিস্তানি সেনাকে আপনি নিজের হাতে হত্যা করেছেন?' 'অস্ত্রগুলো নিয়ে কী করবেন? সরকারকে দিয়ে দেবেন নাকি নিজের কাছে রেখে দেবেন?'

মুক্তিবহিনীর কমান্ডার সাইদ ইসা বিদেশি সাংবাদিককে আনন্দের সঙ্গে বরণ করে নিলেন কিন্তু প্রশ্নগুলোর উত্তর না দিয়ে নিজেই প্রশ্ন করলেন সাংবাদিককে, 'আপনি কোন পত্রিকার প্রতিনিধিত্ব করছেন?' আমেরিকান নিজের পরিচয় দিলেন, এরপর তার বন্ধু স্ক্যান্ডানেভিয়ান টেলি এজেন্সির সাংবাদিকেরও পরিচয় দিলেন। সাইদ ইসা ও তাঁর বন্ধুরা কোনো প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে চুপ করে থাকলেন। সাক্ষাৎকার নেওয়া আর হলো না। তখন আমরা বললাম যে আমরা মস্কোর সাংবাদিক, আমরা আপনাদের প্রশ্ন করতে চাই। আকস্মিক এক প্রতিক্রিয়া পেলাম আমরা। ইসা আমাদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন, আলিঙ্গনে আবদ্ধ করলেন। তিনি জানালেন, খুলনা ছেড়ে গিয়ে তিনি তাঁর স্কোয়াডটি খুলনার ১০০ যোদ্ধা নিয়ে এপ্রিলে গঠন করেছিলেন। আপনার কল্পনায় বাংলাদেশকে ঠিক কেমন দেখছেন? আওয়ামী লীগ তাদের ইশতেহারে যে কথা বলেছে, আমরা সেটা সমর্থন করি। নতুন দেশ যে মূলনীতিগুলো নিয়ে চলবে, তা হলো গণতন্ত্র, সমাজতন্ত্র ও ধর্মনিরপেক্ষতা।

ইসা আমাদের দেখাল, কোথায় মুক্তিবাহিনীর আঞ্চলিক অফিস খোলা হয়েছে। সেখানে আমরা একজন কমান্ডারের সঙ্গে পরিচিত হলাম, হুদা তাঁর নাম। তাঁর অধস্তন ব্যক্তিরা তাঁকে 'মেজর' বলে ডাকল কিন্তু তাতে হুদা (খন্দকার নাজমুল হুদা, পঁচাত্তরের ৭ নভেম্বর নিহত হন) হাসলেন। ব্যাখ্যা করলেন এই বলে যে এই পদবিটি প্রতীকী অর্থে দেওয়া হয়েছে। যদি কেউ এক হাজার বা তার বেশি যোদ্ধাকে নেতৃত্ব দেন, তাহলে তাঁকে মেজর নামে ডাকা হয়। যোদ্ধারা দুই ধরনের বাহিনী গড়ে তুলেছিল। নিয়মিত বাহিনী (মুক্তিফৌজ), যার কেন্দ্রে ছিল সাবেক পাকিস্তানি সেনারা। ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ও পদাতিক বাহিনী। আর ছিল অনিয়মিত বাহিনী (মুক্তিবাহিনী), এই দলে যোগ দিতে পারত মুক্তিকামী যেকোনো মানুষ। প্রশিক্ষণের ওপর নির্ভর করত এদের কে কোথায় কাজ করবে। পুরো দেশকে ১১টি সেক্টরে ভাগ করা হয়েছিল, সেই সেক্টরগুলোর মধ্যে আবার ছিল কিছু উপভাগ। সেক্টর কমান্ডার ও তাঁদের সহযোগীরা ছিলেন নিয়মিত সেনাবাহিনীর সদস্য। হুদা নিজে ছিলেন পাকিস্তান সেনাবাহিনীতে এবং তাঁর পদবি ছিল ক্যাপ্টেন। বাঙালিদের অসহযোগ আন্দোলন সমর্থন করায় তাঁকে নিরস্ত্র করে ফেলা হয়।

তিনি খুলনায় চলে আসেন এবং এখানকার ছাত্র, শ্রমিক ও কৃষকদের নিয়ে নিজের বাহিনী গড়ে তোলেন। এই দলে এসে যোগ দেন পুলিশ ও সেনাবাহিনীর সাবেক সদস্যরা। সব মিলে প্রায় ছয় হাজার মানুষ এই দলে যোগ দেন। তারপরও, হুদা খুব ভালো করেই জানতেন, দারুণ দেশপ্রেম থাকলেও ট্যাংক, আর্টিলারি আর বিমানসমৃদ্ধ একটি নিয়মিত বাহিনীর মুখোমুখি হওয়ার মতো যোগ্য নয় তাঁর বাহিনী। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার উপায় একটাই, গেরিলা যুদ্ধ। পুরো দলটি কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে গ্রামেগঞ্জে ছড়িয়ে গেল। গ্রামে পাকিস্তানি বাহিনীর ওপর হামলা চালানো অপেক্ষাকৃত সহজ ছিল, একের পর এক নদী, জলাবদ্ধ ধানের খেত পাকিস্তানিদের আর্টিলারি আর পদাতিক বাহিনীর চলার গতি কঠিন করে দিত। পাকিস্তানি বাহিনী রাস্তা থেকে বেশি দূরত্বে যাওয়ার ঝুঁকি নিত না। তাই প্রতিটি গ্রামই গেরিলাদের জন্য হয়ে উঠেছিল নির্ভয় আশ্রয়স্থল। এলাকা মুক্ত করে মুক্তিবাহিনী স্থানীয় প্রশাসনকে বসিয়ে দেওয়া শুরু করল এবং তা দিনে দিনে বাড়তেই থাকল। সেখানেই স্বেচ্ছাসেবীদের গেরিলা বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সুযোগ তৈরি করা হয়েছিল।

মেজরের মতে, ডিসেম্বর মাসে তাঁদের বাহিনীর সদস্যসংখ্যা ৩০ হাজার ছাড়িয়ে গিয়েছিল। যখন ভারতীয় বাহিনী খুলনায় এল, তখন মুক্তিবাহিনী শহরের মধ্যেই আক্রমণ চালানো শুরু করল। আর পাকিস্তানিরা আত্মসমর্পণ করার পর পুলিশ যে কাজটা করে, সেটাই এখানে করে চলেছে মুক্তিবাহিনী। চশমা চোখে মাঝারি গড়নের হুদাকে কলেজের শিক্ষক হিসেবেই মানাত ভালো, সেনা অফিসার হিসেবে ততটা নয়। তাঁর পরনে ছিল সাধারণ নাগরিকদের মতো প্যান্ট, হাফহাতা

শার্ট। সে যে সেনাবাহিনীর লোক, সেটা শুধু বোঝা যাচ্ছিল কোমরে হোলস্টারে গোঁজা পিস্তলের কারণে। আমরা প্রশ্ন করলাম, 'আপনি তো মনে হয় নিয়মিত সেনাবাহিনীতেই রয়ে যাবেন?' 'স্বাধীনতার পর আমি সাংবাদিক হতে চাই। সময় এখনো আছে। আমার তো মাত্র তেত্রিশ বছর বয়স!'

মুক্তিবাহিনীর কেন্দ্রীয় অফিস থেকে বেরিয়ে আমরা গেলাম এবার পৌরসভা ভবনে। বোঝা যাচ্ছিল, নতুন প্রশাসন এরই মধ্যে নিজেদের হাতে লাগাম ধরা শুরু করেছে। আমাদের উৎসুক করেছিল প্রশ্নগুলো, শহরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য প্রশাসন কী করছে, নাগরিকদের প্রাথমিক চাহিদা মেটানোর জন্য প্রশাসন কী করছে? এখানে এসে *শিকাগো ডেইলি নিউজ*-এর সহকর্মীর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ ঘটে। তিনি প্রশাসনের বিভিন্নজনের মধ্যে মতদ্বৈধতা খুঁজতে এবং কোথাও মুক্তিবাহিনী ও নিয়মিত সেনাবাহিনীর মধ্যে কোলাহল হচ্ছে কি না, সে খবর নিতে অন্য কোথাও চলে যান। সমুদ্র পার হয়ে যাওয়া দেশগুলোতে তখন এই ধরনের গুজব খুব করে ছড়িয়ে পড়ছিল।

খুলনার সহকারী কমিশনার কমল সিদ্দিকীর (কামাল সিদ্দিকী—সম্পাদক) ঘরে রাষ্ট্রীয় আঞ্চলিক অফিসের বেশ কয়েকজন কর্মচারীর দেখা মিলল। যশোরের মতোই এখানেও যে প্রশ্নটির সমাধান করতে হচ্ছে তা হলো, কত দ্রুত খাদ্য ও জ্বালানি সরবরাহের ব্যবস্থা করা যায়, কীভাবে ফিরতে থাকা শরণার্থীদের বরণ করে নেওয়া যায়। যাঁরা এখানে এসেছেন, তাঁদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁদের পরিবারে ঘটেছে ভয়াবহ নৃশংসতা। একজন অনুরোধ করলেন ভয়াবহ সন্ত্রাসের সময় হারিয়ে যাওয়া মানুষদের খুঁজে বের করতে। অন্যদের কেউ কেউ এসেছেন এই প্রশ্ন নিয়ে, 'পাকিস্তানি সেনাবাহিনী তো ঘরদোর সব পুড়িয়ে দিয়েছে, সেই বাড়ি গড়ার আগ পর্যন্ত আবাসনের কী হবে?'

শহর শত্রুমুক্ত হওয়ার পরপরই পাওয়া গেল পাকিস্তানি ও রাজাকারদের চালানো নৃশংসতার নতুন খবর। বধ্যভূমির সৃষ্টি হয়েছে রেডিওস্টেশনের খুব কাছেই। যাঁরা স্বজন হারিয়েছেন, তাঁদের মানসিক অবস্থা কী হতে পারে, তা তো সহজেই বোঝা যায়। খুলনা শত্রুমুক্ত হওয়ার পরপরই খুনের শিকার হওয়া মানুষের স্বজনেরা নিজের হাতে তুলে নিয়েছিল আইন। তারা প্রতিশোধ নিতে চেয়েছিল। কমল সিদ্দিকী (কামাল সিদ্দিকী) বললেন, 'আমাদের প্রশাসন খবর পাওয়ার পর থেকেই চেষ্টা করছে এ ধরনের ঘটনা যেন আর না ঘটে, সেটা নিশ্চিত করতে।' যারা এই হত্যাযজ্ঞ ঘটিয়েছে, অবশ্যই তাদের দাঁড়াতে হবে আদালতের কাঠগড়ায়। বাংলাদেশ সরকার অবাঙালিদের প্রতি শত্রুভাবাপন্ন হওয়া বা তাদের শোষণ করার বিরুদ্ধে। সংখ্যালঘু উর্দু ভাষাভাষীরা দেশের যেকোনো নাগরিকের মতোই অধিকার ভোগ করবেন।

ঢাকা ক্ষত সেরে উঠছে

ঢাকা, ২২ ডিসেম্বর

ঢাকা শহরটিকে দেখলে সেই মানুষটির কথা মনে পড়ে, যিনি দারুণ এক ট্র্যাজেডির ধকল কাটিয়ে ধীরে ধীরে শরীরে আর মনে শক্তি সঞ্চয় করছেন। অনেক বাড়ির দেয়ালে বন্দুক আর মেশিনগানের গুলির স্মৃতি থাকলেও শহরের প্রান্তভাগ মাইনমুক্ত করা হয়েছে। স্থানীয় প্রশাসন স্বাভাবিক জীবনযাত্রা নিশ্চিত করার জন্য কঠোর পরিশ্রম করে চলেছে। শহরের প্রশাসনের প্রথম দায়িত্ব নাগরিকদের জন্য খাদ্যের ব্যবস্থা করা। পুরোনো ঢাকায়, যেখানে ব্যবসা চলত তুমুলভাবে, সেখানে এখনো ব্যবসায়ীরা ব্যবসা শুরু করতে পারেননি। তাঁরা ভালো সময়ের জন্য অপেক্ষা করছেন। কিন্তু সেখানে বাজারগুলো খুলে গেছে। আছে প্রচুর চাল আর সবজির সরবরাহ, এগুলোই বাঙালির মূল খাদ্য। আমাদের জানানো হলো, গ্রাম থেকে শহরে খাদ্য সরবরাহ বাড়ছে। যে কৃষকেরা শহরে পণ্য নিয়ে আসতে ভয় পেতেন, তাঁরা সেই ভয় কাটিয়ে উঠেছেন, বাজারে আসছেন মাল নিয়ে। কিন্তু এটা পরিষ্কার, সরবরাহব্যবস্থা খুব দ্রুত আয়ত্তে আনা যাবে না। আরও কিছু সময় যাবে, ভেঙে যাওয়া সেতু মেরামত করতে, রেল রাস্তা আর রাজপথ মেরামত করতে। ঢাকার সঙ্গে দেশের অন্য অংশকে এগুলোই বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। ফলে আপাতত নৌপথই সরবরাহব্যবস্থার মূল শক্তি হিসেবে কাজ করছে।

বুড়িগঙ্গা নদীর ঘাটে এসে প্রতিমুহূর্তে লাগছে কোনো না কোনো নৌযান। কখনো তা ভারী বার্জ, কখনো ত্রিকোণ পালতোলা সাম্পান, কখনো মালসমেত ট্রলার, কখনো ছোট ছোট নৌকা, যা ব্যবহৃত হচ্ছে ঘাট পারাপারে। দারুণ হাসিতে চারপাশ ভরিয়ে দিয়ে বৈঠায় হাত দিচ্ছেন খেয়ানৌকার মাঝি। পন্টুন আর বিশ্রামকক্ষে তিল ধারণের ঠাঁই নেই। সেনানিবাসেও নিয়মানুবর্তিতা ফিরে এসেছে। ঢোকার মুখে ভারতীয় সেনাবাহিনীর সদস্যরা রয়েছেন সশস্ত্র প্রহরায়। পাকিস্তানি যুদ্ধবন্দীরা ক্যান্টনমেন্টের সে জায়গাগুলোতেই আছে, যেখানে আগে ছিল। এই যুদ্ধশহরে সেনাবাহিনীর লোকজনের পাশে সিভিল প্রশাসনের লোকজনদেরও দেখা যাচ্ছে। শহরে এরই মধ্যে বিদ্যুৎব্যবস্থা ও পানি সরবরাহব্যবস্থা চালু হয়েছে। কিন্তু পাকিস্তানি বাহিনীর নির্দেশে টেলিসংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর থেকে এখনো তা পুনঃস্থাপিত হয়নি। ফলে আমরা বিদেশি সাংবাদিকেরা পড়েছি সমস্যায়, এখান থেকে আমাদের সংবাদ ভারতীয় যুদ্ধবিমানে করে কলকাতায় আমাদের এজেন্সির কাছে পাঠাচ্ছি। তারা সেটা প্রচার করছে। ঢাকা এয়ারপোর্টের রানওয়ে মেরামত করার কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে, বোমা হামলায় তা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল।

দেশের সামনে এখন শুধু অর্থনৈতিক সংকট নয়। সংকট রাজনৈতিকও। বাংলাদেশ এরই মধ্যে স্বাধিকার আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী বিশেষজ্ঞদের সরকারি চাকরিতে নিয়োগ দিচ্ছে। সে রকমই একজন সরকারি কর্মকর্তা কাদেরকে পেলাম আমরা। সামনের সংকটের ব্যাপারটা কাদের (এম নূরুল কাদের) মোটেই আড়াল করলেন না। 'লক্ষ লক্ষ শরণার্থীকে ফিরিয়ে আনা আমাদের সামনে একটা বড় কাজ। তাদের ফেরার জন্য পরিবহন, খাওয়ার জন্য খাবার এবং অস্থায়ীভাবে থাকার জন্য ঘর দরকার। আমাদের প্রথম কাজই হবে এই বিষয়টির দিকে নজর দেওয়া। আমার বিশ্বাস, দেশের মানুষের, বিশেষ করে তরুণদের সক্রিয় সহযোগিতায় আমরা এই কাজটি করতে পারব' বললেন কাদের। সন্ধ্যাবেলায় মুক্তিবাহিনীর সদস্যরা ঢাকার রাজপথ টহল দেন। তাঁদের কাজ হচ্ছে সন্ত্রাসীদের হাত থেকে নাগরিকদের রক্ষা করা। এই সন্ত্রাসীরা এখনো অস্ত্র হাতে পুলিশের চোখ এড়িয়ে ঘাপটি মেরে আছে কোথাও না কোথাও।

গানের ফিরে আসা

ঢাকা, ২৩ ডিসেম্বর

করিমুল আলমের ভাবুক চোখ, যুবকের মতো কণ্ঠস্বর। খুবই সাধারণ পোশাক তাঁর। চকরাবকরা টি-শার্ট আর সুতির প্যান্ট। তিনি আমাদের সামনে বসে আছেন এবং বিচিত্র নামে একটি সুরযন্ত্র বাজাচ্ছেন, এটি একটি তারের বাদ্যযন্ত্র।

আমার সোনার বাংলা
আমি তোমায় ভালোবাসি

এটা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা গান। এখন বাংলাদেশের জাতীয় সংগীত। শেষবারের মতো এই গান গাওয়া হয়েছে নয় মাস আগে, মিছিল আর অসহযোগ আন্দোলনের সময়। এরপর গানটি গাওয়ার কোনো উপায় ছিল না। বিষয়টি করিমুল আলমের চেয়ে কে আর বেশি জানে! করিমুল স্মৃতিচারণা করেন, '২৫ মার্চ রাতে বন্ধুদের সঙ্গে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হলে ছিলাম। গুলির আওয়াজে রাতের ঘুম ভেঙে গেল আমাদের। আমরা জানালা দিয়ে বাইরে তাকালাম এবং বুঝতে পারলাম, পাকিস্তানি সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট আক্রমণ করে বাঙালিদের ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। গোলাগুলি চলতেই থাকল শেষ রাত অবধি। কেউই বুঝতে পারছিল না, কী ঘটছিল শহরে। কিন্তু দেখা যাচ্ছিল শহরের রাস্তাজুড়ে কেবল সৈন্য আর সৈন্য। দুপুরের দিকে সেনাবাহিনী আমাদের হল ঘেরাও করল। এরপর আমরা করিডরে ভারী বুটের আওয়াজ, পাশের ঘরে দরজায় খটখট, বাঁচার জন্য প্রার্থনা এবং গুলি শুনতে পেলাম।' 'সময়টা ছিল ভয়াবহ। আমাদের মনে কোনো সন্দেহই ছিল না, কিছুক্ষণের মধ্যেই ওরা আমাদের ঘর

পর্যন্ত আসবে। সৈন্যরা আমাদের ঘরের দরজা ধাক্কাল। আমি দরজা খুলে দিলাম। তাঁরা দেয়ালের সামনে আমাদের সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াতে বলল। তারপর আমাদের দিকে বন্দুক তাক করল। এরপর কী ঘটল তা কুয়াশার মতো মনে আছে। আমি মেঝেতে পড়ে গিয়েছিলাম, পাশে আমার বন্ধুরা। আমি মরে গেছি, এমন ভাব করে নিথর শুয়ে রইলাম।'

করিমুলের কথা এগিয়ে নিয়ে যান মনজুরুল। 'বিকেল পর্যন্ত করিমুল শুয়ে থাকে সেখানে। সন্ধ্যা হওয়ার পর বিশ্ববিদ্যালয়ের দেয়াল টপকে বেরিয়ে আসে করিমুল। গোলাগুলিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়া একটি বাড়ির সামনে এসে পড়ে যায়। সেখানেই আমরা ওকে খুঁজে পাই। ডাক্তারদের পক্ষে ওকে হাসপাতালে ধরে রাখা সম্ভব হয়নি, একজন স্বজনের বাড়িতে ও লুকিয়ে থাকে।' আলম তাঁর শরীরের কোথায় গুলি লেগেছিল, তা আমাদের দেখান। ঘাড়ের নিচে গুলিটা ঢুকেছিল, অল্পের জন্য ফুসফুসে স্পর্শ না করে বেরিয়ে গিয়েছিল গুলিটা। ভাগ্য ভালো বলেই বেঁচে গিয়েছিলেন তিনি। সামরিক জান্তা ভেবেছিল এই সন্ত্রাস স্বাধিকার আন্দোলনকে দমিয়ে দেবে। কিন্তু হলো ঠিক তার উল্টো। ছাত্র, শ্রমিকেরা শহর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ল, যোগ দিল গেরিলা বাহিনীতে। পাকিস্তানের ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্টের সাবেক সেনাদের অধীনে লোকালয় থেকে দূরে গড়ে উঠছিল গেরিলা বাহিনী। আঠারো-বাইশের তরুণেরাই ছিল এই বাহিনীর প্রাণ। ভাবুক, সংগীতে নিমজ্জিত, কবিতায় আচ্ছন্ন করিমুল আলমও অস্ত্র হাতে নিলেন। যুদ্ধ কী, তা তিনি জানতেন না।

পাকিস্তানি বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধ করেছে যারা, তাদের মধ্যে তরুণেরাই সবদিক থেকে এগিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে এসে এরা ডেরা গেড়েছে, প্রতিমুহূর্তেই এদের কেউ না কেউ ছুটছে মিটিংয়ে, বিতর্কে। তারা নিজের ভূখণ্ডের মালিক হয়েছে। ভবিষ্যতেও মালিক থাকবে। আমরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন অনুষদে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়নের কার্যালয়ে গেলাম। হলের সামনের সবুজ চত্বরে অসংখ্য মানুষ। শোনা গেল, আগামীকাল ছাত্র ইউনিয়নের যে মিছিল হবে, তারই প্রস্তুতি চলছে এখন। এই মিছিলের নেতৃত্ব দেবেন যাঁরা, তাঁরা ঝুঁকে পড়ে দেশের মানচিত্র দেখছেন। কোন রাস্তা দিয়ে কোন দিকে মিছিলটি এগোবে তা ঠিক করার জন্যই এই আয়োজন। ব্ল্যাকবোর্ডে চক দিয়ে লেখা, 'স্বাধীন বাংলাদেশের জয়'। দীর্ঘাঙ্গী, শুকনো যুবক, ছাত্র ইউনিয়নের প্রেসিডেন্ট নুরুল ইসলাম (নুরুল ইসলাম নাহিদ, বর্তমান শিক্ষামন্ত্রী) করমর্দনের জন্য আমাদের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। 'আমাদের কাছের লক্ষ্য দেশের স্বাধীনতা, সে লক্ষ্য পূরণ হয়েছে। কিন্তু সংগ্রাম এখনো চলছে। শহরে এখনো পাকিস্তানিদের দোসরেরা রয়েছে, রয়েছে মার্কিন এজেন্টরা। আমাদের দল আহ্বান জানাচ্ছে গণতান্ত্রিক এই আন্দোলনকে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদবিরোধী ও চীনা নেতৃত্বের বিরুদ্ধে পরিচালিত করতে। আমরা

সোভিয়েত ইউনিয়ন ও ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বের বন্ধন দৃঢ় করতে চাই। এই স্লোগান নিয়েই আমাদের মিছিল হবে কাল।' বললেন নূরুল ইসলাম।

ফিরে এলেন মুজিবুর রহমান

ঢাকা, ১০ জানুয়ারি ১৯৭২ সাল

যে দিনটির জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল বাংলাদেশের জনগণ, সে দিনটি এল। সারা বিশ্বের সংবাদমাধ্যম ছড়িয়ে দিল সর্বত্র এ খবর : শেখ মুক্তি পেয়েছেন, এখন তিনি পাকিস্তান এয়ারলাইনসের একটি প্লেনে, তাঁর গন্তব্য লন্ডন। পূর্ব বাংলার নেতা শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত জানতেন না প্লেনটা তাঁকে নিয়ে কোথায় যাচ্ছে। তিনি দাবি করেছিলেন, সবচেয়ে কম সময়ের মধ্যে নিজের দেশে ফিরে যেতে। কিন্তু পাকিস্তান ও বাংলাদেশের মধ্যে কূটনৈতিক সম্পর্ক ছিল না। ভারত এই দায়িত্বটা নিতে চাইছিল কিন্তু পাকিস্তান তা বাতিল করে দিয়েছিল। আপস ফর্মুলা হিসেবে তারা দুই দেশ শরণাপন্ন হয়েছিল ইংল্যান্ড সরকারের। ১০ জানুয়ারি সকাল থেকেই বিমানবন্দরের দিকে বয়ে যাচ্ছিল মানুষের স্রোত। এয়ারপোর্ট থেকে রেসকোর্স পর্যন্ত পুরো পথই লোকে লোকারণ্য। রেসকোর্সেই ভাষণ দেবেন শেখ মুজিবুর রহমান। এখানেই ১৯৭১ সালের ৭ মার্চ মুজিব ভাষণ দিয়েছিলেন, চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিলেন পাকিস্তানের সামরিক শাসককে, জাতির অধিকার আদায়ের মরিয়া সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। নয় মাসের ব্যবধানে এখানেই দখলদার বাহিনী আত্মসমর্পণ করেছিল।

পুরো রাজপথই উৎসবমুখর। জাতীয় পতাকা টানানো হয়েছে সর্বত্র। বেজে চলেছে অর্কেস্ট্রা। কখন তিনি এসে পৌঁছাবেন, তার নির্দিষ্ট সময় কারও জানা ছিল না : মুজিবুর রহমান দিল্লিতে নেমেছেন। সেখানে তিনি ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন এবং জনসভায় ভাষণ দিয়েছেন। এই তো আকাশে দেখা যাচ্ছে চার ইঞ্জিনের প্লেন, ব্যাপক ক্ষতির শিকার হওয়া ঢাকা এয়ারপোর্ট মেরামত করার পর এই প্রথম কোনো বড় বিমান নামছে এখানে। প্লেন থামতেই প্রটোকল গেল কোথায় ভেসে! মুজিব প্লেন থেকে বেরিয়ে আসতেই পুলিশ কর্ডন ভেঙে জনস্রোত এগিয়ে গেল তাঁর দিকে। মুহূর্তের মধ্যেই মুজিব বন্দী হলেন জনমানুষের হাতে। শেখ মুজিব ও তাঁর সতীর্থরা লাল ও আকাশি রঙে রং করা একটি খোলা ট্রাকে উঠে এলেন। আরও অনেক বাস, ট্রাক, গাড়িতে চড়ে বসলেন রাজনৈতিক নেতা, নতুন প্রশাসনের কর্মকর্তা, ছাত্রনেতা, ট্রেড ইউনিয়ন নেতা ও মুক্তিবাহিনীর কমান্ডাররা। এই বিশাল মিছিলটিকে সঙ্গ দিচ্ছিল ঢোলের বাড়ি, স্লোগান, গলা ছেড়ে গান। যে পথ অনায়াসে ২০ মিনিটে পাড়ি দেওয়া যায়, তা পার হতে লাগল কয়েক ঘণ্টা!

রেসকোর্স ময়দানে স্বাধীন প্রজাতন্ত্রের নাগরিকদের সামনে শেখের প্রথম বক্তৃতা। স্বাধিকার আন্দোলনের সময় সংগ্রাম ও আত্মাহুতির কথা স্মরণ করে কথা বলতে গিয়ে তিনি চোখের জলে ভাসলেন, কান্নার আবেগে কিছুক্ষণ নীরব হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। মুজিবুর রহমান ঘোষণা করলেন, নতুন এই প্রজাতন্ত্র শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও জোটনিরপেক্ষ থাকবে, রাষ্ট্রের মূলমন্ত্র হবে গণতন্ত্র, অসাম্প্রদায়িকতা ও সমাজতন্ত্র। স্বাধীনতা যুদ্ধের পক্ষে অবস্থান করার জন্য তিনি হৃদয়ের অন্তস্তল থেকে ভারত ও সোভিয়েত ইউনিয়নের জনগণের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানালেন। এই স্মরণীয় দিনটিতে বাংলাদেশ টেলিভিশন সোভিয়েত ইউনিয়নের চলচ্চিত্র 'আলেক্সান্দর পারখোমেনকো' প্রদর্শন করে।

তথ্যের খোঁজে

ঢাকা, ১২ জানুয়ারি

দেশের অবস্থা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ সংবাদ পাব কোথায়? সারা পৃথিবী থেকে বাংলাদেশে এসে জড়ো হওয়া সাংবাদিকদের কাছ থেকে এই প্রশ্ন শুনতে শুনতে হিমশিম খেয়ে গেল সরকারের গণমাধ্যমবিষয়ক বিভাগ। তারা খুব একটা সহযোগিতা করার মতো অবস্থায় ছিল না। যুদ্ধের আগে যাঁরা সেনা শাসনের সময় মিডিয়ার এই কাজের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, তাঁদের নতুন সরকার বিশ্বাস করতে পারছিল না। ফলে বিদেশি সাংবাদিকদের জিজ্ঞাসার খোরাক মেটায়, তাদের কাছে এমন কোনো গ্রহণযোগ্য কোনো তথ্যই ছিল না। সংবাদকর্মীরা নিজেদের মতো করেই একটা 'পুল' তৈরি করে নিল। যে যেখানে যাচ্ছে, সেখানে যা ঘটছে, তা সবাই মিলে আলোচনা করে নিচ্ছে। হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে প্রতি সন্ধ্যায় বসতাম, সারা দিন ধরে যে যা পেয়েছে, সেই তথ্য একে অন্যকে জানাতাম। নানা ধরনের সাংবাদিকের মিলনমেলা ছিল সেটা। সেখানে দেখা যেত পশ্চিমা বিশ্বে আলোড়ন তোলা স্যুট পরিহিত পঙ্কজ কেশ সাংবাদিককে, যিনি চলতেন সেক্রেটারি নিয়ে। দেখা যেত বাবরি চুল মাথায় জিনস-শার্ট পরা বছর বাইশের ফরাসি টেলিসাংবাদিককে। হোটেলের হলরুমে দেখা যেত মাথা কামানো সুস্বাস্থ্যের অধিকারী, খেলোয়াড়ি দেহের অধিকারী একদল মানুষকে, যারা নিজেদের পরিচয় দিত পশ্চিম ইউরোপ অথবা যুক্তরাষ্ট্রের বেসরকারি সাহায্য সংস্থার লোক বলে। তারা বলত, উন্নয়নশীল দেশগুলোকে সাহায্য করাই তাদের কাজ।

দিল্লিতে পরিচয় হওয়া এক অস্ট্রেলীয় সাংবাদিক একদিন ওই লোকগুলোর একজনকে দেখিয়ে বললেন, 'রেডক্রসের পরিচয়ে এসেছে এরা, কিন্তু আমি সাইগনে মার্কিন সেনাদের শিবিরে একে দেখেছি।' ঢাকা শত্রুমুক্ত হওয়ার দিন দশেক পর আমাদের পক্ষে কাজ করা সহজ হয়ে গেল। ঢাকা থেকে কয়েকটি

বাংলা ও ইংরেজি পত্রিকা প্রকাশিত হওয়া শুরু হলো। ছোট, চার পৃষ্ঠার সে পত্রিকা। সে চার পৃষ্ঠার মধ্যেই দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ খবরগুলো তারা ছাপা শুরু করল। বাংলাদেশের সাংবাদিকদের জন্য পত্রিকা প্রকাশ করা ছিল খুব বড় অর্জন। মনে রাখা দরকার, পাকিস্তান প্রশাসন কড়া নজরদারির মাধ্যমে গণমাধ্যমের অধিকার খর্ব করে রেখেছিল, সে সময় মূলত যারা কাজ করত, তারা ছিল প্রশাসনের কাছের লোক (স্বাধীনতার পর তারা গা-ঢাকা দিয়েছিল)। প্রগতিশীল পত্রিকাগুলোর কণ্ঠ রোধ করা হয়েছিল। ২৬ মার্চ রাতে পাকিস্তানিরা *ইত্তেফাক* ভবন পুড়িয়ে দিয়েছিল। *ইত্তেফাক* আওয়ামী লীগের পক্ষে প্রচারণা চালাত। সেদিন বেশ কয়েকজন সংবাদপত্রকর্মী অফিসে নিহত হয়েছিলেন। বামপন্থী পত্রিকা *সংবাদ*ও পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছিল। *ইত্তেফাক* এখনো প্রকাশিত হয়নি, তবে *সংবাদ*-এর প্রথম সংখ্যা জানুয়ারির শুরুতেই প্রকাশিত হওয়া শুরু হয়েছে। অর্ধ ভগ্ন অফিসের টিকে থাকা কয়েকটি ঘরেই কোনোভাবে কাজ করে তাঁরা পত্রিকাটি বের করছেন।

'গত বছরের মার্চ মাসে আমাদের পত্রিকার ৭০ শতাংশ কর্মীই গেরিলা বাহিনীতে নাম লিখিয়েছিল' বললেন সম্পাদক আহমদুল কবীর। 'দেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই তারা ফিরে এসে যে যার কাজে লেগে পড়েছে। অনেক সংকটের মধ্য দিয়ে আমাদের যেতে হচ্ছে। কিন্তু সাংবাদিক, সংবাদদাতা, প্রেসের শ্রমিকদের দুর্দমনীয় আকাঙ্ক্ষা না থাকলে পত্রিকা বের করা সম্ভব হতো না। আমরা পত্রিকার সার্কুলেশন বা প্রচার বাড়ানোর কথা ভাবছি। পত্রিকার পেশাদারি মান আরও উঁচুতে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করছি। সব সময়ই আমাদের অবস্থান প্রতিক্রিয়াশীলতার বিরুদ্ধে। আমরা সব সময়ই গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের পক্ষে।

প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ

ঢাকা, ১৬ জানুয়ারি

এ কথা বলার অপেক্ষা রাখে না, পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আসা সাংবাদিকেরা শেখ মুজিবুর রহমানের একটা সাক্ষাৎকার পাওয়ার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিলেন। কিন্তু রেসকোর্স ময়দানে বক্তৃতা করার পর সাংবাদিকেরা আর তাঁকে দেখেননি। ১১ ও ১২ জানুয়ারি শোনা গেল শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর দলীয় নেতাদের নিয়ে একের পর এক বৈঠক করে যাচ্ছেন। শেষ পর্যন্ত ১৩ জানুয়ারি জানা গেল, তিনি নতুন মন্ত্রিপরিষদ গঠন করে ফেলেছেন, এ দিনই সেই মন্ত্রিপরিষদের শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান। ১৯৭১ সালের এপ্রিল মাসে যখন আওয়ামী লীগের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা স্বাধীন বাংলাদেশের ঘোষণা দিয়ে সরকার গঠন করলেন, তখন দেশটা ছিল পাকিস্তান বাহিনীর দখলে আর দলীয় প্রধান শেখ

মুজিবুর রহমান ছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে। শেখ মুজিবুর রহমানের নাম দেশের রাষ্ট্রপতি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক তাজউদ্দীন আহমদ হন প্রধানমন্ত্রী। আওয়ামী লীগের সহসভাপতি সৈয়দ নজরুল ইসলাম হন দেশের উপ-রাষ্ট্রপতি, শেখ মুজিবুর রহমানের অবর্তমানে তিনি অস্থায়ী রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পালন করেন।

শেখ মুজিবুর রহমান দেশে ফিরে আসার পর পদগুলোর পুনর্বিন্যাস হয়। ক্ষমতাসীন দল সিদ্ধান্ত নিয়েছিল রাষ্ট্রপতিশাসিত সরকারের জায়গায় সংসদীয় গণতন্ত্র চালু করবে, আর তাতে ক্ষমতা থাকবে সরকারপ্রধানের হাতে, তাই প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ঘোষণা করা হলো শেখ মুজিবুর রহমানের নাম (তাঁর হাতে থাকল প্রতিরক্ষা ও স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়)। দেশের রাষ্ট্রপতি হলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য আবু সাঈদ চৌধুরী। শেখ মুজিবুর রহমানের ঘনিষ্ঠ সতীর্থ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ ও আবদুস সামাদ আজাদ পেলেন যথাক্রমে শিল্প ও বাণিজ্য, অর্থ আর পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়। শপথগ্রহণ অনুষ্ঠান হলো সাবেক গভর্নর হাউসে, এখন যা রাষ্ট্রপতি ভবন। ভবনটি যুদ্ধের সময় যথেষ্ট ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। দেয়ালে দেয়ালে বন্দুক আর মেশিনগানের আঘাতের চিহ্ন দৃশ্যমান। জানালার কাচ ভাঙা, ঘরের আসবাবও ক্ষতির হাত থেকে রেহাই পায়নি। মাস খানেক শূন্য থাকার পর আবার এই ভবনে মানুষের আনাগোনা। ভবনের একটি বিশাল হলে এসে জড়ো হয়েছিলেন জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের বড় নেতারা, কূটনীতিকেরা আর অনেক সাংবাদিক। মধ্যযুগের আদলে প্রধান বিচারপতির পোশাক, তিনি মাথায় পরেছেন পরচুলা। প্রধানমন্ত্রীকে তিনি শপথ পাঠ করালেন।

১৪ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী একটি সংবাদ সম্মেলন ডেকে নতুন রাষ্ট্রের মূলনীতিগুলো ঘোষণা করেছেন। এর পরদিন তিনি বাছাই করা পত্রিকা, রেডিও ও টেলিভিশনের কয়েকজন সাংবাদিককে তাঁর সাক্ষাৎকার নেওয়ার অনুমতি দিয়েছেন। দ্বিতল পাথরের ভবন, আছে টেনিস কোর্ট, গোলাপ বাগান। সামনে পতপত করে উড়ছে জাতীয় পতাকা। এটি প্রধানমন্ত্রীর সরকারি বাসস্থান। আগে এটি ছিল প্রেসিডেন্ট ভবন। এখানেই ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমানের বৈঠকগুলো হয়েছিল। আকস্মিকভাবেই সে আলোচনা ভেস্তে গিয়েছিল। অভ্যর্থনা কক্ষ লোকে লোকারণ্য। প্রধানমন্ত্রীর কক্ষের সামনে তাঁর প্রেসসচিব আমাদের অভ্যর্থনা জানালেন। 'অনুরোধ করছি, দয়া করে ১৫ মিনিটের বেশি সময় নেবেন না' প্রধানমন্ত্রীর কক্ষের দরজা খুলে দিয়ে আমাদের কানে কানে ফিসফিস করে তিনি বললেন। বিশাল ঘরের এক কোণের বিশাল টেবিলের ওপার থেকে আমাদের অভ্যর্থনা জানাতে উঠে দাঁড়ালেন সেই দীর্ঘাঙ্গী, বছর পঞ্চাশের চশমা পরা মানুষটি,

যাকে বহু ছবিতে দেখেছি। কাঁচাপাকা চুল, কাঁচাপাকা গোঁফ, ক্ষুরধার অবয়ব।

মুজিবুর রহমানকে দেখলেই মনে হয়, রাজনীতিবিদ হয়েই বুঝি তিনি জন্মেছেন: চলাচলের মধ্যে রয়েছে দৃঢ়তা, কণ্ঠস্বর ঋজু, দৃষ্টি গভীর। মুজিবুর রহমান সব সময় একধরনের পোশাক পরেন। জাতীয় পোশাক। সাদা প্যান্ট আর কলারবিহীন সাদা শার্ট (পায়জামা, পাঞ্জাবি—অনুবাদক)। এর ওপরে পরেন কালো হাতাবিহীন কোট, যা এরই মধ্যে 'মুজিব কোট' নামে পরিচিতি পেয়েছে। তিনি অ্যালকোহলযুক্ত পানীয় পান করেন না, সরকারি পার্টিতেও তা নিষিদ্ধ করা হয়েছে। তবে তিনি ধূমপায়ী, মুহূর্তের জন্যও ধূমপানের পাইপকে হাতছাড়া করেন না।

আমরা ছোট একটি টেবিলের চারপাশে বসলাম। মুজিবুর রহমানই কথা বলতে শুরু করলেন। 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে দাঁড়ানোর জন্য সবার আগে আমি সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি, দেশটির নেতাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাই। জাতির কঠিন দিনগুলোয় সোভিয়েত ইউনিয়নের এই সহযোগিতার কথা বাংলাদেশের জনগণ কখনোই ভুলে যাবে না। যৌবনে আমি আপনাদের দেশের ইতিহাস নিয়ে অনেক বই পড়েছি। রুশ বিপ্লবীদের কথা পড়েছি, যাদের জার নির্বাসনে পাঠিয়ে দিত সাইবেরিয়ায়। পাকিস্তানের কারাগারে থাকাকালীন আমি বারবার তাদের কথা ভেবেছি এবং বিশ্বাস করেছি রাশিয়া যেভাবে মুক্ত হয়েছে, সেভাবেই আমাদের দেশে স্বাধীনতা আসতে আর দেরি নেই।'

২৬ মার্চের পর থেকেই পূর্ব বাংলার নেতার ভাগ্যে কী ঘটেছে, তা নিয়ে সারা পৃথিবীর গণমাধ্যমে একে অন্যের সঙ্গে অসামঞ্জস্যপূর্ণ নানা ধরনের খবর বেরিয়েছে। আমরা শেখ মুজিবুর রহমানের কাছে সে দিনগুলোর ব্যাপারে জানতে চাইলাম। 'সামরিক স্বৈরাচার কী করতে পারে, সে ব্যাপারে আমাদের একটা ধারণা ছিল।' শেখ মুজিবুর রহমান স্মৃতিচারণা করেন, 'আমার নির্দেশে আওয়ামী লীগের নেতারা আত্মগোপন করে। আমি বাড়িতেই থাকলাম। আমার বাড়িটা দিনরাত ২৪ ঘণ্টাই ছিল পাকিস্তানি গোয়েন্দাদের নজরে। আমাদের কাছে খবর ছিল, শত্রুরা আমার জীবনের ওপর হামলা চালাবে এবং দোষটা চাপিয়ে দেবে চরমপন্থী বামদের ওপর। নৃশংস হামলা চালানোর জন্য এই ঘটনাকে ব্যবহার করবে সামরিক জান্তা। রাতে আমার বাড়িতে ট্রাকে করে এল কমান্ডোরা। গুলি করতে করতে তারা আমার বাড়ির ভেতর ঢুকল। আমি বেরিয়ে এসে বললাম, 'আমাকে যদি নিতে এসে থাক, তাহলে আমাকে গ্রেপ্তার করো কিন্তু তার আগে গোলাগুলি বন্ধ করো।'

মুজিবুর রহমানকে ১ এপ্রিল পর্যন্ত রাখা হয়েছিল ঢাকা সেনানিবাসে, এরপর গোপনে তাঁকে পাঠিয়ে দেওয়া হয় পশ্চিম পাঞ্জাবের মরুভূমিতে তৈরি জেলখানায়। বাইরের পৃথিবীর কিছুই তাঁকে জানতে দেওয়া হতো না, এমনকি পত্রিকা পড়া বা

চিঠি পাওয়ার অধিকারও কেড়ে নেওয়া হয়েছিল। ইয়াহিয়া খান যখন পদত্যাগ করতে বাধ্য হলেন এবং ভুট্টো হলেন প্রেসিডেন্ট, তখন ভুট্টো বাঙালির নেতার কাছে গিয়েছিলেন এবং তাঁকে বোঝাতে চেষ্টা করেছেন কেন অখণ্ড পাকিস্তান ধরে রাখা দরকার। কিন্তু শেখ মুজিবুর রহমান দৃঢ়কণ্ঠে বলেছেন, তিনি শুধু দেশে ফিরে যাওয়ার পর এবং দলের নেতাদের সঙ্গে কথা বলেই এ ব্যাপারে কোনো সিদ্ধান্ত নেবেন। দেশে ফিরে শেখ মুজিবুর রহমান বুঝলেন যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান আর জোড়া লাগার নয়: স্বাধীনতাযুদ্ধে অসংখ্য দেশপ্রেমী বাঙালি প্রাণ দিয়েছে। নবীন দেশটির মূলনীতি কী হবে, তা জানতে চাইলাম আমরা শেখের কাছে। 'আন্তর্জাতিকভাবে আমরা জোটনিরপেক্ষ থাকব, শান্তিপূর্ণ সহাবস্থান ও বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক থাকবে সব দেশের সঙ্গে। অভ্যন্তরীণ লক্ষ্য: দেশ বিকশিত হবে সমাজতান্ত্রিক পথ ধরে। তবে এটা সত্য যে আমাদের সব সমস্যা আমরা খুব দ্রুত সমাধান করে উঠতে পারব না। তাই রাষ্ট্রায়ত্ত কারখানা, ব্যাংক, বিমা কোম্পানির পাশাপাশি বেসরকারি খাতও কাজ করবে। একচেটিয়া মনোভাবকে আমরা প্রশ্রয় দেব না। 'আমার মনে হয়, সরকারি, বেসরকারি সবখানেই শ্রমিকদের প্রতিনিধিরাই কারখানার নেতৃত্ব দেবে।' বললেন শেখ মুজিবুর রহমান। 'কৃষি খাতের দিকে আমাদের সরকার গভীর মনোযোগ দিচ্ছে। অনেক কৃষকই ভূমিহীন। আমরা কৃষকদের মধ্যে খাসজমি বণ্টন করার কথা ভাবছি। ধীরে ধীরে গ্রামে যৌথ খামার বা সমবায়ভিত্তিক অর্থনীতি প্রতিষ্ঠা করব, তাদের ঋণ দেব। প্রতিবছর বন্যার সময় কৃষকেরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়। আমরা উন্নতমানের সেচব্যবস্থার জন্ম দেব। ক্ষতি সামলে নিতে পারলে জমিতে ফসল হবে এবং তা দেশের চাহিদা পূরণ করবে। এই লক্ষ্যে এগিয়ে যাওয়ার জন্য আমরা দেশের জনগণ ও অন্যান্য প্রগতিশীল রাজনৈতিক দলের সহযোগিতা নেব।'

কে পাঠাল খুনিদের?

ঢাকা, ১৮ জানুয়ারি-২২ মার্চ

ছাইরঙা পাথরের দেয়ালের পাশাপাশি দেড় মানুষ উঁচু তারকাঁটার বেড়া। দরজার ওপর ঝুলছে 'শারীরিক শিক্ষা ইনস্টিটিউট'। মাঠের পেছনে দেখা যাচ্ছে কয়েকটি দ্বিতল ও তিনতলা ভবন। এগুলো হলো ক্লাসঘর ও হোস্টেল। ছাদে বালুর বস্তা দিয়ে আগ্নেয়াস্ত্র রাখার ব্যবস্থা। মাঠে বাস্কেটবল খেলার জায়গাটিতে ক্ষতচিহ্ন। 'আপনারা কারা?' আমরা সোভিয়েত সাংবাদিক এ কথা শুনে এই অপরিচিত মানুষটি বাড়িয়ে দেন হাত। 'আপনারা আমাদের বন্ধু। আপনাদের জন্য আমাদের দরজা সব সময় খোলা' বললেন তিনি। এই ভদ্রলোকের নাম খান মজলিশ। তিনি এই ইনস্টিটিউটের পরিচালক। এই ইনস্টিটিউটটি একাত্তর সালের ঢাকার সবচেয়ে

নৃশংস কার্যাবলির সাক্ষ্য বহন করছে। এখানে উগ্র ডানপন্থী ধর্মান্ধ সংগঠন 'আলবদর'-এর অফিস ছিল। 'সেপ্টেম্বর মাসের শুরুতে আলবদর বাহিনী এই ইনস্টিটিউট দখল করে নেয়। ওদের সহজেই চেনা যেত। ওরা একধরনের খাকি পোশাক পরত, সবার মুখে ছিল দাড়ি, তারা মনে করত এটা সাচ্চা মুসলমান হওয়ার নিশানা। তাদের হাতে সব সময়ই থাকত চীনের তৈরি আগ্নেয়াস্ত্র। তারা এখানকার ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের বের করে দিয়েছিল। আমাকেও বের করে দিয়েছিল। আমি এই ইনস্টিটিউটের খুব কাছেই একটি বাড়ি ভাড়া করেছিলাম। আর তাই এই ইনস্টিটিউটের ভেতরে সে সময় কী ঘটেছিল, তা দেখতে পেয়েছি। আমি ছিলাম ওই নৃশংসতার প্রত্যক্ষদর্শী।'

পরিচালক আমাদের নিয়ে গেলেন জিমন্যাস্টিক হলে। ছিমছাম গোছানো বাস্কেট বলের কোর্ট দেখে কে বলবে কিছুদিন আগেই এখানেই ছিল নির্যাতন কক্ষ? কিন্তু সেটাই সত্য। গত কয়েক মাস এটা ছিল নির্যাতন শিবির। প্রতিদিন বাঙালিদের গ্রেপ্তার করে এখানে নিয়ে আসা হতো। 'মূলত রাতের আঁধারে নির্যাতন করা হতো।' খান মজলিশ বলে যান, 'আমরা চিৎকার আর কান্নার আওয়াজ শুনতে পেতাম। গুলির আওয়াজও শুনতে পাওয়া যেত। ঢাকা শত্রুমুক্ত হওয়ার পর আমরা যখন প্রথম এখানে এলাম, তখন পুরো মেঝেতে বয়ে যাচ্ছিল রক্তস্রোত।' জেরা করা হতো ছেলেদের হোস্টেলে, ফুটবল মাঠের বিপরীত দিকে যার অবস্থান। কয়েকজন শ্রমিক ছোট একটি গর্ত খুঁড়ছিল, হঠাৎ শক্ত কী যেন লাগল তাদের কোদালে। মানুষের মাথার খুলি। খুব বেশি অবাক হলো না শ্রমিকেরা। তারা সবুজ ঘাসের ওপর এনে রাখল নরমুণ্ডুটি। এ রকম 'আবিষ্কার' নতুন নয়। সাধারণত আলবদরেরা মানুষকে রায়েরবাজারের ইটখোলায় নিয়ে হত্যা করত। ইনস্টিটিউট থেকে তারা খুব বেশি দূরে অবস্থিত নয়। যারা নির্যাতনের সময় মরে যেত, তাদের এখানেই গর্ত করে পুঁতে ফেলত।

ধরে আনার আগে আলবদরেরা নির্দিষ্ট ব্যক্তির ঠিকানায় চিঠি পাঠাত। মিউনিসিপ্যাল করপোরেশনের কর্মকর্তা তাজুল ইসলামের কাছে লেখা তেমন একটি চিঠি: 'আমাদের লোকেরা তোমার দিকে নজর রেখেছে। তারা জেনেছে, তুমি এখনো তোমার কুকর্ম থেকে সরে আসোনি, ভারতীয় আর তথাকথিত বাংলাদেশ রেডিও শুনে গুজব ছড়াচ্ছ, সরকারবিরোধী কাজ করেই চলেছ। তোমাকে সতর্ক করে দিচ্ছি, এখনই এসব বন্ধ করো। আমাদের নির্দেশ যদি অগ্রাহ্য করো, তোমার জীবন আর তোমার সম্পদ ঝুঁকিতে পড়ে যাবে। মনে রেখো, প্রথমবারের মতো সতর্ক করে দেওয়া হলো, এই সতর্কতার সময়সীমা ১৬ দিন। তোমার ভাগ্য নির্ভর করছে তোমার কাজের ওপর। তোমার দিকে সব সময়ের জন্য আমাদের লোক নজর রাখছে।'

একই ধরনের সতর্কবার্তা পেয়েছিলেন ঢাকা শহরের কয়েক শ শিক্ষক, বিজ্ঞানী, সাহিত্যিক, চিকিৎসক ও সাংবাদিক। তাঁদের বেশির ভাগই আজ আর বেঁচে নেই। বাংলাদেশ এই নারকীয় হত্যাযজ্ঞের বিচার চায়। আলবদর বলতে আসলে কী বোঝায়, তা এই তো সেদিন পর্যন্ত কারও জানা ছিল না। ধর্মান্ধ প্রতিক্রিয়াশীল জামায়াতে ইসলামী এই যোদ্ধা দলটির মূলে। আলবদরের সদস্যরা (বেশির ভাগের বয়সই ১৮ থেকে ২৫) বিশ্বাস করত, বাংলাদেশের জাতীয় আন্দোলনকারী ও ভারতীয় দালালদের কারণে ধর্ম বিপদে পড়েছে। বোঝা যায়, জামায়াতে ইসলামী পিকিংয়ের নেতাদের সমর্থন পেয়েছে। গোপন বৈঠকে তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছে, এই দেশের সব শহরের নামই পাকিস্তান ও চীনের সেনা কর্মকর্তাদের নামে নামকরণ করা হবে। সেই সিদ্ধান্তের আরও যে বিষয়গুলো আছে, সেগুলো হলো, সোভিয়েত ইউনিয়ন ও শত্রুভাবাপন্ন দেশগুলোর সঙ্গে সম্পর্কচ্ছেদ করতে হবে, হিন্দু সম্প্রদায়ের সব সম্পদ বাজেয়াপ্ত করতে হবে, পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু করতে হবে, বাংলা সব নাম পরিবর্তন করতে হবে, বাংলাদেশের বুদ্ধিজীবীদের ও সরকারি কর্মকর্তাদের ওপর সার্বক্ষণিক নজরদারি করতে হবে। যদি এদের কেউ বাংলাদেশের প্রতি সহানুভূতিশীল হয় তবে তাদের বিচার করে হত্যা করতে হবে।

এখন রাষ্ট্রীয় গোয়েন্দারা দেশের নাগরিকদের হত্যার জন্য যারা দায়ী, তাদের ব্যাপারে তথ্য সংগ্রহ করছে। যারা এই গণহত্যার তথ্য সংগ্রহ করছে, তাদের মধ্যে সংস্কৃতি জগতের সাতজন বিশিষ্ট ব্যক্তি রয়েছেন। এই কমিটির প্রেসিডেন্ট চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান আমাদের বললেন, 'আলবদরের কুকর্ম সম্পর্কে জানতে পারার পর আমরা এ ধরনের অপরাধ ঘটানোর কারণগুলো অনুসন্ধান করছি। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ঢাকার চারপাশে বধ্যভূমিতে মানুষ যখন তাদের বাবা ও ভাইয়ের লাশ খুঁজছিল, তখন আমাদের মনে হয়েছিল যুদ্ধে পাকিস্তান বাহিনীর পরাজয় নিশ্চিত জেনে কিছু করতে না পারা থেকে উদ্ভূত ক্রোধের বশবর্তী হয়ে ধর্মান্ধ গোষ্ঠী এই হত্যাকাণ্ড ঘটিয়েছে। পরে আমরা বুঝেছি, বিষয়টি সে রকম ছিল না। হত্যার শিকার হয়েছিলেন সেই বুদ্ধিজীবীরা, যাঁরা সাম্রাজ্যবাদবিরোধী মনোভাব পোষণ করতেন।'

বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি জগতের কয়েকজনের কথা বলি, পাকিস্তানিদের আত্মসমর্পণের আগে যাঁরা আলবদরদের হাতে হত্যার শিকার হয়েছেন: সিরাজুদ্দীন হোসেন, প্রগতিশীল পত্রিকা *ইত্তেফাক*-এর সম্পাদক, আমেরিকার আগ্রাসী রাজনীতি ও পাকিস্তানের কোনো যুদ্ধজোটে যোগদানের বিরুদ্ধে যিনি ছিলেন সোচ্চার, সাহিত্যিক শহীদুল্লা কায়সার, পূর্ব পাকিস্তানের আফ্রো-এশিয়ান সলিডারিটির সভাপতি, পাকিস্তান-সোভিয়েত মৈত্রী সমিতিরও একজন নেতা,

চিকিৎসক আলীম চৌধুরী, চিকিৎসকদের সমিতির সভাপতি তিনি, মার্কিন-পাকিস্তানি প্যাক্টের বিরুদ্ধে সোচ্চার, তিনি ছাত্রাবস্থায় বামপন্থী ছাত্রসংগঠন ছাত্র ইউনিয়নের সদস্য ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের ডিন মুনীর চৌধুরী, যিনি বরাবর প্রগতিশীল আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন, আর এ জন্য বারবার জেল খেটেছেন।

'মৌলবাদী আলবদরের চোখে সব সাহিত্যিক, অধ্যাপকেরা একই ধরনের মানুষ।' বলে যেতে থাকেন জহির রায়হান, 'তারপরও তারা জেনে-বুঝে সেই সব বুদ্ধিজীবীকে হত্যা করেছে, যাঁদের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা আছে। এর মানে দাঁড়াচ্ছে স্বেচ্ছাসেবী এই আলবদরের সদস্যরাও এই হত্যাকাণ্ডের সময় ওপরের কারও নির্দেশ মেনে চলেছে।' কারা এই হত্যাকারীদের পেছনে ছিল? ১৭ ডিসেম্বর থেকেই আলবদর বাহিনীর বিষয়ে নানা তথ্য প্রকাশিত হতে শুরু করে। আলবদর নেতাদের লেখা নির্দেশনা, পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর উঁচু স্তরের কর্মকর্তাদের নির্দেশনারও দেখা মেলে। পাকিস্তানি সেনা অফিসারেরাই এই জল্লাদদের প্রশিক্ষণ দিত। ওদের প্রশিক্ষণের রুটিন উদ্ধার করা হয়েছে। দেখা যাচ্ছে, প্রশিক্ষণ শিবিরে লেকচার দিত যারা, তাদের সবাই পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সদস্য, এদের মধ্যে ব্রিগেডিয়ার বশীর, ক্যাপ্টেন কাইয়ুম প্রমুখের নাম বেশি দেখা যায়।

ঢাকা শহরে এখনো আতঙ্কের সঙ্গে উচ্চারণ করা হয় আশরাফ আলী খানের নাম। এই লোকটির নেতৃত্বেই গড়ে ওঠে বিশেষ বাহিনী, যাদের কাজই ছিল বাঙালিদের কতল করা। তার গাড়ির চালকের ভাষ্য অনুযায়ী, আশরাফ আলী খান ১৪ ডিসেম্বর সকালে ঢাকার প্রান্তিক এলাকার একটি কবরস্থানের পাশে সাতজন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষককে নিজ হাতে গুলি করে হত্যা করেছে। মুক্তিযোদ্ধারা তার বাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে আশরাফ আলীকে লেখা গভর্নরের উপদেষ্টা রাও ফরমান আলী স্বাক্ষরিত চিঠি উদ্ধার করেছে। সে চিঠিতে লেখা ছিল, আলবদর বাহিনীর এই মুখ্য জল্লাদ বাংলা নামের প্রদেশের সব জায়গায় মুক্তভাবে যেতে পারবে, স্থানীয় সরকারকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, তাকে যেন সর্বাত্মক সহযোগিতা করা হয়।

গেরিলা যুদ্ধ শুরু হয়ে যাওয়ার পর থেকেই পাকিস্তানি সেনা কর্মকর্তারা স্থানীয় পুলিশ বাহিনীর ওপর আর আস্থা রাখতে পারছিল না। তারা পুলিশকে এড়িয়ে মূলত সখ্য গড়ে তুলেছিল এই 'স্বেচ্ছাসেবী' বাহিনীর সঙ্গে, যা রাও ফরমান আলীর ডায়েরি থেকে জানা যায়, পুলিশকে সরিয়ে নিয়ে আসা দরকার (যেসব জায়গায় তুমুল গেরিলা যুদ্ধ চলছিল, সে সব জায়গার কথা বলা হচ্ছে—লেখক)। সেখানে আলবদরদের দায়িত্ব দেওয়া হোক। দেওয়া হোক আধুনিক অস্ত্রের জোগান। ২ ডিসেম্বর জল্লাদ বাহিনীর কাঠামোতে পরিবর্তন আনা হলো। বিশেষ কয়েকটি গ্রুপ তৈরি করা হলো, এক দল গ্রেপ্তার করবে, এক দল নির্যাতন করবে আর এক দল

নির্যাতন শেষে হত্যা করবে। এসব কাগজপত্র দেখে সহজেই অনুমান করা যায়, পূর্ব বাংলার পত্রিকায় প্রকাশিত বা রেডিওতে প্রচারিত খবরের বিষয়ে সরকারের মনোভাব কী ছিল। সাংবাদিক নিজামুদ্দীন আহমদের নামের পাশে রাও ফরমান আলী লিখে রেখেছেন, 'বস্তুনিষ্ঠ খবর পরিবেশন করেন না'। এর পরপরই নিজামুদ্দীন আহমদ উধাও হয়ে গেলেন। সম্প্রতি জানা গেল, তাঁকে হত্যা করা হয়েছে। বিচার বা আইনের ধারেকাছেও যাওয়ার প্রয়োজন ছিল না, রাও ফরমান আলীর ডায়েরির পাতাই ছিল একজন মানুষকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করার জন্য যথেষ্ট।

ঘটনাটির শিকড় আরও গভীরে। তথ্য ঘেঁটে আর প্রত্যক্ষদর্শীদের বয়ান থেকে জানা যায়, যারা আলবদরের মতো বাহিনীর জন্ম দিয়েছে এবং যে বাহিনী অন্ধ মৌলবাদে দীক্ষিত হয়ে ছড়িয়ে পড়েছে দেশের সূর্যসন্তানদের হত্যা করার জন্য, তারা সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোরও মদদ পায়। এই জেনারেলের ডায়েরি থেকেই জানা যায় দুই মার্কিন নাগরিকের নাম, যারা ১৯৭১ সালে ঢাকা সফর করেছিল। হেইট ও ডভেসপিক, এই দুটি নামের পাশে লেখা ছিল যুক্তরাষ্ট্র। আর লেখা ছিল ডিজিআইএসই, যার মানে দাঁড়ায় অভ্যন্তরীণ গোয়েন্দা বাহিনীর মহাপরিচালক। হেইটের নামের সঙ্গে আরও লেখা আছে, 'রাজনীতি বিষয়ে ৬০, ৬২ ও ৭০'। আরেকটি দলিলে দেখা গেল, রাও ফরমান আলীর সহযোগিতায় এই দুই মার্কিন পাকিস্তান এয়ারলাইনসের ঢাকা-ব্যাংকক ফ্লাইটের প্লেনের টিকিট পেয়েছিল।

এই হেইট ও ডভেসপিক কে? এ ব্যাপারে বাংলা পত্রিকা *দৈনিক বাংলা* বলছে, 'হেইটের জন্ম ১৯২৮ সালে। ১৯৪৬-১৯৪৯ সালে তিনি ছিলেন মার্কিন সেনাবাহিনীতে। ১৯৫৩ সাল থেকে কাজ করছেন গোয়েন্দা বাহিনীতে। ১৯৫৪ সাল থেকে মার্কিন মিশনগুলোয় রাজনৈতিক অ্যাটাশে হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এই দায়িত্ব পালন করতে তিনি কলকাতা, কায়রোতে ছিলেন। ঢাকায় ছিলেন ১৯৬০-১৯৬২ ও ১৯৭০ সালে। এক বছর পর সিআইএর এজেন্ট ডভেসপিকের সঙ্গে ঢাকায় আসেন এবং রাও ফরমান আলীর সঙ্গে বসে বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের একটা কালো তালিকা তৈরি করেন। সে তালিকায় তিন হাজার নাম ছিল। এই তালিকা জেনারেলের শোবার ঘর থেকে উদ্ধার করা হয়েছে।

বোঝাই যায়, সিআইএর সঙ্গে পাকিস্তান সরকারের যোগাযোগ ছিল গোপনে, সাধারণ আলবদর বাহিনীর সদস্যরা এতটা গভীর থেকে বিষয়টি জানত না। তা সত্ত্বেও এই জল্লাদ বাহিনীর পালের গোদারা এবং জামায়াতে ইসলামী দলের নেতারা দলের সাধারণ কর্মীদের মনে উৎসাহ-উদ্দীপনা জাগিয়ে তোলার জন্য পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্তরাষ্ট্র ও চীনের প্রগাঢ় রাজনৈতিক সম্পর্কের কথা বলত। ১২ ডিসেম্বর জামায়াতে ইসলামীর ঢাকার সেক্রেটারি (সম্ভবত আমির বোঝানো হচ্ছে—অনুবাদক) প্রজ্ঞাপন জারি করেন। তাতে লেখা ছিল, 'দেশের বাইরেও

আমাদের বন্ধু আছে...আমেরিকা ও চীন আমাদের সমর্থন করছে।' এখন সমুদ্রের ওপারের গোয়েন্দা বাহিনী বাংলাদেশের দেশপ্রেমিক নাগরিকদের হত্যার দায়ভার গ্রহণ না করে কী করে এ থেকে নিজেদের সন্দেহমুক্ত রাখা যায়, সে কসরত করে চলেছে। কিন্তু যে তথ্য প্রকাশিত হচ্ছে, তাতে বোঝা যাচ্ছে এই হত্যাযজ্ঞে সাম্রাজ্যবাদীদের অংশগ্রহণের খবর আরও বের হবে।

.....

শেষবার আমরা ডায়েরি লেখার পর দুই মাস কেটে গেছে। আমরা আবার ঢাকায় ফিরে এসেছি। এখানে আবার বেশ কয়েকটি রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটে গেছে। সমুদ্রের ওপারের বিদেশি মদদে দেশের উগ্র ডানপন্থীরা দেশপ্রেমিকদের ভয় দেখানোর জন্য ঘটিয়ে চলেছে এই হত্যাকাণ্ড। জহির রায়হানও এই হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন। বোঝাই যাচ্ছে, এই চলচ্চিত্র পরিচালক যে কমিটির প্রধান ছিলেন, সেই কমিটি এই জল্লাদদের নিয়ে যে শঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন, তার ভিত্তি ছিল, তারা প্রতিশোধের ভয়ে এখনো হত্যাযজ্ঞ চালিয়ে যাচ্ছে। জহির রায়হানের জন্য ফাঁদ পাতা হয়েছিল: তাঁকে ফোন করা হয়েছিল এবং এক জায়গায় সাক্ষাৎ করতে বলা হয়েছিল। খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু তথ্য তাঁকে দেওয়া হবে, সে কথা বলে জহির রায়হানকে সেখানে নিয়ে আসা হয়েছিল। বিষয়টি নিয়ে কিছুটা সন্দেহ থাকায় জহির রায়হান গাড়িতে দুজন সৈনিককেও নিয়ে গিয়েছিলেন। এরপর কী ঘটেছে, তা আর জানা যায় না। জহির রায়হান ও তাঁর দুই সঙ্গীকে আর খুঁজে পাওয়া যায়নি, তাঁদের গাড়িটি ঢাকার এক প্রান্ত থেকে উদ্ধার করা হয়েছে। পুলিশ সন্দেহ করছে, তাঁরা ফাঁদে পড়েছেন এবং হত্যার শিকার হয়েছেন। প্রতিক্রিয়াশীলদের এই নতুন হত্যাযজ্ঞ দারুণ ক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। সাপ্তাহিক *এক্সপ্রেস* তাদের বিশেষ সংখ্যা উৎসর্গ করেছে জহির রায়হানকে। তারা বলেছে, 'বাংলাদেশের গণমন্ত্রমনা বুদ্ধিজীবীদের হত্যা করার সাম্রাজ্যবাদী চক্রান্ত এখনো চলছে।' ম্যাগাজিনটি সরকারের কাছে সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টদের নিশ্চিহ্ন করার দাবি জানিয়েছে। বাংলাদেশ চলচ্চিত্র ইনস্টিটিউটে জহির রায়হানের নাম যুক্ত করা হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতাসংগ্রাম নিয়ে নির্মাণ করা তাঁর চলচ্চিত্রগুলো দেশের সিনেমা হলগুলোয় চলছে।

কবিতার সোনার তরী

ঢাকা, কুষ্টিয়া, ২৪ মার্চ

পাথুরে পথটা একটি ছোট চত্বরের দিকে এগিয়ে গেছে, শীর্ণদেহী, শুভ্রকেশী নারী, খুব ধীরে সিঁড়ি ভেঙে উঠলেন সেই চত্বরে। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে মাথা নুইয়ে শ্রদ্ধা জানালেন, তারপর আমাদের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'বাংলাকে পাকিস্তানের

রাষ্ট্রভাষা করতে যে আন্দোলন হয়, তাতে অংশ নিতে গিয়ে যাঁরা প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের স্মরণ করে এখানে ছিল শহীদ মিনার। গত বছর ২৬ মার্চ বর্বর হামলার মাধ্যমে তা গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়েছে। সেনাশাসনামলে ধর্মীয় মৌলবাদীরা এই মিনারকে ভয় পেত। আমাদের কবিরা জাতীয় ঐতিহ্য নিয়ে কবিতা লিখলেও তা রাষ্ট্রদ্রোহী কবিতা হিসেবে বিবেচনা করা হতো।' 'সুখের বিষয়, শঙ্কাগুলো এখন অতীত। যুবকেরা, শিক্ষার্থীরা এখন এখানে আসে তাজা ফুল নিয়ে। ধ্বংস হয়ে যাওয়া মিনারের জায়গায় খুব দ্রুত উঠবে নতুন মিনার : বাংলাদেশ সরকার নকশা জমা দিতে বলেছে, সেরা নকশা অনুসারে গড়ে উঠবে এই মিনার।'

আমাদের সঙ্গে যে নারী কথা বলছিলেন, তিনি শিক্ষিত মানুষের কাছে খুবই পরিচিত একটি নাম। তিনি কবি সুফিয়া কামাল। আমরা কথা বলছিলাম, নতুন প্রজাতন্ত্রের শিল্প ও সাহিত্য নিয়ে। 'কীভাবে দেশটি গড়ে তোলা যায়, সেটাই প্রতিটি লেখককে ভাবতে হবে এখন। সেনা স্বৈরশাসকেরা চেষ্টা করেছিল কীভাবে ভারত, ভারতের সংস্কৃতির প্রতি মানুষের মনে ঘৃণার সঞ্চার করা যায়। আমরা আমাদের জনগণকে বলতে চাই, আমাদের কাছে মুসলিম কবি নজরুল ইসলাম ও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। তাঁরা দুজন দুই ভিন্ন ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁরা বাংলা সাহিত্যের ধ্রুপদি দুই জ্যোতিষ্ক।' বিদায়বেলায় কবি আমাদের শিলাইদহ যাওয়ার আমন্ত্রণ জানালেন, এই গ্রামে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বাড়িটিকে জাদুঘর করা হয়েছে। কুষ্টিয়ায় যাওয়ার পর সে সুযোগ আমাদের করে দিয়েছিল জেলা প্রশাসন। পশ্চিমের এই কেন্দ্র থেকে শিলাইদহের দূরত্ব ১০ কিলোমিটারের চেয়েও কম। কিন্তু সেখানে পৌঁছাতে লেগে গেল কয়েক ঘণ্টা : কখনো নৌকায়, কখনো দুই ধারে ছড়িয়ে থাকা ধানখেতের মধ্য দিয়ে মেঠোপথে হেঁটে। শেষে কয়েকটি আম্রকানন পার হওয়ার পর আমাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে ত্রিতল প্রাসাদ, রবীন্দ্রনাথের পৈতৃক সম্পত্তি। এখানে বসেই মহান এই কবি বাংলার কৃষকদের সম্পর্কে সবচেয়ে বেশি জানতে পেরেছিলেন। এই জানাশোনা তাঁর পরবর্তী জীবনের লেখনীতে ফেলেছে প্রগাঢ় ছাপ। শিলাইদহতেই তিনি গ্রামবিষয়ক মূল গল্পগুলো লিখেছিলেন। আর এখানেই লেখা হয়েছিল কবিতার বই *সোনার তরী*।

জাদুঘর কর্তৃপক্ষ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিচিহ্ন রক্ষা করতে পেরেছে। প্রথমতলায় পাঠাগার, এই পাঠাগার ব্যবহার করতেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। গাইড আমাদের ওপরতলায় নিয়ে গেলেন। কবি এখানে বসে লিখতেন। বসতেন চেয়ার-টেবিলে, খোলা থাকত সামনের জানালা। খোলা জানালা দিয়ে তিনি দেখতেন পদ্মা নদী।

অনুবাদ : **জাহীদ রেজা নূর**

নারী ও সমাজ

লীলা নাগ ও তাঁর জীবনসাধনা*

মালেকা বেগম

সারসংক্ষেপ

আমাদের সমাজের ইতিহাস লেখার দৃষ্টিভঙ্গি মূলত পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষদেরকেই আমরা ইতিহাসের নায়ক বা খলনায়ক হিসেবে দেখে অভ্যস্ত। কিন্তু ইতিহাসের নানান বাঁকে নারীরাও রেখেছিলেন গৌরবোজ্জ্বল অবদান। এমনই এক মহীয়সী নারীর নাম লীলাবতী নাগ। আসামের গোয়ালপাড়া শহরে ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর জন্মগ্রহণ করা লীলাবতী নাগ ছিলেন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের এক অগ্রবর্তী সৈনিক। তবে তিনি শুধু রাজনীতিতেই তাঁর কর্মকাণ্ডকে সীমাবদ্ধ রাখেননি। নারীশিক্ষা এবং নারীদের রাজনীতিসচেতন করে তুলতে তাঁর অবদান প্রাতঃস্মরণীয়। বিদ্যালয়ে পড়ার সময় থেকেই ছিলেন দক্ষ সংগঠক। প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'দীপালী সংঘ' নামে নারী সমিতি। ১৯২৮ সালে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন 'নারীশিক্ষা মন্দির' নামে বিদ্যালয়। ১৯৩১ সালে প্রকাশ করেন *জয়শ্রী* নামক নারীদের পত্রিকা। এই পত্রিকার বিস্তার ঘটল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রসার ঘটানোর প্রয়াসে। তাঁর সাধনা ছিল নতুন সমাজ, নতুন জীবন, নতুন মানুষ গড়ে তোলার। রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, ব্রিটিশদের শাসনমুক্ত হওয়ার স্বাধীনতার স্বপ্ন যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, তখন ১৯৪৭ সালে তিনি ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন শান্তি কমিটি। দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর নিরাপত্তা-সংকটের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের জনস্রোত সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে বাস্তুত্যাগী হতে শুরু করলে, তিনি পশ্চিমবঙ্গে তাদের জন্য আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পুনর্বাসনের কাজে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। এই প্রবন্ধে লীলা নাগের কর্মময় জীবনের মূল বিষয়গুলো আলোচিত হয়েছে। একই সাথে উঠে এসেছে ওই সময়কার সমাজবাস্তবতায় একজন নারীর পক্ষে সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ করা কতটা সাহসের বিষয় ছিল, সেই দিকটিও।

মুখ্য শব্দগুচ্ছ

নারীশিক্ষা, লীলাবতী নাগ, নারী আন্দোলন, দীপালী সংঘ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলন।

*প্রবন্ধটি 'নাজমা জেসমিন চৌধুরী স্মারক বক্তৃতা ২০১৬' হিসেবে ২৯ সেপ্টেম্বর ২০১৬ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউটে পাঠ করা হয়।

তুমি কি কেবলই ছবি, শুধু পটে লিখা।
ওই-যে সুদূর নীহারিকা
যারা করে আছে ভিড় আকাশের নীড়
ওই যারা দিনরাত্রি
আলো হাতে চলিয়াছে আঁধারের যাত্রী গ্রহ তারা রবি,
তুমি কি তাদের মতো সত্য নও।
হায় ছবি, তুমি শুধু ছবি ॥
নয়নসমুখে তুমি নাই,
নয়নের মাঝখানে নিয়েছ যে ঠাঁই—আজি তাই
শ্যামলে শ্যামল তুমি, নীলিমায় নীল।
আমার নিখিল তোমাতে পেয়েছে তার অন্তরের মিল।
নাহি জানি, কেহ নাহি জানে—
তব সুর বাজে মোর গানে,
কবির অন্তরে তুমি কবি—
নও ছবি, নও ছবি, নও শুধু ছবি ॥[১]

॥ এক ॥

শ্রদ্ধেয় লীলাবতী নাগ, আপনার সঙ্গে আমার প্রথম পরোক্ষ সাক্ষাৎ ঘটেছিল ১৯৫৪ সালে। সেই বছর চতুর্থ শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলাম আপনার প্রতিষ্ঠিত 'নারীশিক্ষা মন্দির' (২ ফেব্রুয়ারি ১৯২৮) বিদ্যালয়ে।[২] বিদ্যালয়টির বড়দিদির (প্রধান শিক্ষয়িত্রী) অফিস ঘরের দেয়ালে একটি বড় বাঁধানো আলোকচিত্র টানানো ছিল আপনার। স্কুলের শিক্ষয়িত্রীরা শিক্ষাবর্ষের শুরুতে ছাত্রীদের কাছে আপনার পরিচিতি, কর্মকাণ্ড, শিক্ষাচর্চা বিষয়ে বিশদভাবে বলতেন।

সে সময়ে পরম শ্রদ্ধায় আপনার কথা বলতেন বিদেশিনী দিদি, জ্যোতি দিদি, ইনু দিদি। ভাসা-ভাসা বুঝতাম আপনি মেয়েদের শিক্ষার জন্য জীবন উৎসর্গ করেছেন। বড় হতে হতে জানলাম আপনি কলকাতায় শিক্ষা, রাজনীতি, পূর্ববঙ্গের বাস্তুত্যাগীদের জন্য নানা কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিয়ে সাংগঠনিকভাবে সক্রিয় থেকে কাজ করে যাচ্ছেন।[৩]

আপনার প্রতিষ্ঠিত 'নারীশিক্ষা মন্দির' বিদ্যালয়ে আমি ১৯৬০ সাল পর্যন্ত পড়েছি; ম্যাট্রিক পরীক্ষা দিয়ে ভর্তি হয়েছিলাম ইডেন কলেজে। আইএ পাস করে ভর্তি হই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তত দিনে জেনেছি আপনি ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম দুজন ছাত্রীর একজন, যিনি সহশিক্ষার বন্ধ দরজা উন্মুক্ত করতে একরোখা প্রতিবাদে জয়ী হয়েছিলেন। খুব দেখার ইচ্ছা হতো আপনাকে। আপনি কেন চলে গেলেন

নিজের দেশ আর জন্মভূমি ছেড়ে? কর্মযজ্ঞের বিপুল সাফল্যময় সুকীর্তিগুলো অসমাপ্ত রেখে চলে গেলেন কেন? ধীরে ধীরে জেনেছি চলে যেতে আপনাকে বাধ্য করেছিল (১৯৪৭ সালে দেশভাগের পর)—পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে। পাকিস্তান সরকার আপনার প্রতিষ্ঠিত 'নারীশিক্ষা মন্দির' স্কুলের নাম বদলে 'শের-এ-বাংলা বালিকা বিদ্যালয়' করেছিল। জানি না আপনি জেনেছিলেন কি না। আপনার প্রতিক্রিয়ার বিষয়েও জানি না। তবে আমরা ক্ষুব্ধ প্রতিক্রিয়া জানিয়েছিলাম বাংলাদেশের নারী-মানবাধিকার সামাজিক আন্দোলনের পথিকৃৎ কবি সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে।

আপনি কেন একবারও পূর্ব পাকিস্তানে আসেননি? জেনেছি, সেটাও রাজনৈতিক নিষেধাজ্ঞার জন্য। দেশভাগের পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা আর নিরাপত্তা-সংকটের জন্য পূর্ব পাকিস্তানের হিন্দু সম্প্রদায়ের জনস্রোত সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে বাস্তুত্যাগী হতে শুরু করলে পশ্চিমবঙ্গে তাদের জন্য আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক পুনর্বাসনের কাজে আপনি সম্পৃক্ত হলেন। আজীবন তাদের পাশে ছিলেন।

আপনার জীবনের তিন দশক ('২০, '৩০, '৪০—দশকের) বা ত্রিশটি বসন্তের যত ফুল, যত গান, যত কবিতা, যত কর্মোদ্যোগ 'ঢাকা'-কে ঘিরে উৎসারিত হয়েছিল, সেসব ধ্বংস হতে শুরু করল। সেসবের প্রাণভোমরা ছিলেন আপনি। আপনাকে ঘিরে কর্ম-উদ্দীপক হাজার হাজার নারী-পুরুষের জীবন অস্থিতিশীল হয়ে পড়ল। তাদের পাশে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় বিধ্বস্ত হিন্দু সম্প্রদায়ের নারী-পুরুষ সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে চলে যেতে বাধ্য হলেন। তাদের পাশে আপনি ছিলেন পশ্চিমবঙ্গে। বড় হতে হতে সেই সব কর্মকাণ্ডের ইতিহাস পাঠে আপনার স্থির-অবিচল, যন্ত্রণাবিদ্ধ-সফল জীবনযাত্রার অনুষঙ্গী হওয়ার প্রেরণা পেয়েছিলাম।

ভেবেছিলাম যদি সুযোগ পাই একবার কলকাতায় গিয়ে আপনার সাক্ষাৎ পেতে চেষ্টা করব। তা আর হলো না। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময় কলকাতায় ভারতের নারী সংগঠনগুলোর সহযোগিতায় যুদ্ধবিধ্বস্ত বাংলাদেশের আশ্রয়কেন্দ্রগুলোতে কাজ করার সুবাদে আমরা অধীর আগ্রহে আপনার সাক্ষাৎ পাওয়ার আশা করেছিলাম। দুঃখে-কষ্টে-অশ্রু ভারাক্রান্ত হয়ে শুনলাম, ১৯৬৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি সেরিব্রাল আক্রমণে অসুস্থ হয়ে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় আড়াই বছর পর ১৯৭০ সালের ১১ জুন রাত ১২টা ২০ মিনিটে ইহজীবন ত্যাগ করেছেন।[৪] এই দুঃখ আমি আজও বহন করে চলেছি। দেখা হলো না, সাক্ষাতে জানা হলো না আপনাকে।

॥ দুই ॥

সিলেটের আদর্শনিষ্ঠ নাগ পরিবারে মা কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী ও বাবা গিরিশচন্দ্র নাগের সাত সন্তানের অন্যতম ও একমাত্র কন্যা ছিলেন আপনি। এসডিও বাবার

কর্মস্থল আসামের গোয়ালপাড়া শহরে ১৯০০ সালের ২ অক্টোবর আপনি জন্মগ্রহণ করেন। পারিবারিকভাবে আপনার নাম রাখা হয় 'লীলাবতী নাগ'। 'বুড়ী' নামে ডাকতেন মা-বাবা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময়ে 'লীলাবতী নাগ' ও 'লীলা নাগ'—দুই নামে আপনার অন্তর্ভুক্তি হয়েছিল বলে তথ্য দিয়েছেন দীপংকর মোহান্ত, যিনি আপনার জীবন ও কর্মকাণ্ড বিষয়ে গবেষণামূলক বই লিখেছেন (*লীলা নাগ ও বাংলার নারী জাগরণ*)। তাঁর দেওয়া তথ্যে জানা যাচ্ছে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টেবুলেশন শিটে আছে, 'লীলা নাগ, ১৯২৩ সাল, এমএ পরীক্ষা, রোল ১৬, ইংলিশ গ্রুপ-এ'। অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন (প্রয়াত) দীপংকর মোহান্তকে প্রামাণ্য তথ্যে জানিয়েছিলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির সময় ১৯২১ সালে ঢাকা হলের সংযুক্ত ছাত্রী হিসেবে আপনার নাম আছে 'লীলাবতী নাগ'। ১৯৩৯ সালের ১৩ মে ঢাকার বিপ্লবী সংগঠন শ্রী সংঘের প্রতিষ্ঠাতা নেতা অনিল রায়ের সঙ্গে বিয়ের পর আপনি পরিচিত হলেন 'লীলা রায়' নামে।[৫]

আপনি যে উচ্চ শিখরে অবস্থান করছেন, যে স্বনামধন্য ও কৃতী ব্যক্তিত্ব রূপে অবস্থান নিয়েছেন সর্বভারতীয় বাংলার—বাংলাদেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, নারী-জাগরণের-প্রগতির ক্রমবিকশিত ইতিহাসে—সে অবস্থানে নামে কিছু আসে যায় না। তবুও আমরা এ নিয়ে বারবার তথ্য-বিতর্ক করতে থাকি শুধু আপনার মতো ব্যক্তিত্বদের নিখুঁত পরিচয় নতুন প্রজন্মকে দেওয়ার জন্য।

তেমনি আরও একটি তথ্য-বিতর্ক অনেক দিন চলেছিল যে, আপনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী কি না?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষার আইন থাকা সত্ত্বেও[৬] আপনি যখন ইংরেজি সাহিত্যে এমএ প্রথম পর্বে ভর্তি হতে চাইলেন ১৯২১ সালে, তখন অনুমতি না পাওয়ায় আপনিই প্রথম অবিচল থেকে প্রতিবাদ জানিয়ে সহশিক্ষার অনুমোদন পেলেন। সেই সময়ে আপনি ইংরেজি বিভাগে এমএ প্রথম পর্বে এবং সুষমা সেনগুপ্ত অর্থনীতি বিভাগে বিএ সম্মান শ্রেণিতে ভর্তি হয়েছিলেন। অধ্যাপক রঙ্গলাল সেন তথ্য দিয়েছেন, আপনারা দুজন খুবই অন্তরঙ্গ ছিলেন। আপনাদের মধ্যে খুবই হৃদ্যতা ছিল। দুজন একসঙ্গে 'লেডিজ ওয়েটিং রুম'-এ বসে থাকতেন। তখনকার রেওয়াজ অনুযায়ী আপনারা অধ্যাপকদের সঙ্গে নিজ নিজ ক্লাসে যেতেন।[৭]

সেই রেওয়াজ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়-ক্যাম্পাসে বহু বছর ছিল। কিন্তু আপনি তো মনের দিক থেকে, চেতনার দিক থেকে প্রগতিবাদী ছিলেন। তাই এসব নিয়ম মানার জন্য মেনেছেন কিন্তু অবরুদ্ধ থাকেননি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের ছাত্র অনিল রায় ১৯২৩ সালে এমএ পাস করেন। তিনি অনুশীলন দলের গোপন নেতা ছিলেন। সেই গোপন কাজ করার জন্য তিনি Social Welfare League গঠন করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রসায়নের অধ্যাপক ড. জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ছিলেন সেই সংস্থাটির প্রথম সভাপতি আর অনিল রায় ছিলেন সম্পাদক। শ্রদ্ধেয় লীলা নাগ, আপনি অনিল রায়ের সংস্পর্শে আসেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় এবং তাঁর পরিচালিত সমাজকল্যাণ সমিতির সঙ্গে যুক্ত হন। *The History of the University of Dacca* বইটিতে অধ্যাপক এম আব্দুর রহিম লিখেছেন: 'Many students of the university including women joined the societies of Anil Roy and Lila Nag. Under the social welfare services, they secretly conducted their programme of revolutionary activities.'[৮]

এসব তথ্য যতই জেনেছি, ততই আপনার সম্পর্কে আরও জানার জন্য, আপনার বিপ্লবী-চেতনার ক্রমবিকশিত পরিচয় জানার জন্য নিবিড় অনুসন্ধান চর্চা করতে উদ্দীপ্ত হয়েছি।

॥ তিন ॥

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময়ে আপনি (১৯২১-১৯২৩) সামাজিক কর্মকাণ্ডে যুক্ত হয়েছেন সত্য, কিন্তু তার আগেও ঢাকায় ইডেন স্কুলে মাধ্যমিকে পড়ার সময়ে (১৯১১-১৯১৭), কলকাতায় বেথুন কলেজে (১৯১৭-১৯২১) আইএ ও বিএ পড়ার সময়ে আপনার সামাজিক-সাংস্কৃতিক-রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের তথ্যাদি থেকে জানা যায়, আপনি বহুমুখী কর্মকাণ্ডে নেতৃত্ব দিতেন সহজাত প্রতিভায়। প্রতিবাদী ছিলেন। সংগঠক ছিলেন।

সাংগঠনিক দক্ষতা ও ব্যক্তিত্বগুণের জন্য বেথুন কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীমতি রাইট আপনাকে 'সিনিয়র স্টুডেন্ট' মর্যাদায় সম্মানিত করেছিলেন। বেথুন কলেজে প্রথম ছাত্রী-রিইউনিয়ন (ছাত্রী-পুনর্মিলনী) গড়ে তুলেছিলেন আপনি। অন্যদিকে আপনার রাজনৈতিক আদর্শের সঙ্গে সংঘর্ষ হওয়ায় বিরোধও ঘটিয়েছিলেন। ১৯২১ সালের ১ আগস্ট লোকমান্য বাল গঙ্গাধর তিলকের মৃত্যু হওয়ায় তাঁর প্রতি সম্মান জানাতে ছুটি ঘোষণার দাবি জানালে শ্রীমতি রাইট আপনাদের জাতীয় চেতনায় আঘাত দেন। ফলে তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তে কলেজে 'ছাত্রী-ধর্মঘট'-এর ডাক দিলেন। বাধ্য হয়ে প্রিন্সিপাল ক্ষমা চেয়ে অপ্রীতিকর সংকটের সমাধান করেছিলেন।[৯]

বেথুন কলেজে আপনার অন্যতম সহপাঠী প্রীতি চট্টোপাধ্যায় একটি লেখায় (*জয়শ্রী* পত্রিকায় প্রকাশিত)[১০] জানিয়েছেন আপনার শিক্ষা, সংস্কৃতি, খেলাধুলা, রাজনীতি চর্চার বিষয়ে। আপনি ও আপনার সতীর্থ প্রীতি চট্টোপাধ্যায় 'বেথুনের বড় বড় থামওয়ালা চওড়া বারান্দাগুলোতে লম্বা-লম্বা পা ফেলে বেড়াতে বেড়াতে' জল্পনা-কল্পনা করতেন, কেমন করে নিজেদের জীবনকে কাজে

লাগাবেন, কেমন করে কোন পথে দেশের মুক্তিসংগ্রামে নিজেদের উৎসর্গ করে দেবেন ইত্যাদি আলোচনায়।

আপনার পুরো জীবন ইতিহাস যেহেতু আমরা নানা লেখা, চর্চা, জীবনী বই থেকে জেনেছি, সেই সূত্রে জানতে পেরেছি, ১৯১৭ সালের ২ অক্টোবর বাবাকে লিখেছিলেন আপনার জীবনের আদর্শের কথা। লিখেছিলেন :

> আমার ক্ষুদ্র শক্তি যদি একটি লোকেরও উপকার করতে পারতো তবে নিজেকে ধন্য মনে করতুম। সত্যি বলছি—এ আমার বক্তৃতা নয়, এটা আমার প্রাণের কথা, এই আমার ideal.
> ...আমার উদ্দেশ্য নয় এই পৃথিবীতে লোকের প্রিয় হওয়া কিন্তু এই পৃথিবীতে খাঁটি হওয়া। খাঁটি হয়েও যদি প্রিয় হতে পারি তবে তো কথাই নেই।[১১]

আমরা নিশ্চিত হচ্ছি, আকস্মিকভাবে দৃঢ়চেতা লীলা নাগের আবির্ভাব ঘটেনি। কারণ, শৈশব-কৈশোরে স্বপ্নসাধনা, রাজনীতি-সচেতন জীবনচর্চা, সাংগঠনিক-চর্চা ও অনুশীলনে ব্যাপৃত থাকা আপনার প্রতিষ্ঠা ও জীবনসাফল্যের মূল সূত্র।

॥ চার ॥

আপনার কাজ, দক্ষতা ও সাধনার প্রতিটি ধাপ সুশৃঙ্খলভাবে রূপায়িত হয়েছে। যদিও প্রশ্ন জাগে আমার মনে, আপনি নারী শিক্ষাব্রতী এবং নারী আন্দোলনের নেত্রী হিসেবে ঢাকায় প্রতিটি এলাকায়, বাড়িতে বাড়িতে যখন খুঁজেছেন শিশু, কিশোরী, তরুণী ছাত্রী আপনার প্রতিষ্ঠিত ১২টি স্কুলে ভর্তির জন্য; তখন কি শুধুই সমাজসেবামূলক দৃষ্টি আপনাকে উদ্দীপিত করেছিল? নাকি আপনার মন ও দৃষ্টি পরিপূর্ণ ছিল রাজনৈতিক-স্বদেশি বিপ্লবী ভাবধারা এবং সক্রিয় আন্দোলনমুখী কর্মধারায়?

সাল, মাস, দিন হিসেবে আপনার কাজের ক্রমধারায় রাজনৈতিক-স্বদেশি-বিপ্লবী পদক্ষেপগুলো শিক্ষাজীবনের প্রতিটি ধাপে এবং পরবর্তী সময়ে চেতনা বিকাশের বিস্তৃত পরিসরে সুস্পষ্ট হয়ে আছে—যা সমাজ, দেশ ও জনগণের স্বাধীনতাকেই প্রধান আকাঙ্ক্ষিত ও উদ্দিষ্ট বলে চিহ্নিত হচ্ছে। তাই নিজের প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পাই, আপনার জীবনব্যাপী কর্মসাধনা বিপ্লবী চেতনার নিরলস স্রোতধারায় বহমান ছিল।

এই একুশ শতকের (২০১৬) দ্বিতীয় দশকে অর্থাৎ বিশ শতকের (১৯১৬) দ্বিতীয় দশক থেকে এক শ বছর পরও সেই চেতনা ও অনুশীলন আমাদের (ঢাকা, পূর্ববঙ্গ) বাংলাদেশে প্রগতির আন্দোলনে অতি প্রয়োজনীয় বলে আমরা অনুসন্ধান করি এবং বহু মনীষীর জীবনসাধনার তালিকায় আপনার নাম বারবার উচ্চারণ করি, সংযোজন করি, অব্যাহতভাবে অনুশীলন করি।

এই ধারায় আমরা বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত নারী সমাজ ও নারী সংগঠনগুলো আপনার নারী আন্দোলনের কর্মধারা থেকে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেছি, অনুসরণ করেছি এবং প্রজন্ম থেকে প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চেয়েছি।

১৯২১ সালে আপনি যখন বিএ পাস করেছেন, সেই বছরে শুরু হয়েছিল নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলন। কুমুদিনী বসুর নেতৃত্বে গড়ে ওঠা 'সারা বাংলা নারী ভোটাধিকার কমিটির (নিখিল বঙ্গ নারী ভোটাধিকার সমিতি) সহ-সম্পাদিকার দায়িত্ব পেয়েছিলেন আপনি। আপনার কর্মস্থল ঢাকায় নারীদের সংগঠিত করলেন। ভোটাধিকার বিষয়ে আন্দোলন করার লক্ষ্যে মহিলাদের সভার আয়োজন করলেন। সভানেত্রীত্ব করার জন্য আপনার আহ্বানে যোগ দিয়েছিলেন ইডেন স্কুলের প্রিন্সিপাল শ্রীমতি স্বর্ণলতা দাস।[১২]

১৯২২ সালে সুভাষচন্দ্র বসুর নেতৃত্বে পরিচালিত উত্তরবঙ্গ বন্যাত্রাণের কাজে যুক্ত হয়ে ঢাকায় 'ঢাকা মহিলা কমিটি' গঠন করে বাড়িতে বাড়িতে গিয়ে অর্থ ও বস্ত্র সংগ্রহ করেছেন। ১৯২৮ সালে সাইমন কমিশন-বিরোধী হরতাল কর্মসূচিতে ঢাকার মহিলাদের সংগঠিত করে মিছিলে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন আপনি।[১৩]

আপনার কৈশোর ও কৈশোর উত্তীর্ণ শিক্ষালয় ইডেন স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছিলেন আপনি। শিক্ষা ও সংস্কৃতির রস আপনি সেই স্কুলের শিক্ষকবৃন্দ, শিক্ষা কার্যক্রম থেকে আহরণ করেছিলেন সাত বছর ধরে। (১৯১১-১৯১৭) ছিলেন হোস্টেলে ম্যাট্রিক ও আইএ পড়ার সময়ে (ইডেন স্কুল ও বেথুন কলেজে)। ছুটিতে বাড়িতে যেতেন। তখনো ভাইদের কাছে স্কুলের আনন্দময় পরিবেশের গল্প উজাড় করে বলতেন।

বাড়িতে থেকে পড়ার জন্য মানসম্মত স্কুল-কলেজ পেতেন না বলে বদলির চাকরিতে কর্মরত বাবা আপনাকে ঢাকায়, কলকাতায় আবাসিক স্কুল-কলেজে পড়িয়েছেন। পরিবারের সমৃদ্ধ শিক্ষা-সাংস্কৃতিক আদর্শ ও স্বদেশানুরাগ আপনার চারিত্রিক দৃপ্ত আদর্শ গড়ে তুলেছে নিয়ত পরিচর্যায়, আদরে, যত্নে। সেই পারিবারিক প্রভাব-যত্ন এবং স্কুলের ঘরোয়া আন্তরিক যত্ন, পরিবেশ ও শিক্ষা-সংস্কৃতির চর্চার প্রভাবে পরিবার-বিচ্ছিন্নতার বিষণ্ণতা আপনার মধ্যে স্থান পায়নি। উপরন্তু রবীন্দ্র-প্রভাবও গুরুত্বপূর্ণ ছিল আপনার জীবনে।

আপনি বলেছেন আপনার 'জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ রবীন্দ্র-প্রসাদ সিঞ্চনে' 'উন্মিষিত' হয়েছে। বলেছেন, 'মনে পড়ে প্রতি সকালে সন্ধ্যায় পারিবারিক সম্মিলিত প্রার্থনায় অথবা ছাত্রাবস্থায় দৈনন্দিন সম্মিলিত সঙ্গীতে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের গানের মাধ্যমে ধীরে ধীরে উন্মিষিত হয়েছে। জীবন সম্বন্ধে নিষ্ঠা, গাম্ভীর্য, বিপদে নিঃশঙ্কতা ও আত্মপ্রত্যয়, অর্থাৎ অলক্ষ্যে পত্তন হয়েছে জীবনের প্রাথমিক বুনিয়াদ রবীন্দ্র-প্রসাদ সিঞ্চনে। লক্ষ উপদেশাবলী যা করতে

পারত কিনা সন্দেহ, রবীন্দ্র সঙ্গীতের ভাব ভাষা ও সুর অতি সহজে স্বাভাবিকভাবে তা করেছে।'[১৪]

বাংলাদেশের প্রতিটি গণ-আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ পথ দেখিয়েছেন। দেখাচ্ছেন আজও। পাকিস্তান শাসনামলে রবীন্দ্রশতবর্ষ উদ্‌যাপনে (১৯৬১) তীব্র বাধার বিরুদ্ধে লড়েছি আমরা। মুক্তিযুদ্ধোত্তর স্বাধীন বাংলাদেশে জাতীয় সংগীত 'আমার সোনার বাংলা' হৃদয়ে ধারণ করে চলেছি।

শ্রদ্ধেয় লীলা নাগ, আপনার প্রিয় কর্মস্থল ঢাকায় ও বাংলাদেশে বর্তমান সময়ে আমরা শিক্ষা ও শিক্ষাকেন্দ্রে মানবিক-সাংস্কৃতিক-আদর্শ সংকট, তরুণ সমাজের একাংশের আদর্শ বিচ্যুতি ও পরিবার বিচ্ছিন্নতার সংকট, সন্ত্রাস-জঙ্গিবাদের নৃশংসতার অন্ধকার দূর করার সংগ্রামে লিপ্ত রয়েছি। এই সংকট থেকে উত্তরণের পথ খুঁজতে আপনার জীবনচর্চা কিছুটা হলেও আমাদের পথ দেখাচ্ছে।

আপনার যুগে প্রগতির সংগ্রামে, স্বাধীনতার জন্য বিপ্লবী আন্দোলনে তরুণ-তরুণীরা সশস্ত্র অগ্নিপরীক্ষায় জীবন উৎসর্গ করেছেন দলে দলে। কারাবরণ, আত্মাহুতি, ফাঁসির মঞ্চে জীবনের জয়গান গেয়েছেন বিপ্লবীরা।

বিপ্লবী দলেও ভিন্নমতের বিরোধ ছিল। হিংসা, সহিংসতা বিপ্লবীদের মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত করেছিল। 'শ্রীসংঘ'ও সেই সংকটের মুখোমুখি হয়েছিল।

আকাঙ্ক্ষিত বিপ্লবী আদর্শের লক্ষ্য পূরণ হয়নি বলে আপনি ও আপনার মতো শত-সহস্র বিপ্লবী দেশপ্রেম থেকে বিচ্যুত হননি, হতাশ হলেও নতুন উদ্যমে নতুন পথে সংগঠন-আন্দোলনকে মানুষের কল্যাণে প্রবাহিত করেছেন।

সামন্তবাদ, সাম্রাজ্যবাদ, শ্রেণিবৈষম্য, ধনবৈষম্য আজও টিকে আছে, আজও আকাঙ্ক্ষিত সুন্দর মানব প্রগতির পথ রুদ্ধ করে আছে। বাংলাদেশে নানা উত্থান-পতনের মধ্য দিয়ে, উন্নয়নের নতুন নতুন অর্জনের মধ্য দিয়ে, মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত স্বাধীনতার (১৬ ডিসেম্বর, ১৯৭১) ৪৫ বছর পরে উত্তরণের লক্ষ্যে বহু মত ও পথ বিশ্লেষণ করতে করতে নতুন পথ তৈরি করতে আমরা উদ্যোগী হই। বহু জনের আদর্শ জীবনের মধ্যে পথ অনুসন্ধান করি। আপনার জীবন আদর্শ আজও ধ্রুবতারার মতো পথ দেখায় আমাকে—আমাদের অনেককে।

আপনি যখন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ছিলেন, তখন বাবার স্থায়ী আবাসস্থল ৩, বকশীবাজারে থাকা শুরু করেছেন। প্রতিবেশী ও সহপাঠী অনিল রায় থাকতেন ৭, বকশীবাজার, নিভৃতনিলয় বাড়িতে। বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠের সময় থেকেই সামাজিক-সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক সহযাত্রায় আপনারা চলেছিলেন পারস্পরিক হৃদ্যতায়। ১৯২৩ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জনের পর প্রতিষ্ঠা করলেন 'দীপালী সংঘ'। এর লক্ষ্য ছিল নারীমুক্তি সংগ্রাম। গোপন বিপ্লবী দল 'শ্রীসংঘ'-এর কাজে যুক্ত হলেন ১৯২৪ সালে। নারীমুক্তির লক্ষ্যে গড়ে তোলা দীপালী সংঘের সব কার্যক্রমে

বিপ্লবী আদর্শ যুক্ত হতে থাকল। ১২টি স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলো ঢাকায় মেয়েদের শিক্ষাদানের জন্য। নিউ হাইস্কুল বা দীপালী স্কুল, নারীশিক্ষা মন্দির (১৯২৮), শিক্ষা ভবন, শিক্ষা নিকেতন, বারোটি অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করলেন। মেয়েদের জন্য ইংরেজি স্কুল প্রতিষ্ঠা করলেন। মেয়েদের জন্য বয়স্ক শিক্ষা, কারিগরি শিক্ষা প্রচলনে আপনিই ছিলেন পথিকৃৎ। দীপালী স্কুলই পরে 'কামরুন্নেসা বালিকা বিদ্যালয়' নামে চালু আছে। অর্থ সহযোগিতা করেছিলেন সমাজের অর্থবান প্রগতিশীল ব্যক্তিবর্গ এবং আপনার বাবা।[১৫]

বাল্যবিবাহের ঘোর বিরোধী ছিলেন আপনি। মেয়েদের আত্মপ্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে উচ্চশিক্ষা, আয়-উপার্জন, স্বাধীন চিন্তা, নারী-পুরুষের সম-অধিকার—এসবই আপনি অব্যাহতভাবে প্রচার করতেন এবং গঠনমূলক কাজের মধ্য দিয়ে বাস্তবায়িত করতেন।

আপনার বাবা তাগাদা দিতেন বিয়ের জন্য। ১৪-১৫ বছর বয়স থেকে আপনি বাবার সেই সব তাগাদা বাতিল করে চলেছিলেন। রাগান্বিত হয়ে বাবাকে চিঠি লিখতেন যেন কখনো কারও সঙ্গে আপনার বিয়ের প্রস্তাব তিনি না দেন। আপনার ছোট ভাই প্রভাতচন্দ্র নাগ লিখেছেন, 'দিদির বয়স যখন ১৪/১৫ তখন থেকে দিদিকে বিবাহ দেবার জন্য বাবার চেষ্টার অন্ত নেই; কতবার কত প্রস্তাবই না বাবা এনেছেন দিদির জন্য। কিন্তু দিদি সবটাই ফিরিয়ে দিয়েছেন; শেষবার বাবা হাল ছেড়ে দিলেন। মা কোনো সময়ই বেশি জোর করেননি এই সম্পর্কে। মা বলতেন, বুড়ীর যখন ইচ্ছা হবে তখন তো নিজেই ঠিক করবে—জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার আমি কোনো দিনই পক্ষপাতী নই—এতে অনিষ্টই হয়—মঙ্গল হয় না কখনো।'[১৬]

বিপ্লবী সাথি অনিল রায়ের সঙ্গে বিয়ের সময় (১৯৩৯) আপনার মা বেঁচে ছিলেন না, বাবা উপস্থিত ছিলেন। সেই সব ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখময় স্মৃতিতে বিপ্লবী লীলা রায়কে, স্নেহপরায়ণ এক নারীকে চেনা যায়।

॥ পাঁচ ॥

'ঢাকা দীপালী সংঘ' ছিল সেই সময়ের একমাত্র মহিলা সমিতি। সভ্যসংখ্যা ১৯২৫ সালে ১০০ নারীর বেশি বলে জানিয়েছিলেন আপনি *বঙ্গলক্ষ্মী*, ১ম বর্ষ ২য় সংখ্যায়—১৯২৬ সালে প্রকাশিত আপনার লেখায়। ঢাকা শহরের পাড়ায় পাড়ায়—যথা ওয়ারী, বকশীবাজার, রাজার দেউরী, তাঁতিবাজার, নারিন্দা-ওয়ারী এলাকায় নারীদের পড়াশোনা, শিল্প শিক্ষা, বেতের ব্যাগ তৈরি, চরকায় সুতা কাটা শেখানো হতো। লেডি ডাক্তার, রোগীর পরিচর্যা, সন্তান পালন ইত্যাদি যেমন অতি প্রয়োজনীয় পাঠ্যসূচি বলে ভেবেছিলেন, তেমনি সংস্কৃতিচর্চা, নারীর সম-অধিকার বিষয়ে জাগরণমূলক কর্মসূচিও ছিল পাঠ্যসূচিতে। ছিল ব্যায়ামাগার। সেখানে

লাঠি, ছুরিখেলা, শরীরচর্চা শেখানো হতো আত্মরক্ষার উদ্দেশ্যে।

দীপালী সংঘ প্রতিষ্ঠায় আপনার লক্ষ্য ছিল মূলত দুটি। বলেছেন আপনি, প্রথম লক্ষ্য ছিল স্বামী ও ভাইদের দেশের জন্য প্রাণোৎসর্গে নারীদের উদ্বুদ্ধ করা। দ্বিতীয় লক্ষ্য ছিল, অস্ত্রশস্ত্র, বিপ্লবী পলাতক ও চিঠিপত্র চালাচালির সন্দেহমুক্ত স্থান সৃষ্টি করা।

এই প্রসঙ্গে আপনাকে এবং আমাদের বর্তমান সময়ের সচেতন, নারী জাগরণে উদ্বুদ্ধ নারী-পুরুষ ব্যক্তিবর্গকে জানাতে চাই, সেই সময়কাল থেকে ৯১ বছর পেরিয়ে এসে এখনো আমরা সেই ধারাতেই নারী সংগঠন, নারী জাগরণের কাজ করছি। আন্তর্জাতিক সেতুবন্ধনে নারীবাদের আওয়াজ তুলছি, জেন্ডার বৈষম্যের বিরুদ্ধে, আর্থসামাজিক ক্ষমতায়নের লক্ষ্যে নারী জাগরণ আন্দোলনকে সংগঠিত করছি ঠিকই, কিন্তু শত বছরের ইতিবাচক সংগঠিত নারী আন্দোলনের প্রগতির ধারাটি বাধাগ্রস্ত আজও। বহুমুখী নারী সংগঠন-আন্দোলনের কাজ সামাজিক বিস্তার থেকে আজ পিছিয়ে যাচ্ছে আত্মকেন্দ্রিকতায়। গড়ে উঠছে মানববন্ধনের কাজ। যুগের নানামুখী সাফল্যগাথায় ব্যক্তি নারীর অগ্রযাত্রা আমাদের চোখে পড়ে কিন্তু সমষ্টিগত অগ্রযাত্রা আজও প্রশ্নবিদ্ধ।

আপনি সেই সময়েই স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিলেন, শুধু সমাজ পরিবর্তন ও নারীর কল্যাণমুখী কাজ দিয়ে নারী-মুক্তি হবে না, চাই রাজনৈতিক মুক্তি, ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক পরাধীনতা ভেঙে দিয়ে চাই স্বাধীনতার মুক্তি। যোগ দিলেন 'শ্রীসংঘ'-এ। 'Social Welfare League' একই সঙ্গে 'শ্রীসংঘ' নামে রাজনৈতিক গুপ্ত বিপ্লবী দল হিসেবে কাজ শুরু করেছিল। নারী বিপ্লবীকে দলে নেওয়া, নেতৃত্বে যুক্ত করার বিরুদ্ধে পরশ্রীকাতর, ভিন্নধারার পুরুষ বিপ্লবীদের মতামত সোচ্চার হয়েছিল।

বিশ্লেষণ করেছেন প্রথিতযশা অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রথমবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হওয়ার সময়ে ১৯২১ সালে 'নারী' বলে প্রত্যাখ্যাত হওয়ার লড়াইয়ে আপনি উত্তীর্ণ হয়ে এসেছিলেন, কিন্তু আবারও 'নারী' বলে বাধা পেলেন 'শ্রীসংঘ'-এর পুরুষ বিপ্লবীদের কাছ থেকে। দ্বিতীয় বাধাও চূর্ণ করেছেন। কেননা তাঁর ভেতরে আগুন ছিল।[১৭]

আপনার ভেতরের এই আগুন, সচেতনতা, মানবসেবার ব্রত, নারী জাগরণের জন্য বৈপ্লবিক কর্মতৎপরতা আমাদের জন্য অনুকরণীয় শিক্ষা হিসেবেই অব্যাহত আছে।

দীপালী সংঘের সদস্য হয়েছিলেন বিপ্লবী চেতনায় উদ্দীপ্ত তরুণী প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার (১৯১১-১৯৩২)। ইডেন কলেজে পড়ার সময়ে জনৈক শিক্ষয়িত্রী তাঁকে একটি ফর্ম দিয়ে দীপালী সংঘের সদস্য হওয়ার জন্য উদ্বুদ্ধ করেছিলেন। দীপালী

সংঘের সদস্য হওয়ার অন্যতম শর্ত আপনি যুক্ত করেছিলেন, 'প্রয়োজন হইলে দেশের মুক্তি সংগ্রামে আমার সর্বস্ব, জীবন পর্যন্ত আমি ত্যাগ করিতে প্রস্তুত আছি।' এই শর্তটিতে প্রীতিলতা আকর্ষিত হয়েছিলেন।

চট্টগ্রামের বিপ্লবী সূর্যসেনের বিপ্লবী দলের সঙ্গে যুক্ত আত্মীয় দাদার মাধ্যমে পরোক্ষভাবে বিপ্লবী দলের কাজে যুক্ত প্রীতিলতা দলের নেতার মতামত পেয়েছিলেন দীপালী সংঘের সদস্য হতে পারবেন কিন্তু সূর্যসেনের বিপ্লবী দলের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্রতা গোপন রাখতে হবে। প্রীতিলতা তা মেনেছেন, অস্ত্র চালনা শিখেছেন, দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামে উদ্বুদ্ধ হয়েছেন। বিপ্লবী আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে বিপ্লবী দলে যোগ দিতে অনুমোদন পেয়েছেন অনেক পরে। সূর্যসেনের বিপ্লবী দলের সদস্য হয়েছিলেন, চট্টগ্রামের ইউরোপিয়ান ক্লাবে সশস্ত্র আক্রমণ চালিয়েছেন এবং গুলিবিদ্ধ হয়ে বিপ্লবী দলের নির্দেশ মেনে 'পটাশিয়াম সায়োনাইড' খেয়ে ১৯৩২ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর জীবন বিসর্জন দিয়েছেন।

পুরুষ-নারীর বৈষম্য তাঁকে তীব্র বেদনা দিয়েছে। মৃত্যুর পর তাঁর পোশাকের মধ্যে পাওয়া বিবৃতিতে তিনি বহু বিপ্লবী আদর্শিক ঘোষণার সঙ্গে লিখেছেন, 'দেশের মুক্তি-সংগ্রামে নারী ও পুরুষের পার্থক্য আমাকে ব্যথিত করিয়াছিল। যদি আমাদের ভাইয়েরা মাতৃভূমির জন্য যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতে পারে, আমরা ভগিনীরা কেন উহা পারিব না?'[১৮]

শ্রদ্ধেয় লীলা নাগ, আপনার এবং প্রীতিলতার মতো আরও বহু বিপ্লবী নারী এই বিক্ষোভ জানিয়েছেন, চূর্ণ করেছেন বাধা। কিন্তু সেই বাধা চলেছে আজও। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের সময়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধের জন্য সশস্ত্র প্রশিক্ষণে মেয়েদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি। মুক্তিযোদ্ধা বাহিনীতে শুধু পুরুষ তরুণদের স্বীকৃতি ছিল মুক্তিযুদ্ধের সময়ের সরকারি বিধানে। তা সত্ত্বেও মেয়েরা গেরিলা যুদ্ধে যোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা হতে পারেননি সরকারি নথিপত্রে। সেই সময় দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলজুড়ে গ্রামে-শহরে, বাড়িতে বাড়িতে নারীদের নির্যাতিত হতে হয়েছে। পাক-সামরিক বাহিনীর সেনারা ও দেশের ভেতরে তাদের দোসর রাজাকাররা নারীদের অত্যাচার নির্যাতন করেছে, বাংকারে আটকে রেখেছে, শারীরিকভাবে অত্যাচার করেছে। স্বাধীনতার পর তাঁদের উদ্ধার করে পুনর্বাসন কেন্দ্রে রাখা হলো, 'বীরাঙ্গনা' বলা হলো। 'মুক্তিযোদ্ধা'র সম্মান দেওয়ার জন্য বাংলাদেশের নারী আন্দোলনের নিরলস দাবির পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি (২০১৫) নারীদের মুক্তিযোদ্ধা স্বীকৃতির আইনি পরিসর তৈরি হয়েছে।[১৯]

এই প্রসঙ্গ নিয়ে আমরা যখন চর্চা করি নারীবৈষম্য ও নারীর প্রতি রাজনৈতিক পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির বিষয়ে, তখন অবধারিতভাবে আমাদের পূর্বসূরি বিপ্লবী

আপনি লীলা নাগ, প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন, সুফিয়া কামালসহ সকল নারী বিপ্লবী-সমাজকর্মী, স্বাধীনতাসংগ্রামী নারীদের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই, আপনাদের আদর্শ অনুসরণ করতে উদ্দীপ্ত হই।

আপনার সাধিত কাজগুলোর সময়কাল ধরে ধরে এগিয়ে যেতে যেতে বুঝতে পারি যে, আপনার প্রতিটি কাজের মধ্যে যোগসূত্রতা ছিল : নারী জাগরণ ঘটাতে হবে তাই স্কুল করতে হবে; পাঠ্যসূচিতে যেমন থাকতে হবে সামাজিক দায়িত্ব পালনের কুশলতা অর্জনের শিক্ষা অনুশীলন, তেমনি থাকতে হবে বিপ্লবী চেতনার প্রেরণা-উদ্দীপনা। থাকতে হবে হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থাদি। এসবের সঙ্গে সঙ্গে সংগঠিত ও অসংগঠিত নারী সমাজকে উদ্দীপ্ত করার জন্য সংবর্ধনা জানিয়েছেন, অভিনন্দন জানিয়েছেন, আমন্ত্রণ জানিয়েছেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে, মহাত্মা গান্ধীকে, সরলা দেবী চৌধুরানীকে। প্রয়াত দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাতেও সভার আয়োজন করেছেন।

সংবর্ধনার উত্তরে বিশিষ্ট সংবর্ধিত ব্যক্তিত্ববৃন্দ আপনাদের সংগঠিত কাজের কৃতিত্বে বিস্ময় জানিয়েছেন, আনন্দ প্রকাশ করেছেন।

৮ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬ সালে ঢাকা ব্রাহ্মসমাজ প্রাঙ্গণে[২০] কবি রবীন্দ্রনাথের সংবর্ধনা সভার বিবরণীতে আপনি লিখেছেন :

> সমবেত বোধ হয় দশ পনেরো হাজার বা তার চেয়েও বেশি সংখ্যক মেয়েরা সুসজ্জিত সুশৃঙ্খল পরিবেশে কবি গুরুকে তাঁদের শ্রদ্ধা জানাবার জন্য এসে মিলিত হলেন। ছোট্ট ছোট্ট সুসজ্জিত মেয়েরা পুষ্পবন্দনে অর্ঘ্য সাজিয়ে কবিকে বরণ করল : 'ওহে সুন্দর মরিমরি।' কবি ওদের সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে গুণ গুণ করে গান করলেন। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। তারপর তাঁর সে আশ্চর্য কণ্ঠে তিনি শুরু করলেন—'সমস্ত এশিয়াতে মেয়েদের এত বড় সভা দেখিনি কোথাও...।' আনন্দে মন ভরে উঠল। মেয়েদের আহ্বান জানালেন 'গৃহকে তোমরা আপন করেছ বাহিরকেও তোমাদের আপন করতে হবে। বাহিরকে আপন করে আত্মীয়—পরের গণ্ডী দূর করতে হবে।...সমস্ত সমাজের মাঝে, কাজের মাঝে, ভাবনার মাঝে এগিয়ে এসে তোমাদের অংশ নিতে হবে। তবেই সমস্ত সহজ হবে সার্থক হবে।'[২১]

উল্লেখ্য, ঢাকা শহরের মোট নারী সংখ্যা ১৯২১ সালে ছিল ৫২,১৭১। ১৯৩১ সালে ছিল ৫৯,১৫৩ জন।[২২] বর্তমান পুরান ঢাকা ছিল ঢাকার ভৌগোলিক এলাকা। দীপালী সংঘে আপনারা সংগঠিত করেছিলেন বিপুলসংখ্যক নারী সদস্যকে।

আপনার লেখায় ফুটে উঠেছে; রবীন্দ্রনাথ আপনার চলার পথে, আপনার জীবনে পথনির্দেশক হয়েছেন প্রায় সময়ই। সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন নারী আন্দোলনের মুখপত্র হিসেবে মেয়েদের মধ্যে 'দেশাত্মবোধ ও শঙ্কাহীন দেশসেবার ভাব জাগ্রত করবার উদ্দেশ্য নিয়ে'। রবীন্দ্রনাথ আপনার অনুরোধে পত্রিকাটির নাম দিলেন *জয়শ্রী*। সেই সঙ্গে তিনি কবিতা পাঠালেন :

বিজয়িনী নাই তব ভয়,
দুঃখে ও ব্যথায় তব জয়।
অন্যায়ের অপমান
সম্মান করিবে দান,
জয়শ্রীর এই পরিচয়।

জয়শ্রী আত্মপ্রকাশ করেছিল ১৯৩১ সালের মে মাসে। কেবল মেয়েদের পত্রিকা হিসেবে বা সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে নয়, এর বিস্তার ঘটল সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক দূরদৃষ্টির প্রসার ঘটানোর প্রয়াসে। আপনার সাধনা ছিল নতুন সমাজ, নতুন জীবন, নতুন মানুষ গড়ে তোলার প্রয়াসে *জয়শ্রীর* প্রকাশ অব্যাহত রাখা। ঘোষণা দিয়েছিলেন, পরাধীনতার শৃঙ্খল মোচন এবং সমাজ পরিবর্তনের লক্ষ্য সামনে রেখে, সর্বপ্রকার দেশসেবার উদ্দেশ্যে *জয়শ্রী* প্রকাশিত হচ্ছে।

ব্রিটিশরাজের বিরুদ্ধতার জন্য *জয়শ্রী* রাজরোষে পড়েছিল একাধিকবার। শেষ পর্যন্ত ১৯৩৫ সালে সরকারি নিষেধাজ্ঞায় চূড়ান্তভাবে বন্ধ হয়ে যায় ঢাকা থেকে প্রকাশিত *জয়শ্রী* পত্রিকা। *জয়শ্রী* পুনরায় দ্বিতীয় পর্যায়ে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হলো ১৯৩৮ সালের জুলাই মাসে।[২৩]

॥ ছয় ॥

আপনার বিপ্লবী সত্তা, বিপ্লবী কাজ, রাজনীতির বিপ্লবী পদক্ষেপগুলো ছিল সুশৃঙ্খল এবং পরস্পর সম্পর্কিত। রাজনৈতিক বিপ্লবী পদক্ষেপগুলো প্রত্যক্ষভাবে শুরু করেছিলেন 'শ্রীসংঘ'-এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে। একমাত্র নারী সদস্য এবং নারী নেতৃত্বের প্রতিভূ আপনাকে মুখোমুখি হতে হয়েছিল তীব্র পুরুষতান্ত্রিক বিরোধিতার। দলের মধ্যে প্রশ্ন উঠেছিল : 'Shall we be guided by a woman?' স্থির লক্ষ্যে আপনি বিপ্লবী দলের কাজ করে গেলেন। বিভিন্নজনের স্মৃতিচারণে আমরা সেই সময়ের সংকটময় পরিস্থিতির তথ্য জানতে পারছি। সেই সব তথ্য শতবছরের ইতিহাসের আকর হয়ে আছে।[২৪]

অন্যান্য বিপ্লবী দলে নারী সদস্য স্বীকৃত ছিল না। সূর্যসেনের নেতৃত্বে বিপ্লবী দলে নারী সদস্য গ্রহণযোগ্য হয়েছিল প্রীতিলতা ওয়াদ্দেদার, কল্পনা দত্ত প্রমুখের ঐকান্তিক বিপ্লবী প্রচেষ্টার তাগিদে।

ঢাকায় বিপ্লবী দল শ্রীসংঘ দুভাগ হয়ে যায় ১৯২৯ সালে। শ্রীসংঘ থেকে বেরিয়ে যাওয়া দলের নাম হলো বেঙ্গল ভলান্টিয়ার্স বা বি.ভি। সন্ত্রাস-সংঘর্ষ আপনাকে কষ্ট দিয়েছে কিন্তু সব দ্বন্দ্ব-কষ্ট ঝেড়ে শ্রীসংঘের নেতা অনিল রায়ের সহযোগী হয়ে চালিয়ে গেলেন বিপ্লবী কর্মকাণ্ড। আপনারা বাংলা, আসাম, ত্রিপুরার বহু শহরে

গড়ে তুললেন দল এবং দলের কাজ। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম যুব বিদ্রোহ ও অস্ত্রাগার দখলের ফলে ব্রিটিশ সরকারের ভিত কেঁপে ওঠার সময়ে ভাবলেন সব বিপ্লবী দলের ঐক্যের গুরুত্বের কথা। নারী-পুরুষ গোপন কর্মীদের দলে সংঘবদ্ধ করতে থাকলেন। প্রকাশ্যে কংগ্রেসের রাজনৈতিক মঞ্চে যোগ দিলেন, গোপনে গড়ে তুললেন শ্রীসংঘের শক্ত ভিত্তি।

ইতিহাসের পাতায় এসব গোপন বিপ্লবের কাহিনি সশ্রদ্ধ স্বীকৃতিতে সমুজ্জ্বল। ব্রিটিশশাসন মুক্ত করে দেশের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সশস্ত্র অভ্যুত্থান সমর্থন করে আপনি সকল বিপ্লবী সশস্ত্র দলগুলোর চাহিদা পূরণ করেছেন অস্ত্র সরবরাহ করে। আপনি এবং অনিল রায় অস্ত্র উৎপাদনের কথাও ভেবেছিলেন। অস্ত্র সংগ্রহ, অর্থ সংগ্রহ, অস্ত্রাগার রক্ষা করা, এসব কাজের জন্য বিপ্লবী নারী-পুরুষ কর্মীদের তৈরি ও সংগঠিত করার কাজে আপনাদের নিরলস নেতৃত্ব আজও বিস্ময়কর হয়ে আছে।

ঢাকার বকশীবাজার, ওয়ারী, ঠাটারিবাজার, গেন্ডারিয়া, বাংলাবাজার, লক্ষ্মীবাজার, ফরাসগঞ্জ, সিদ্ধেশ্বরী, তাঁতিবাজার, কায়েতটুলী, চাঁদনিঘাট, আজিমপুর এলাকাগুলোতে অস্ত্রঘাঁটি বানিয়ে যে নারীরা জীবনের ঝুঁকি নিয়ে দায়িত্ব পালন করেছেন রুনু বসু, হেলেনা দত্ত, রেণু কণা সেনগুপ্ত, লতিকা দাস, অনুপমা বসু—তাঁরাও আমাদের শ্রদ্ধেয়।

চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুণ্ঠনের ধৃত বিপ্লবীদের মামলা পরিচালনার অর্থ সংগ্রহের জন্য বিপ্লবী ইন্দুমতী সিংহের (অনন্ত সিংহ-র বড় বোন) অনুরোধে আপনি অর্থ সংগ্রহ করেছিলেন।

এসব বিস্তৃত ঘটনার বিবরণ দিয়ে শেষ করা যাবে না।

কিন্তু তার চেয়েও অশেষ যে বিস্ময় আমাকে, আমাদের সকলকে প্রশ্নাকুল করে তুলেছে, তা হলো আপনি গঠনমূলকভাবে বিপ্লবী আন্দোলনকে কীভাবে সশস্ত্র এবং নিরস্ত্র দুই পথেই ধৈর্যের সঙ্গে দ্রুততালে এগিয়ে নিতে পেরেছিলেন? সেই সবের উত্তর আপনার জীবনব্যাপী কর্মধারায় বহমান।

সেই সময় (১৯৩১) দূর থেকে দেখে এবং জেনে সাহিত্যিক (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন অধ্যাপক) বুদ্ধদেব বসু বলেছিলেন, 'তাঁর প্রতি একটি বিস্ময় মিশ্রিত শ্রদ্ধা অনুভব করতাম।'[২৫]

॥ সাত ॥

আপনার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ভীত ব্রিটিশরাজ কারাদণ্ড দিয়েছিল ১৯৩১-১৯৩৭ পর্যন্ত প্রথম দফায় ৭ বছর। আপনি ছিলেন বিনা বিচারে প্রথম ভারতীয় মহিলা রাজবন্দী।

পুনরায় ১৯৪০ সালে কারাবন্দী হলেন। আপনার বিয়ে হয়েছিল ১৯৩৯ সালে শ্রীসংঘের নেতা শ্রী অনিল রায়ের সঙ্গে। আপনার সহযোদ্ধা জীবনসাথী অনিল রায়কেও ব্রিটিশরাজ কারাদণ্ড দিয়েছিল ১৯৪০ সালে।

দুরারোগ্য ক্যানসারে আক্রান্ত হয়ে শ্রী অনিল রায় প্রয়াত হলেন ১৯৫২ সালে। জীবনসাথিকে হারিয়ে দুঃখ-বেদনায় বিদীর্ণ হলেও থামাননি কর্মোদ্যোগ।

আপনাদের জীবন ছিল পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা, ভালোবাসায় আপ্লুত। কারাবাসের সময়কালীন দিনলিপি, চিঠিপত্র সাক্ষ্য দিচ্ছে আপনারা দুজন ছিলেন পরস্পরকে এগিয়ে নেওয়ার জন্য প্রতিশ্রুতিশীল। অনিল রায় অনুরোধ জানিয়েছিলেন, নারী আন্দোলন বিষয়ে লেখার জন্য, জেলখানা থেকে চিঠিতে লিখেছিলেন, 'তোমার memoirs লিখলে ভালো হয়। রাজনৈতিক বিষয়, জীবনের বিভিন্ন দিক, শিক্ষা সম্বন্ধে stray thoughts ইত্যাদি লিখবার আপত্তি বা বাধা কিছু নেই তো। creative work কিছু করা এটা ভাবতে খুব ভালো লাগে।... আমার খুব অনুরোধ জানবে।'[২৬]

আপনি কেন লেখেননি আপনার স্মৃতিকথা? নারী আন্দোলনের, রাজনৈতিক আন্দোলনের অকথিত ইতিহাস জানার সুযোগ আমরা হারালাম।

অন্যদের লেখা নানা স্মৃতিকথা, নানা লেখা থেকে আমরা জানতে পারছি আপনাদের সুন্দর সমদর্শী জীবনের আনন্দ-বেদনার কথা, আদর্শের কথা, মানুষের জন্য জীবন উৎসর্গের কথা। আপনার কারাগারে বন্দিজীবনের নারী সাথিরা লিখেছেন কারাজীবনেও আপনার সৃজনশীল লেখাপড়ার কথা, অন্যদের অনুপ্রাণিত করার কথা, হাসিখুশি আনন্দে জীবনের কষ্ট, বেদনা, হতাশা থেকে উত্তরণের ইতিবাচক উদ্যমের কথা।

॥ আট ॥

আমরা নারীদের লেখা বহু তথ্যসমৃদ্ধ স্মৃতিকথা পেয়েছি, যা থেকে জানতে পারছি কীভাবে আপনি বহুবিধ কাজে তাঁদের সহযোগিতা চেয়েছেন এবং পেয়েছেন অথবা রাজনৈতিক মতভেদ সত্ত্বেও বন্ধুত্বের অন্তরঙ্গতা পেয়েছেন।

ঢাকার বিখ্যাত স্বদেশী নেত্রী আশালতা সেন (১৮৯৪-১৯৮৬) লিখেছেন: 'লীলা নাগ (পরে রায়) আমার সঙ্গে আলোচনা করেছেন আমাকে সশস্ত্র বিপ্লবের কাজে টানার জন্য। আমাদের উভয়ের লক্ষ্যই ছিল দেশের স্বাধীনতা; কিন্তু আমাদের পথ ছিল ভিন্ন। তিনি মনে করতেন অন্য অনেক দেশের মতো ভারতের স্বাধীনতাও দৃঢ়চিত্ত এবং গেরিলা যুদ্ধক্ষম তরুণ গোষ্ঠীর সাহায্যে সশস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমেই আনতে হবে। আমার বিশ্বাস ছিল যে, অহিংস গণ-আন্দোলনের পথই ভারতের পক্ষে শ্রেয়। আলোচনায় আমাদের মতবিভেদ দূর হলো না। আমাদের

ব্যক্তিগত সম্পর্ক আগের মতোই বন্ধুত্বপূর্ণ থাকল; কিন্তু আমাদের কর্মধারা বিভিন্ন রয়ে গেল।'[২৭]

১৯৩০ সালে মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে ঢাকায় আশালতা সেনের সঙ্গে 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠন করে কাজ করেছিলেন আপনি।

সুহাসিনী (১৯১৫-?) দাস লিখেছেন, ১৯৩৯ সালের ২৪-২৭ ফেব্রুয়ারি সিলেটের সুরমা উপত্যকায় অনুষ্ঠিত 'শ্রীহট্ট মহিলা সংঘ'-এর সম্মেলনে সুদীর্ঘ ও জ্বালাময়ী ভাষণে আপনি বলেছিলেন, 'আমাদের সর্ব প্রথম কর্তব্য মেয়েদের সংঘবদ্ধ হওয়া। এই সংঘবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন এইজন্য যে, বিচ্ছিন্নভাবে মেয়েরা নিজেদের এবং জাতির জন্য যা করেছেন বা করবেন, তাতে উদ্দেশ্যসিদ্ধি কিছুতেই হবে না। কাজেই জাতির কল্যাণ যাদের কাম্য তাদের উচিত অবিলম্বে সংঘবদ্ধ হওয়া।'[২৮]

সিলেটের সরলাবালা দেব এবং জোবায়দা খাতুন চৌধুরী (১৯০১-১৯৮৫) কংগ্রেসের রাজনীতিতে যুক্ত থাকার সূত্রে আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করেছেন। ১৯৪২-এর আন্দোলনের সময়ে আপনি এবং অরুণা আসফ আলী সিলেট মহিলা সংঘের নেত্রীদের সহায়তায় গোপন আশ্রয়ে ছিলেন।

ঢাকার সমাজ-সাহিত্য সেবী স্বনামখ্যাত সারা তৈফুর (১৮৮৮-১৯৭১) ১৯২২ সালে আপনার প্রতিষ্ঠিত 'দীপালী সংঘ'-এর সদস্য হয়েছিলেন। দীপালী সংঘের 'শিল্প মেলায়' তিনি সক্রিয় ছিলেন। একই সময়ে তিনি কলকাতায় রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেন (১৮৮০-১৯৩২) পরিচালিত 'আঞ্জুমানে খাওয়াতীনে ইসলাম' নারী সংগঠনের সক্রিয় সদস্য ছিলেন।[২৯]

আমরা জেনেছি, ১৯৪৬ সালে নোয়াখালীর ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সময়কালে মহাত্মা গান্ধী যখন আহ্বান জানিয়েছিলেন এবং গিয়েছিলেন দাঙ্গাবিধ্বস্ত মানুষের পাশে তখন আপনিও 'ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট' নামে সেবা প্রতিষ্ঠান গড়েছিলেন দাঙ্গা বিধ্বস্ত মানুষের কল্যাণে।[৩০]

রাজনৈতিক শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য, মানুষের কল্যাণের জন্য, ব্রিটিশদের শাসনমুক্ত হওয়ার স্বাধীনতার স্বপ্ন যখন সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার রক্তে ভেসে যাচ্ছিল, তখন আপনি ঢাকায় শান্তি কমিটি গড়ে তুললেন ১৯৪৭-এ। দেশভাগের পর আপনি কলকাতা থেকে ঢাকায় চলে আসেন। ঢাকায় সলিমুল্লাহ এতিমখানায় আশ্রিত কলকাতা থেকে সদ্য ঢাকায় আসা কবি সুফিয়া কামালকে (১৯১১-১৯৯৯) খুঁজে বের করে স্বামীবাগ-হাটখোলার 'তারাবাগ'-বাড়িতে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করে শান্তি কমিটির কাজে আহ্বান জানালেন। কবি লিখেছেন, 'যখন ঢাকায় এলাম, "নারী শিক্ষা মন্দির"-এর প্রতিষ্ঠাতা স্বনামধন্যা লীলা নাগ (লীলা রায়) আমাদের লীলাদি তখন হিন্দু মুসলমান মহিলাদের নিয়ে গড়ে তুলছেন "শান্তি কমিটি"। তাঁর

ডাকে তাঁর সাথে যোগ দিলাম। তখনকার দিনের এম.এল.এ আনোয়ারা খাতুন, ইনুদি, ডলিদি আরও অনেক মহিলা এসে ঢাকা শহরতলী ছাড়িয়ে দূর গ্রামবন্দর গঞ্জে শান্তি কমিটির কাজে যোগ দিলেন।... অসীম ধৈর্য ছিল লীলাদির। বলতেন ওদের সাথে না মিশলে, সমব্যথী না হলে ওরা আমাদের কথা শুনবে কেন? এই একটা শিক্ষা তাঁর কাছে পেয়েছি।'[৩১]

অথচ আপনি পারলেন না নিজের দেশে বাস করতে। পাকিস্তান সরকার ১৯৪৮ সালে আপনাকে দেশত্যাগে বাধ্য করেছিল। শ্রদ্ধেয় লীলা নাগ (রায়), আপনার কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা এবং রোকেয়া সাখাওয়াত হোসেনের কাছ থেকে পাওয়া শিক্ষা কবি সুফিয়া কামাল প্রোথিত করেছিলেন সেই সময়কালের কর্মকাণ্ডে এবং তা অব্যাহতভাবে চলেছে ১৯৫০-১৯৯৯ পর্যন্ত। এ সময়ের মধ্যে গঠিত নারী সংগঠনের সামাজিক-রাজনৈতিক আন্দোলনে এবং মুক্তিযুদ্ধকালীন কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্ত নারীকর্মী ও সংগঠকদের আপনার প্রতিষ্ঠিত চেতনাই পথ দেখিয়েছে।

আমরা নারী আন্দোলনের কর্মকাণ্ডে রাজনৈতিক বিপ্লবী আদর্শকে যুক্ত করে চলতে শিখেছি সেই শিক্ষা শিরোধার্য করে। আপনার কাছে আমরা ঋণী। সেই ঋণ স্বীকার করার লক্ষ্যেই এই স্মারক-লেখা আপনাকে উৎসর্গ করলাম।

সূত্র

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *গীতবিতান*, বিশ্বভারতী গ্রন্থবিভাগ, কলকাতা, অখণ্ড পুনর্মুদ্রণ, ১৩৭২, পৃ. ৫৭৭

২. *সুবর্ণজয়ন্তী*, শের-এ-বাংলা বালিকা মহাবিদ্যালয় (পূর্বতন নারীশিক্ষা মন্দির), ঢাকা

৩. 'লীলা নাগ পরিচিতি', *লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, (সম্পাদনা পরিষদ: অজয় রায় আহ্বায়ক, আনিসুজ্জামান, রঙ্গলাল সেন, মাহফুজা খানম, আবুল হাসনাত, মফিদুল হক) বিপ্লবী লীলা নাগ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন পরিষদ, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩

৪. আগমনী লাহিড়ী ও বিজয় কুমার নাগ, *শিখাময়ী লীলা রায়*, জয়শ্রী প্রকাশনী, কলিকাতা-৯, ১৯৯৯, পৃ. ৭৭

৫. দীপংকর মোহান্ত, *লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ১৯৯৯, পৃ. ১৮

৬. ড. রতন লাল চক্রবর্তী, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী* ১৯২১-১৯৫২, কল্যাণ প্রকাশন, ঢাকা, ২০০৬, পৃ. ১৭

উদ্ধৃতি: '১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠার বছরেই এখানে নারীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের সূচনা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইনে তথা Dacca University Act. 1920 (Act XVII of 1920) নীতিগতভাবে সহশিক্ষার বিষয়টি স্বীকৃত ছিল। এই আইনের ৫ নং ধারায় বলা হয়েছে যে, "The University shall be open to all persons of either sex and of whatever race, creed or class..." নীতিগতভাবে নারীর উচ্চশিক্ষা গ্রহণের বিষয়টি স্বীকৃত থাকলেও, বাস্তবে কোনো ব্যবস্থা ছিল না। প্রথম হতেই সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ঢাকা হল ও জগন্নাথ হলে ছাত্রদের আবাসিক সুযোগ

থাকলেও ছাত্রীদের জন্য কোনো সুবিধা বা আবাসিক পরিকাঠামো ছিল না। এতৎসত্ত্বেও ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষার আকাঙ্ক্ষা ও দাবী নিয়ে এগিয়ে আসেন দুজন নারী—লীলাবতী নাগ ও সুষমা সেনগুপ্ত। উভয় ভর্তিচ্ছু নারীর অদম্য আগ্রহ ও দৃঢ় মনোভাবের জন্য উপাচার্য পি.জে হার্টগ বাধ্য হয়েছিলেন তাঁদের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি ও অধ্যয়নের ব্যবস্থা করতে।'—রতনলাল চক্রবর্তী, প্রাগুক্ত।

৭. রঙ্গলাল সেন, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ছাত্রী বিপ্লবী লীলা নাগ*; বিপ্লবী লীলা নাগ জন্মশতবার্ষিকী উদ্‌যাপন পরিষদ সম্পাদিত, *লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা ২০০৩, পৃ. ২৩

৮. সৈয়দ বদরুদ্দিন হোসাইন, *বাংলার উজ্জ্বলতম অগ্নিকন্যা : লীলা নাগ*, লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪১

৯. *শিখাময়ী লীলা রায়*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১
এবং Uttara Chakraborty, Gertrude Mariam Wright (1918-1928) The Turbulent Days, In the Footsteps of Chandramulche, 125 Years of Bethune College, Kolkata, 2004, P.111

১০. প্রীতি চট্টোপাধ্যায়, লীলা, *জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ*, জয়শ্রী সুবর্ণ জয়ন্তী উদ্‌যাপন কমিটি, কলিকাতা, ১৯৮৩, পৃ. ৪০৩-৪০৫

১১. শিখাময়ী লীলা রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

১২. শিখাময়ী লীলা রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২

১৩. প্রাগুক্ত

১৪. লীলা রায়, *আমাদের রবীন্দ্রতর্পণ*, লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭৭

১৫. শিক্ষাময়ী লীলা রায়, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭

১৬. প্রভাতচন্দ্র নাগ, দিদিকে যেমনটি দেখেছি, *জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৩

১৭. সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, প্রদীপ, মশাল এবং অন্ধকার, *লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৮

১৮. পূর্ণেন্দু দস্তিদার, *বীরকন্যা প্রীতিলতা*, অনুপম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৮, পৃ. ৭০-৭১

১৯. মালেকা বেগম, *মুক্তিযুদ্ধে নারী*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, ২০১১
এবং Ayesha Banu, 'Feminism in Bangladesh: 1971-2000 voices from the Women's Movement' (অপ্রকাশিত পিএইচডি থিসিস), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ২০১৫

২০. চিন্মোহন সেহানবীশ, *রবীন্দ্রনাথ ও বিপ্লবী সমাজ*, বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, ১৩৯২, পৃ. ১২২, উদ্ধৃত, দীপংকর মোহান্ত, লীলা রায় ও বাংলার নারী জাগরণ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১

২১. লীলা রায়, *আমাদের রবীন্দ্র তর্পণ*, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮০

২২. নজরুল ইসলাম ও মেহেদী হাসান খান, *জনবিন্যাস : নারী ও নগর*, সংকলিত : সোনিয়া নিশাত আমিন সম্পাদিত, *ঢাকা নগর জীবনে নারী*, বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১০, পৃ. ৩৯

২৩. *জয়শ্রী*, সুবর্ণ জয়ন্তী সংখ্যা, প্রাগুক্ত, পৃ. ভূমিকা, ১০

২৪. সুনীল দাস, অনিল চন্দ্র ঘোষ, নিকুঞ্জ সেন, চঞ্চল শর্মা, বঙ্গেশ্বর রায় প্রমুখ। *জয়শ্রী সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ*, প্রাগুক্ত।

২৫. মুনতাসীর মামুন, *ঢাকা স্মৃতি বিস্মৃতির নগরী*, অখণ্ড, অনন্যা, ঢাকা, ২০১৫, পৃ. ৪৮০-৪৮৪

২৬. শিখাময়ী লীলা নাগ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৯

২৭. আশালতা সেন, *সেকালের কথা*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ফেব্রুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ১৯

২৮. সুহাসিনী দাস, *লীলা নাগকে যেমন দেখেছি*, লীলা নাগ শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮-১১১

২৯. শামিমা ইসলাম, *অনন্যা*, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৭২

৩০. সুহাসিনী দাস, প্রাগুক্ত।

৩১. সুফিয়া কামাল, *একালে আমাদের কাল*, সাজেদ কামাল সম্পাদিত, *সুফিয়া কামাল রচনা সংগ্রহ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ২০০২, পৃ. ৫৯২

পরিশিষ্ট ১

লীলা নাগ পরিচিতি

নাম	:	লীলাবতী নাগ/পরবর্তীকালে : লীলা নাগ বিবাহোত্তর কালে—লীলা রায়
জন্মতারিখ	:	২ অক্টোবর ১৯০০
জন্মস্থান	:	গোয়ালপাড়া শহর, আসাম (তখন পিতা গোয়ালপাড়া মহকুমার এস.ডি.ও)
মাতা	:	কুঞ্জলতা দেবী চৌধুরী
পিতা	:	গিরিশচন্দ্র নাগ; নিবাস : গ্রাম-পাঁচগাঁও, থানা : রাজনগর, জেলা : মৌলভীবাজার
আদি নিবাস	:	ঢাকার 'বারদি' গ্রাম
পিতৃপরিচয়	:	প্রথমে কটক র‍্যাভেনশ কলেজে দর্শনের অধ্যাপক; আইন ব্যবসা; আসাম সিভিল সার্ভিসে যোগদান। ১৯১৬ সালে অবসর গ্রহণের পর ঢাকায় বকশীবাজারে স্থায়ীভাবে বসবাস।

শিক্ষাজীবন

শৈশব	:	গোয়ালপাড়া শহর
প্রাথমিক	:	১৯০৭-১৯১১ ব্রাহ্ম স্কুল (কলিকাতা)
স্কুল শিক্ষা	:	১৯১১-১৯১৭ ইডেন গার্লস স্কুল, ঢাকা
১৯১৭	:	প্রবেশিকা : ১ম বিভাগ (বৃত্তিসহ)

কলেজ শিক্ষা

১৯১৯	:	মাধ্যমিক আর্টস, কলকাতা বেথুন কলেজ, ১ম বিভাগ (বৃত্তিসহ)
১৯২১	:	বিএ (ইংরেজিতে সম্মানসহ), কলকাতা বেথুন কলেজ (মেয়েদের মধ্যে ১ম, বৃত্তিসহ পদ্মাবতী স্বর্ণপদক লাভ)
১৯২১	:	ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ইংরেজি বিভাগে ১ম পর্বে ভর্তি
১৯২৩	:	এম.এ (ইংরেজি), ২য় শ্রেণি
১৯৩৯	:	সহপাঠী ও সহযোদ্ধা দার্শনিক-বিপ্লবী অনিল রায়ের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ।

কর্মজীবন

১৯২১-২২ : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী অবস্থাতেই নারী শিক্ষা, নারী অধিকার আন্দোলনে জড়িয়ে পড়েন। নারীদের ভোটাধিকার আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন, নিখিল বঙ্গীয় ভোটাধিকার কমিটির সহ-সম্পাদিকা নির্বাচিত হন। উত্তরবঙ্গে ভয়াবহ বন্যায় (১৯২২) দুস্থ মানবতার সেবায় আত্মনিয়োগ— এ উদ্দেশ্যে 'ঢাকা মহিলা কমিটি' গঠন।

বিপ্লবী অনিল রায়ের উদ্যোগে গোপন বিপ্লবী সংস্থা 'শ্রীসংঘ' গঠিত হলে ১ম নারী সদস্য হিসেবে যোগদান।

১৯২৩ : ঢাকায় 'দীপালী সংঘ' নামে নারী সংগঠন প্রতিষ্ঠা। লক্ষ্য—'ঘুমন্ত অর্ধচেতন নারী সমাজের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি ও নারীদের অধিকার সচেতন করে তোলা'।

দীপালী সংঘের উদ্যোগে 'দীপালী হাই স্কুল' প্রতিষ্ঠা; বর্তমানে এটি 'কামরুন্নেসা হাই স্কুল' নামে পরিচিত (অভয় দাস লেন), ঢাকা।

১৯২৪ : দীপালী সংঘের উদ্যোগে আরও একটি বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন। এ প্রসঙ্গে তাঁর উক্তি, '... বর্তমান যুগে নারী শিক্ষার প্রয়োজন রহিয়াছে; কিন্তু সুযোগ ও ব্যবস্থার অভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। বিদ্যালয়ে স্থানাভাবহেতু বহু বালিকার শিক্ষা লাভে বঞ্চিত থাকিতে হইতেছে। এই অভাব দূর করার আকাঙ্ক্ষায় ১৯২৪ সালে আর একটি উচ্চ বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। এই কার্যে বহু অর্থ ও অবৈতনিক সাহায্য দানে দীপালী সংঘ বিশেষ সহায়তা দান করিয়াছে।'

১৯২৬ : 'দীপালী ছাত্রী সংঘ' প্রতিষ্ঠা ও কলকাতায় এর কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ। রবীন্দ্রনাথের ঢাকা আগমন (৭ ফেব্রুয়ারি ১৯২৬) ও দীপালী সংঘ পরিদর্শন।

১৯২৮ (২ ফেব্রুয়ারি) : লীলা নাগের অনন্য কীর্তি ভিন্নধর্মী বিদ্যানিকেতন 'নারী শিক্ষা মন্দির' প্রতিষ্ঠা। এখানে তিনি মহিলাদের 'বয়স্ক শিক্ষা' ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। বয়স্ক মহিলাদের শিক্ষা সহায়তা দানের জন্য এখানে ছিল বেশ কয়েকটি বিশেষ বিভাগ : সংস্কৃতি বিভাগ, কোচিং বিভাগ, শিল্প বিভাগ, আশ্রয় বিভাগ...। বর্তমানে এটি শের-এ-বাংলা মহিলা মহাবিদ্যালয় নামে পরিচিত।

১৯৩০ : কলকাতায় দীপালী সংঘের কর্মকাণ্ডের সম্প্রসারণ এবং এর উদ্যোগে সেখানে 'দীপালী শিক্ষা মন্দির' স্থাপন।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড

১৯২৪ : অনিল রায় প্রতিষ্ঠিত বিপ্লবী ও সমাজসেবী সংগঠন 'শ্রীসংঘের' কার্যক্রমে অংশগ্রহণের মধ্য দিয়ে রাজনৈতিক ও বিপ্লবী জীবনের শুরু।

১৯২৮ : সাইমন কমিশন-বিরোধী হরতাল কর্মসূচিতে ঢাকার মহিলা মিছিলে নেতৃত্ব দান।

কলকাতায় জাতীয় কংগ্রেস অধিবেশনে যোগদান; 'মহিলা কংগ্রেস' গঠনে নেতৃত্ব দান—সুভাষ বসুর সান্নিধ্য লাভ ও তাঁর আদর্শে উদ্বুদ্ধ হওয়া।

১৯২৯ : অনিল রায় আত্মগোপনে যেতে বাধ্য হলে 'শ্রীসংঘে'র নেতৃত্ব গ্রহণ; সংঘের বিপ্লবী ও রাজনৈতিক কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি, অস্ত্র সংগ্রহ ইত্যাদি কাজে আত্মনিয়োগ।

১৯৩০ : মহাত্মা গান্ধীর ডাকে সত্যাগ্রহ আন্দোলনে যোগদান; ঢাকায় আশালতা সেনের সঙ্গে 'মহিলা সত্যাগ্রহ কমিটি' গঠন।

১৯৩১ : লীলা নাগের উদ্যোগে ও সম্পাদনায় *জয়শ্রী* মাসিক পত্রিকা প্রকাশ (১ম সংখ্যা বৈশাখ ১৩৩৮) : এতে লেখা হয়—'নববর্ষে এই নূতন প্রচেষ্টা আরম্ভ করিলাম। বাংলায় মহিলাদের মুখপত্র স্বরূপ কোনো পত্রিকা এ পর্যন্ত ছিল না; এই অভাব দূর করিবার প্রয়াসে জয়শ্রী প্রকাশিত হইল।'

১৯৩১ (২৮ অক্টোবর) : *জয়শ্রী* পত্রিকা অফিসে পুলিশি আক্রমণ; সম্পাদককে সতর্কীকরণ।

১৯৩১ (২০ ডিসেম্বর) থেকে ১৯৩৮ : বিপ্লবী কাজের জন্য গ্রেপ্তার। কারাবাস (ঢাকা, রাজশাহী, সিউড়ি, মেদিনীপুর, হিজলি জেলে); কারা কর্তৃপক্ষের অন্যায়ের বিরুদ্ধে সব সময় ছিলেন প্রতিবাদমুখর; হিজলি জেলে কয়েক দিন অনশনও করেছিলেন।

১৯৩৫-১৯৩৮ : *জয়শ্রী* পত্রিকা প্রকাশ নিষিদ্ধ

১৯৩৮ (৮ আগস্ট) : মুক্তি লাভ

১৯৩৮ : *জয়শ্রী* পত্রিকার পুনঃপ্রকাশ

কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্র বসু কর্তৃক গঠিত 'ন্যাশনাল প্ল্যানিং কমিটি'তে মহিলা উপসমিতিতে সদস্য নির্বাচিত।

১৯৩৯ : কংগ্রেসের অভ্যন্তরে সুভাষ বসু কর্তৃক বামপন্থীদের নিয়ে 'ফরওয়ার্ড ব্লক' গঠনে অংশগ্রহণ ও যোগদান।

ফরওয়ার্ড ব্লক পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব গ্রহণ।

১৯৪০ (জুলাই) : অনিল রায় ও লীলা নাগ কলকাতায় গ্রেপ্তার ও আগস্ট মাসে মুক্তি।

১৯৪১ (২৬ জুন) : সুভাষ বসুর দেশত্যাগ ও ফরওয়ার্ড ব্লক পরিচালনায় লীলা নাগকে যথাযথ নির্দেশ দান।

১৯৪২ : *জয়শ্রী* পত্রিকার প্রকাশ পুনরায় নিষিদ্ধ। দিনাজপুর জেলে পুনরায় কারারুদ্ধ। আজাদ হিন্দ ফৌজের সঙ্গে গোপন সংযোগ স্থাপন।

১৯৪৬ : যুদ্ধ শেষে কারাগার থেকে মুক্তি লাভ।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে কলকাতা, ঢাকা ও নোয়াখালীতে ব্যাপক কর্মকাণ্ডে অংশগ্রহণ; দাঙ্গা রোধে 'ন্যাশনাল সার্ভিস ইনস্টিটিউট' নামে স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলা।

১৯৪৭ : দেশ বিভাগের পর পূর্ব পাকিস্তানে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত; নতুন পরিস্থিতিতে নয়া কর্মসূচি প্রণয়ন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে দেশত্যাগ না করায় উদ্বুদ্ধকরণ। মহিলাদের উন্নয়নের লক্ষ্যে তাদের সংগঠিত করার চেষ্টায় আত্মনিয়োগ—এ উদ্দেশ্যে বেগম সুফিয়া কামালের সাথে 'পূর্ব পাকিস্তান মহিলা সমিতি' গঠন।

১৯৪৯ : তৎকালীন পাকিস্তান সরকার কর্তৃক সৃষ্ট পরিস্থিতিতে বাধ্য হয় 'পূর্ব পাকিস্তান' ত্যাগ।

১৯৫০-আমৃত্যু	:	পশ্চিমবঙ্গের জনগণ, বিশেষ করে পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তুদের সমস্যা সমাধানে, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে এবং ভারতীয় রাজনীতিতে অব্যাহত অংশগ্রহণ। *জয়শ্রী* পত্রিকার অব্যাহত প্রকাশ ও সম্পাদনা।
১৯৫২	:	স্বামী অনিল রায়ের মৃত্যুবরণ।
১৯৫৩	:	জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত 'প্রজা সোসালিস্ট পার্টি'তে যোগদান।
১৯৭০, ১১ জুন	:	মৃত্যুবরণ।
সংকলিত	:	বিপ্লবী লীলা নাগ জন্মশতবার্ষিকী উদযাপন পরিষদ সম্পাদিত, *লীলা শতবর্ষের শ্রদ্ধাঞ্জলি*, সাহিত্য প্রকাশ, ঢাকা, ২০০৩, পৃ. ১৭-১৯

বই আলোচনা

এক তরুণ শিক্ষকের অ্যাকটিভিস্ট হয়ে ওঠার গল্প

মহিউদ্দিন আহমদ

আনট্রাঙ্কুইল রিকালেকশনস : দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট—
রেহমান সোবহান, সেইজ, দিল্লি : ২০১৬

আমাদের সমাজ রাজনীতিময়। একটি ঔপনিবেশিক বা উপনিবেশ-উত্তর সমাজের হয়তো এটাই বৈশিষ্ট্য। রাজনীতিবিদেরা এ দেশে পালাবদলের প্রক্রিয়ায় চালকের আসনে থাকেন। অনেকে তারকাখ্যাতি পেয়ে যান। কেউ কেউ হয়ে যান মহাতারকা বা মেগাস্টার। রাজনীতির বাইরে অন্যান্য স্রোতোধারা থেকে যায় অলক্ষ্যে।

গত শতাব্দীর ষাটের দশকে এটা মোটামুটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় পূর্ব পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণে কার্যকর অংশগ্রহণের সুযোগ নেই। পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্য যেমন বাড়ছিল, তেমনি বিস্তৃত হচ্ছিল মানসিক বিচ্ছিন্নতা। শেখ মুজিবের ছয় দফা কর্মসূচি একটা স্ফুলিঙ্গ তৈরি করল এবং তা দাবানলের মতো ছড়িয়ে পড়ল। এর পটভূমি তৈরি হয়েছিল একদল অর্থনীতিবিদের মিলিত চেষ্টায়। এর ফলে পাকিস্তানের দুই প্রদেশের মধ্যকার সম্পর্কে কাঠামোগত পরিবর্তনের দাবি উচ্চারিত হয়েছিল।

অর্থনীতিবিদদের উপলব্ধি ছিল, পাকিস্তানের অর্থনীতি দুই প্রদেশে দুই রকম। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পেছনে যেমন দ্বিজাতিতত্ত্বের একটা ভূমিকা ছিল, বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পেছনে তেমনই ছিল দ্বি-অর্থনীতির তত্ত্ব। এই তত্ত্বের বীজ বোনা হয়েছিল পঞ্চাশের দশকের মাঝামাঝি, যা পরবর্তী ১০ বছরে ডালপালা ছড়িয়ে পরিণত হয়েছিল আকাঙ্ক্ষার বিশাল মহিরুহে। ইতিহাসের এই প্রচ্ছন্ন অধ্যয়নই উঠে

এসেছে অধ্যাপক রেহমান সোবহানের সাম্প্রতিক গ্রন্থে। দিল্লি থেকে প্রকাশিত বইটির নাম *আনট্রাক্কইল রিকালেকশনস: দ্য ইয়ারস অব ফুলফিলমেন্ট*। বইটি একই সঙ্গে স্মৃতিকথা, আত্মজীবনী এবং ইতিহাস।

২.

রেহমান সোবহান জন্মেছিলেন সোনার চামচ মুখে নিয়ে। ব্যক্তিগত ক্যারিয়ার ও ক্যারিশমার পেছনে ছুটলে তিনি হতে পারতেন একজন বড় শিল্পপতি। পারিবারিক সূত্রেই তিনি ঢাকা ট্যানারিজের মালিক হয়েছিলেন। রায় বাহাদুর রণদাপ্রসাদ সাহাকে সঙ্গে নিয়ে এটা প্রতিষ্ঠা করেছিলেন তাঁর বাবা খন্দকার ফজলে সোবহান। ওই সময় এটাই ছিল পূর্ব পাকিস্তানের সবচেয়ে বড় ট্যানারি। কারখানা ছিল হাজারীবাগে। ১৯৫৭ সালে কেমব্রিজ থেকে ঢাকায় ফিরে তিনি এই প্রতিষ্ঠানে তাঁর বাবার ৫১ শতাংশ শেয়ারের দায়িত্ব নেন। যেদিন তিনি প্রথম কারখানাটি দেখতে যান, তাঁর মনে হয়েছিল, 'একজন পাপী জাহান্নামে প্রবেশ করছে'। পরে তিনি এটা বিক্রি করে দিয়েছিলেন। তিনি যদি এখনো এটা চালাতেন, তাহলে তাঁকে হয়তো ঢাকা আর সাভারে শাটল কর্কের মতো আসা-যাওয়া করে জেরবার হতে হতো। বেচে দিয়ে তিনি বেঁচে গেছেন। ধাতে সয়নি বলেই তিনি শিল্পপতি হতে পারেননি।

দার্জিলিংয়ের সেন্ট পলস স্কুল, লাহোরের এচিসন কলেজ ও কেমব্রিজের মতো বনেদি প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনার সুবাদে তিনি বিদেশেই থিতু হতে পারতেন কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে বা করপোরেশনে। তাঁর বাবা করাচির বাসিন্দা হয়েছিলেন, করাচি ইমপ্রুভমেন্ট ট্রাস্টের চেয়ারম্যান হিসেবে। রেহমান সোবহান কিন্তু ঠিকানা হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন ঢাকা, যেখানে তিনি আগে কখনো থাকেননি। মাতৃভাষা বাংলা না হওয়া সত্ত্বেও বাংলা ও বাঙালির জন্য উৎসর্গ করেছেন তাঁর জীবন এবং সব কর্মযজ্ঞ। তিনি অনেক বাঙালির চেয়েও অনেক বেশি বাঙালি।

৩.

১৯৪০ সালের মার্চে লাহোরে মুসলিম লীগের সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবের আলোকে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের একটি রূপরেখা তৈরির চেষ্টা ছিল পঞ্চাশের দশকের গোড়া থেকেই। ১৯৫০ সালে ঢাকায় অনুষ্ঠিত রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের এক সম্মিলনী সভায় 'ইউনাইটেড স্টেটস অব পাকিস্তান'-এর কাঠামোয় কেন্দ্রীয় সরকারের হাতে প্রতিরক্ষা ও পররাষ্ট্র দপ্তর ছাড়া বাকি সব বিষয় প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছেড়ে দেওয়ার প্রস্তাব করা হয়েছিল।[১] এরই ধারাবাহিকতায় ১৬ বছর পরে রচিত হয়েছিল ছয় দফা। ছয় দফা হঠাৎ করে

আসমান থেকে পড়েনি। দীর্ঘদিন ধরে স্বায়ত্তশাসনের দাবি ও ধারাবাহিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এর তাত্ত্বিক ভিত্তি তৈরি হয়েছিল। ১৯৫৩ সালের শেষের দিকে গঠিত যুক্তফ্রন্টের ২১ দফা দাবির ১৯ নম্বর দফায় আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সংক্ষিপ্ত রূপ দেওয়া হয়েছিল। একই সঙ্গে তৈরি হয়েছিল রাজনীতিবিদদের সঙ্গে অর্থনীতিবিদদের যুগলবন্দি, স্বাধিকারের দাবিতে যাঁরা এক মোহনায় মিশেছিলেন।

১৯৬৪ সালের ৫ জুন ১১ দফা দাবির ভিত্তিতে আওয়ামী লীগের যে মেনিফেস্টো লেখা হয়, তাতে ছয় দফার কথাগুলো বলা হয়েছিল। সঙ্গে অন্যান্য দাবিও ছিল। ছয় দফা এসেছে ধীরে ধীরে, ধাপে ধাপে। সময়ের সঙ্গে দাবিগুলো আরও পরিমার্জিত হয়েছে, স্পষ্টতর হয়েছে। এর সঙ্গে সমান্তরালভাবে উঠে এসেছিল 'দুই অর্থনীতি'র তত্ত্ব। তত দিনে এটা পরিষ্কার হয়ে গেছে যে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে কেন্দ্রীয়ভাবে নিয়ন্ত্রিত সনাতন ধারার অর্থনৈতিক পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে পূর্ব-পশ্চিমের দূরত্ব কমানো যাবে না। এ জন্য দুই প্রদেশের অর্থনীতির স্বতন্ত্র গতি-প্রকৃতিকে বিবেচনায় নিতে হবে।

৪.

পাকিস্তানের দুই অংশে যে দুটো অর্থনীতি বিরাজমান, এই ধারণা প্রথম তোলা হয় ১৯৫৬ সালে। পাকিস্তানের প্রথম পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনার (১৯৫৬-৬০) জন্য উন্নয়ন কৌশল তৈরির লক্ষ্যে পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতিবিদেরা ১৯৫৬ সালের ২৪-২৮ আগস্ট একটি সম্মেলনের আয়োজন করেছিলেন। সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগ ও পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ডের যৌথ উদ্যোগে। এতে বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের অর্থনীতির শিক্ষক এবং পরিকল্পনা বোর্ডের অর্থনীতিবিদেরা অংশ নেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগের অধ্যাপক মাজহারুল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনের শেষে বিভিন্ন অধিবেশনের আলোচনার সারসংক্ষেপ ও সুপারিশ নিয়ে একটি প্রতিবেদন তৈরি করা হয়। এতে স্পষ্টভাবে বলা হয়, পাকিস্তানকে একটি 'দুই অর্থনীতির' দেশ হিসেবে বিবেচনা করতে হবে। কিছু কিছু ক্ষেত্রে, যেমন অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক সম্পদ জোগাড়ের বিষয়টি একক অর্থনীতির আওতায় থাকলেও দুই প্রদেশের আলাদা বৈশিষ্ট্যগুলো ধরেই পরিকল্পনা তৈরির কাজটি করতে হবে।

এই প্রতিবেদনে স্বাক্ষর দিয়েছিলেন এম এন হুদা, মাজহারুল হক, আবদুর রাজ্জাক, নূরুল ইসলাম, আবদুস সাদেক, আবদুল্লাহ ফারুক, এ এন এম মাহমুদ, সাইফুল্লাহ, মো. হোসেন ও শফিকুর রহমান। সম্মেলন শেষ হওয়ার আগেই ঢাকা ছেড়ে চলে যাওয়ার কারণে এ এফ এ হোসেন, এম টি হক ও সাখাওয়াত হোসেন স্বাক্ষর দিতে পারেননি, যদিও তাঁরা এই প্রতিবেদনের সঙ্গে একমত ছিলেন।

পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতির সম্পাদক এম এন হুদা স্বাক্ষরিত এই প্রতিবেদনটিই দুই অর্থনীতির ওপর এ দেশের বুদ্ধিজীবীদের প্রথম আনুষ্ঠানিক বিবৃতি। পাকিস্তান অর্থনীতি সমিতি এবং পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা বোর্ডের প্রধান অর্থনীতিবিদের নামে বিবৃতিটি প্রচার করা হয়।[২]

বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনের রাজনৈতিক ধারার সূচনা হয়েছিল আরও পরে, যা বেগবান হয় ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে ছয় দফা প্রকাশের পর। এর ১০ বছর আগেই এ দেশের অর্থনীতিবিদেরা তার প্রেক্ষাপট তৈরি করেছিলেন। অর্থনীতিবিদদের এই যাত্রায় পরে আরও অনেকের মতো শামিল হয়েছিলেন রেহমান সোবহান। দুই অর্থনীতির তত্ত্বসংবলিত প্রতিবেদনটি প্রকাশের বছর খানেকের মধ্যেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষক হিসেবে যোগ দেন। স্বাতন্ত্র্যবোধ আর স্বাধিকারের যে মশালটি হুদা, হক, রাজ্জাক, ইসলামরা জ্বালিয়েছিলেন, রেহমান দ্রুতই সেই মিছিলে শরিক হন।

৫.

রাজনীতি আগে না অর্থনীতি আগে, এ অতি পুরোনো তর্ক। ১৮৫৯ সালে জার্মান ভাষায় প্রকাশিত 'জুর ক্রিটিকাদের পলিটিশেন ওকোনোমি' (আ কন্ট্রিবিউশন টু দ্য ক্রিটিক অব পলিটিক্যাল ইকোনমি) প্রবন্ধের ভূমিকায় কার্ল মার্ক্স বলেছেন, অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিভিন্ন পর্যায়ে সমাজে নানা ধরনের উৎপাদন সম্পর্ক তৈরি হয়, যা মানুষের ইচ্ছা-নিরপেক্ষ। উৎপাদন সম্পর্কের সমষ্টিগত অবস্থানই অর্থনীতির কাঠামো নির্ণয় করে। এর ওপর গড়ে ওঠে আইনগত ও রাজনৈতিক উপরিকাঠামো। মোদ্দা কথা, অর্থনীতিই রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করে।[৩] মার্ক্সের ইকোনমিক ডিটারমিনিজম তত্ত্বের সূত্রপাত এখান থেকেই।

ইউরোপের অনেক অর্থনীতিবিদ মার্ক্সের এই তত্ত্বকে অসার বলে উড়িয়ে দেন। মার্ক্সের নিজের লেখায়ও এ নিয়ে স্ববিরোধিতা লক্ষ করা যায়। তবে এই তত্ত্ব একেবারে উপেক্ষাও করা যায় না। বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গেলে নিশ্চিতভাবেই এই অঞ্চলের মানুষের ওপর পাকিস্তানি রাষ্ট্রব্যবস্থার চাপিয়ে দেওয়া নীতির প্রসঙ্গটি চলে আসে। অর্থনৈতিক বঞ্চনা ও বৈষম্য কীভাবে পূর্ব পাকিস্তানের মানুষের মনে ধীরে ধীরে পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল, তা আজ আর কেউ অস্বীকার করেন না। অর্থনৈতিক বঞ্চনা থেকে উৎসারিত হয়েছিল নীতিনির্ধারণে কার্যকর অংশগ্রহণের দাবি। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ এবং জাগরণ, যা একটা জাতিরাষ্ট্র গঠনের অনিবার্য উপাদান হিসেবে কাজ করেছিল। নানা তথ্য-উপাত্ত দিয়ে অর্থনৈতিক বৈষম্যের খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেই দাঁড় করানো হয়েছিল দুই অর্থনীতির তত্ত্ব।

৬.

রেহমান সোবহান এই বইয়ে তাঁর জীবনের নানা পর্যায় একটু একটু করে মেলে ধরেছেন। তাঁর বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও চিন্তাচর্চার ক্ষেত্রে কেমব্রিজের আবহ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিল, এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাঁর কাছাকাছি বয়সের ফুফাতো ভাই কামাল হোসেন সম্পর্কে কিছু তথ্য পাওয়া যায় তাঁর বইয়ে। কামাল হোসেন যুক্তরাষ্ট্রের ইন্ডিয়ানা রাজ্যের নটরডেম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মাত্র ১৮ বছর বয়সে অর্থনীতির স্নাতক হন। মিশিগান বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতিতে এমএ পড়ার জন্য তিনি বৃত্তিও পেয়েছিলেন। কিন্তু তত দিনে তাঁর মন বদলে গেছে। তিনি অক্সফোর্ডের কুইন্স কলেজে আইনশাস্ত্র পড়তে চলে আসেন।

রেহমান সোবহান কেমব্রিজে পড়ার সময় আরও কয়েকজনের সান্নিধ্যে আসেন, যাঁরা পরে নানা বিষয়ে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। এঁদের মধ্যে ছিলেন আবদুস সালাম (পদার্থবিদ্যায় নোবেলজয়ী বিজ্ঞানী), মাহবুব উল হক (ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন প্রতিবেদনের অন্যতম পথিকৃৎ), অমর্ত্য সেন (নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ) প্রমুখ। দক্ষিণ এশীয় ছাত্রছাত্রীদের একটা সমিতি ছিল। নাম কেমব্রিজ মজলিস। রেহমান এর সভাপতি হয়েছিলেন। তাঁর কমিটির সম্পাদক ছিলেন দিলীপ আধারকার এবং কোষাধ্যক্ষ ছিলেন অমর্ত্য সেন। এই মজলিস থেকে তাঁরা সংবর্ধনা দিয়েছিলেন খ্যাতনামা ভারতীয় পরিসংখ্যানবিদ পি সি মহলানবিস, *নিউ স্টেটসম্যান*-এর সম্পাদক কিংসলে মার্টিন ও ব্রিটিশ কমিউনিস্ট পার্টির নেতা রজনী পাম দত্তকে। ওই সময় অক্সফোর্ড মজলিসের সভাপতি ছিলেন কামাল হোসেন এবং বরুণ দে ছিলেন সম্পাদক।

রেহমান করাচি ফিরে আসেন ১৯৫৬ সালের অক্টোবরে। কেমব্রিজে থাকা অবস্থায় পেশোয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ে ৮০০ টাকা বেতনে অর্থনীতি বিভাগে রিডার (সহযোগী অধ্যাপক) হিসেবে যোগ দেওয়ার জন্য প্রস্তাব পেয়েছিলেন। কিন্তু তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন ঢাকায় থাকবেন। ঢাকায় আসেন ১৯৫৭ সালের জানুয়ারি মাসে। বয়স তখন ২১। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক সরকার চালাচ্ছে আওয়ামী লীগ।

রেহমান পাকিস্তান পরিকল্পনা কমিশনে চাকরির জন্য আবেদন করেছিলেন। চাকরি পেলে তাঁকে করাচি থাকতে হতো। চাকরির সাক্ষাৎকারে তিনি বলেন, তিনি ঢাকায় থাকতে চান। তাঁকে পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ডে যোগ দেওয়ার পরামর্শ দেওয়া হলো। মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান প্রশাসন ও পরিকল্পনা তৈরিতে আমলাদের প্রভাব কমানোর জন্য পরিকল্পনা বোর্ডে কয়েকজন শিক্ষাবিদকে নিয়ে এসেছিলেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপক এম এন হুদা, একই বিশ্ববিদ্যালয়ের কমার্সের অধ্যাপক এ এফ এ হোসেন এবং

রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক আবদুর রাজ্জাক। বোর্ডের সহকারী প্রধান অর্থনীতিবিদ ছিলেন মোশাররফ হোসেন। মোশাররফ হোসেনের সঙ্গে রেহমান সোবহানের সখ্য হলো এবং তখন থেকেই ঢাকায় মোশাররফ হলেন রেহমানের 'গডফাদার'। মোশাররফ তখন তাঁর ফিনল্যান্ডের স্ত্রী ইনিরাকে নিয়ে নবাবপুর রোডের লাগোয়া লালচান মুকিম লেনে একটা ভাড়াবাড়িতে থাকতেন। আড়ম্বরহীন জীবন। আবদুর রাজ্জাক ছিলেন মোশাররফের শিক্ষক। সব সময় 'স্যার' বলতেন। সেই থেকে আবদুর রাজ্জাক রেহমানেরও স্যার হয়ে গেলেন। এই গুরু-শিষ্য সম্পর্ক শেষ পর্যন্ত বজায় ছিল।

প্ল্যানিং বোর্ডের অফিস ছিল সচিবালয়ে। রেহমান সোবহান ছয় মাস ঘোরাঘুরি করলেন। কখনো হাজারীবাগের 'জাহান্নামে' যান ট্যানারি দেখতে, নাকে-মুখে রুমাল চেপে। কখনো যান সচিবালয়ে চাকরির খোঁজখবর নিতে। তাঁর জুতোর সুকতলা ক্ষয় হয়ে যাওয়ার জোগাড়। দুই হাজার টাকা দিয়ে একটা সেকেন্ডহ্যান্ড গাড়ি কিনলেন। কিন্তু ঘোরাঘুরিই সার হলো। চাকরি জুটল না। অধ্যাপক এম এন হুদার পরামর্শে শেষমেশ যোগ দিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে, সিনিয়র লেকচারার (অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর) পদে। কেমব্রিজের ডিগ্রি থাকায় এই পদে সরাসরি নিয়োগ পেতে সুবিধা হয়েছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তাঁর যোগ দেওয়ার তারিখটা ছিল ১৯৫৭ সালের ২৬ অক্টোবর। শুরু হলো তাঁর জীবনের নতুন এক অধ্যায়। সহকর্মী হিসেবে পেলেন রিডার নুরুল ইসলামকে। অক্টোবরে আরও কয়েকজন তরুণ একই বিভাগে যোগ দিলেন লেকচারার পদে। তাঁদের মধ্যে ছিলেন আনিসুর রহমান, মকসুদ আলী, মুজাফফর আহমদ, মহিউদ্দিন আহমদ, মাহফুজুল হক প্রমুখ। দীর্ঘ পথপরিক্রমায় তাঁরা অনেকেই একসঙ্গে ছিলেন, একই লক্ষ্যে কাজ করেছেন। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের হাল ধরে প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবুর রহমান যখন পরিকল্পনা কমিশন পুনর্গঠন করেন, তখন তাঁর যাত্রা শুরু হয়েছিল নুরুল ইসলাম, রেহমান সোবহান, আনিসুর রহমান, মুজাফফর আহমদ ও মোশাররফ হোসেনের হাত ধরে। তাঁদের হাতেই তৈরি হয়েছিল বাংলাদেশের প্রথম পাঁচসালা পরিকল্পনা (১৯৭৩-৭৮)।

৭.

আমাদের রাজনৈতিক ইতিহাসের অন্যতম পুরোধা ব্যক্তিত্ব খাজা নাজিমুদ্দিন সম্পর্কে কিছু তথ্য দিয়েছেন রেহমান সোবহান। নাজিমুদ্দিন সম্পর্কে রেহমানের নানা। নাজিমুদ্দিন ১৯৪৩-৪৬ সালে অখণ্ড বাংলার প্রধানমন্ত্রী ছিলেন। ১৯৫৭ সালে দেশভাগের সময় তিনি বঙ্গীয় আইন পরিষদে সোহরাওয়ার্দীকে হারিয়ে মুসলিম লীগ সংসদীয় দলের নেতা এবং সেই সুবাদে পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম

মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রথম গভর্নর জেনারেল মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের ১১ সেপ্টেম্বর মারা গেলে তিনি পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল হন। ১৯৫১ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আততায়ীর গুলিতে নিহত হলে নাজিমুদ্দিনকে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী করা হয়।

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার জন্মলগ্ন থেকেই দেশটি প্রাসাদ ষড়যন্ত্রের খপ্পরে পড়ে। এর অন্যতম শিকার নাজিমুদ্দিন নিজেই। ১৯৫৩ সালের এপ্রিল মাসে গভর্নর জেনারেল গোলাম মোহাম্মদ প্রধানমন্ত্রীর পদ থেকে তাঁকে বরখাস্ত করেন। ঢাকায় ফিরে আসেন তিনি। ঢাকায় নাজিমুদ্দিনের নিজের কোনো বাড়ি ছিল না। তিনি ময়মনসিংহ রোডে ছোট ভাই খাজা শাহাবুদ্দিনের বাড়িতে উঠেছিলেন। ওই পর্যায়ের একজন রাজনীতিবিদের নিজস্ব বাড়ি নেই, এটা ভাবতেও অবাক লাগে। রাজনীতির মাঠে যাঁরা সক্রিয়, তাঁদের কেউ কেউ রাজনীতির কারণে বাড়িঘর কিংবা সহায়-সম্পত্তি হারিয়েছেন। আবার রাজনীতি করে অনেকেই বাড়ি এবং সম্পদের মালিক হয়েছেন। কী নিদারুণ বৈপরীত্য!

নানা খাজা নাজিমুদ্দিনের সৌজন্যেই রেহমান সোবহানের সঙ্গে রাজনীতির উদীয়মান তারকা শেখ মুজিবুর রহমানের প্রথম সাক্ষাৎপর্বটি সম্পন্ন হয়েছিল। এটা ১৯৫৭ সালের জুন মাসের কথা। নাজিমুদ্দিন তাঁর ভাইয়ের বাড়িতে মুখ্যমন্ত্রী আতাউর রহমান খান এবং আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানকে নৈশভোজের আমন্ত্রণ জানান। রাজনৈতিক মতপার্থক্য এবং বিরোধ থাকা সত্ত্বেও তাঁদের মধ্যে সৌজন্য ও বিনয়ের কোনো ঘাটতি ছিল না। তাঁরা দুজনই দাওয়াত কবুল করেছিলেন। ভোজসভাটিও ছিল জাঁকজমকে ভরা। অতিথিদের মধ্যে রেহমান সোবহানও ছিলেন। শেখ মুজিব ও রেহমান সোবহানের অলক্ষ্যেই নিয়তি তাঁদের দুজনকে এক সুতোয় গেঁথেছিল।

ঢাকা ট্যানারিজের অফিস ছিল আরমানিটোলায়। কাছেই রূপমহল সিনেমা হল। সেখানে মাওলানা ভাসানী সম্মেলন ডেকেছেন। তিনি ইতিমধ্যে আওয়ামী লীগের সভাপতির পদ ছেড়ে দিয়েছেন। কৌতূহলবশেই রেহমান গেলেন সম্মেলন দেখতে ও বক্তৃতা শুনতে। দেখলেন সম্মেলনস্থলের বাইরে জনৈক মাহবুবুর রহমান মুসলিম লীগের কিছু গুন্ডাপান্ডা নিয়ে চিৎকার-চেঁচামেচি করছে। ছাত্রলীগের কিছু নেতা-কর্মীকেও দেখলেন হইচই করছে। ওরা স্লোগান দিচ্ছে—ভাসানী গুন্ডা ভারতের দালাল। পুরো ব্যাপারটির নেপথ্যের আয়োজক ছিলেন এনএসএফের প্রতিষ্ঠাতা এ আর ইউসুফ। এ সময় আজাদ পাকিস্তান পার্টির নেতা মিয়া ইফতেখারউদ্দিন এলেন একটা গাড়িতে করে। তাঁর গাড়ির ওপর লাঠির বাড়ি পড়তে লাগল। তিনি গাড়ি থেকে যেই নামতে যাবেন, একটা লাঠির বাড়ি এসে পড়ল তাঁর হাঁটুর ওপর। গাড়ির চালক বুদ্ধি করে তাঁকে জোর করে গাড়িতে

ঢুকিয়ে সোজা চলে এলেন হোটেল শাহবাগে। মিয়া সাহেব এই হোটেলেই উঠেছেন। রাতে তাঁকে দেখতে গেলেন রেহমান। এচিসন কলেজ ও কেমব্রিজে পড়ার সুবাদে তিনি মিয়া সাহেবকে আগে থেকেই চিনতেন। তাঁর হাঁটু বেশ ফুলে উঠেছে। কিন্তু মিয়া সাহেব নির্বিকার। তাঁর মন্তব্য ছিল, রাজনীতিতে এমনটা হয়। একটু পর সেখানে এলেন শেখ মুজিব। মিয়া সাহেবের খোঁজ নিতে এসেছেন। মিয়া সাহেব বাম রাজনীতির লোক। এখন ভাসানীর দিকে ঝুঁকেছেন। রাজনৈতিক শত্রুতা শেখ মুজিবের কাছে সৌজন্য প্রকাশে বাধা হয়ে দাঁড়ায়নি। এমনটাই ছিল ওই সময়ের রাজনীতি। রেহমান সোবহানকে সেখানে দেখে শেখ মুজিব অবাক হলেন। রেহমান তাঁকে মনে করিয়ে দিলেন, খাজা নাজিমুদ্দিনের দেওয়া নৈশভোজে তাঁদের দেখা হয়েছিল। মুজিব অবাক হলেন এই ভেবে যে এই লোকটার ডান-বাম দুই দিকেই যোগাযোগ আছে!

৮.

১৯৫৮ সালের অক্টোবরে পাকিস্তানে সামরিক আইন জারি হলো। পূর্ব পাকিস্তান পরিকল্পনা বোর্ড আবারও আমলাদের দখলে গেল। বোর্ডে কর্মরত শিক্ষকেরা ফিরে এলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। তত দিনে দুই অর্থনীতির তত্ত্ব আরও তীক্ষ্ণ আর ধারালো হয়েছে। ১৯৬১ সালের মে মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খানের সঙ্গে সরাসরি কথা বলার দাওয়াত পান। এই দলে ছিলেন এম এন হুদা, এ এফ এ হোসেন, আবদুল্লাহ ফারুক (মাজহারুল হকের অনুপস্থিতিতে) ও নুরুল ইসলাম। প্রেসিডেন্টের সঙ্গে আলোচনার পর তাঁদের বিশ্লেষণ, সুপারিশসহ একটি প্রতিবেদন তৈরি করেন নুরুল ইসলাম। দলের সবাই একমত হয়ে অনুমোদন করার পর প্রতিবেদনটি প্রেসিডেন্টের সচিবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিবেদনে আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসনের সুপারিশ ছিল। সুনির্দিষ্টভাবে বলা হয়েছিল, কেন্দ্রের হাতে স্রেফ তিনটি বিষয় থাকবে : প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্রনীতি এবং দেশের দুই অংশের মধ্যে যোগাযোগের কয়েকটি দিক।[৪]

১৯৬১ সালের জুন মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক নুরুল ইসলাম এবং রেহমান সোবহান কার্জন হলে দুই অর্থনীতির ওপর একটা সেমিনারের আয়োজন করেন। রেহমান সোবহান তাঁর বইয়ে এ বিষয়ে বিস্তারিত লিখেছেন। সেমিনারে পাকিস্তানের প্ল্যানিং কমিশনের উপপ্রধান হাবিবুর রহমান অংশ নিয়েছিলেন। সম্মেলনে নুরুল ও রেহমান দুই অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা করেন। পরদিন *দ্য পাকিস্তান অবজারভার*-এর পঞ্চম পাতায় সংবাদ শিরোনাম ছিল, 'রেহমান সোবহান সেইজ পাকিস্তান হ্যাজ টু ইকোনমিজ'। ওই দিনই আইয়ুব খান ঢাকা ছেড়ে চলে যান। যাওয়ার সময় সাংবাদিকেরা দুই অর্থনীতির ওপর প্রেসিডেন্টের মন্তব্য

জানতে চান। পরদিন *অবজারভার*-এর প্রথম পাতায় আইয়ুবের মন্তব্য ছাপা হয়েছিল এভাবে, 'আইয়ুব খান সেইজ পরিকল্পনা হ্যাজ অনলি ওয়ান ইকোনমি'। পাকিস্তান প্ল্যানিং কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান সৈয়দ হাসান রেডিওতে প্রচারিত এক ভাষণে আঞ্চলিক বৈষম্যকে বলেছিলেন 'ডেড হর্স' (মৃত ঘোড়া, অর্থাৎ এর অস্তিত্ব নেই) এবং বাঙালি অর্থনীতিবিদদের তাচ্ছিল্য করে বলেছিলেন, এরা 'বিদেশি শক্তির নিচুমানের গোলাম'। এর জবাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক আবু মাহমুদ, আনিসুর রহমান এবং রেহমান সোবহান *ঢাকা টাইমস*-এ লিখেছিলেন, 'ডিসপ্যারিটি : ডেড হর্স অর আ লাইভ প্রবলেম' (বৈষম্য : মৃত ঘোড়া না জীবন্ত সমস্যা)। তাঁরা সৈয়দ হাসানের যুক্তি খণ্ডন করেছিলেন।

৯.

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকতা করার সময় রেহমান সোবহান বিচিত্র ধরনের অভিজ্ঞতা লাভ করেন। ওই সময়ের রাজনীতির দলাদলি এবং নেতিবাচক দিকগুলোর অনেক চিত্র ফুটে উঠেছে রেহমান সোবহানের লেখায়। এ রকম একটা ঘটনার চাক্ষুষ সাক্ষী তিনি নিজে। বিশ্ববিদ্যালয়ের করিডরে দাঁড়িয়ে তিনি যা দেখেছিলেন, তার একটা রসাল বর্ণনা পাওয়া যায় এই বইয়ে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ার সময় মওদুদ আহমদ পাকিস্তান ছাত্র শক্তি এবং এ আর ইউসুফ ও আবুল হাসনাত ন্যাশনাল স্টুডেন্টস ফেডারেশনের (এনএসএফ) সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন। ১৯৬০ সালের দিকে একটি ঘটনাকে কেন্দ্র করে মওদুদ হাসনাতের হাতে লাঞ্ছিত হয়েছিলেন। রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের প্রধান ছিলেন পল নিউম্যান। ওই বিভাগের ছাত্র তালুকদার মনিরুজ্জামান পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস না পাওয়ায় মওদুদ কয়েকজন ছাত্রকে নিয়ে নিউম্যানের কাছে প্রতিবাদ জানান। এ সময় এ আর ইউসুফের ইঙ্গিতে হাসনাত মওদুদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়েন এবং তাঁর মুখে কয়েকটা ঘুষি মারেন। ঘটনাটি অনেক দূর গড়ায়। চ্যান্সেলর ছিলেন গভর্নর আজম খান। তিনি বিষয়টি হাইকোর্টের বিচারপতি আসিরকে দিয়ে তদন্ত করিয়েছিলেন। তদন্তে নিউম্যানকে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বরখাস্তের সুপারিশ করা হয়েছিল। নিউম্যান তাঁর দেশ জার্মানিতে চলে যান। অদৃষ্টের কী পরিহাস! সিকি শতাব্দী পরে ইউসুফ, হাসনাত ও মওদুদ, তিনজনই জেনারেল এরশাদের মন্ত্রিসভায় একযোগে কাজ করেছেন। বন্ধুত্ব কিংবা শত্রুতা, কোনোটাই চিরস্থায়ী না।

১০.

শিক্ষকদের দলবাজি এবং সরকার-তোষণ তখনো ছিল। রেহমান সোবহান এ রকম একটা ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। ১৯৬৩ সালে গভর্নর মোনেম খান

স্বাধীনচেতা অধ্যাপক মাহমুদ হোসেনকে সরিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়, ময়মনসিংহের উপাচার্য অধ্যাপক ওসমান গণিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য নিয়োগ করেন। ওসমান গণি মোনেম খানের অনুগত ছিলেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষককে নিয়ে সরকারপন্থী একটা চক্র গড়ে তোলেন। এই চক্রের সদস্যদের মধ্যে ছিলেন গণিত বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আজিজ, রসায়ন বিভাগের প্রধান ও সলিমুল্লাহ হলের প্রভোস্ট অধ্যাপক মফিজুল্লাহ, গণিতের শিক্ষক ও ঢাকা হলের (পরে নাম হয় শহীদুল্লাহ্ হল) প্রভোস্ট মুশফিকুর রহমান এবং পদার্থবিদ্যা বিভাগের প্রধান অধ্যাপক আবদুল মতিন চৌধুরী। গতিক সুবিধের হবে না বুঝতে পেরে মতিন চৌধুরী আণবিক শক্তি কমিশনে একটা কাজ জুটিয়ে করাচি চলে যান এবং আইয়ুব সরকারের পতন হলে ভোল পাল্টে ফেলেন। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর মতিন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যও হয়েছিলেন। খুব দ্রুতই তিনি আওয়ামী লীগ সরকারের প্রিয়পাত্র হয়ে ওঠেন।

১১.

রেহমান সোবহানের স্মৃতিচারণা কেবল অর্থনীতি আর রাজনীতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকেনি। একান্ত ব্যক্তিগত অন্তরঙ্গ বিষয়গুলো অনেকেই তাঁদের লেখায় এড়িয়ে যান। হয়তো কাউকে বিব্রত করতে চান না কিংবা স্ক্যান্ডাল হবে এই ভেবে চেপে যান। রেহমান সোবহান এ ধরনের ব্যক্তিগত দু-একটা বিষয় তাঁর স্মৃতিকথায় অকপটে বয়ান করেছেন। এখানে তাঁকে রক্ত-মাংসের একজন স্বাভাবিক মানুষ হিসেবেই দেখা যায়।

লন্ডনে পাকিস্তানের হাইকমিশনার ইকরামুল্লাহর বাসায় রেহমান সোবহানের যাতায়াত ছিল। হাইকমিশনারের মেয়ে সালমা রশীদ আখতার বানু সেখানে আইন পড়তেন। তাঁদের জানাশোনা হলো।

মিয়া ইফতেখার উদ্দিনের মালিকানাধীন *পাকিস্তান টাইমস*-এর সংবাদদাতা ছিলেন এস এম আলী। ঢাকায় আলীর সঙ্গে রেহমানের বন্ধুত্ব হয়। আলীর মাধ্যমে পরিচয় হয় ভাস্কর নভেরার। নভেরা ছিলেন আলীর ঘনিষ্ঠ বন্ধু। আলী তখন *ব্যাংকক পোস্ট*-এর কাজ নিয়ে ঢাকা ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। তিনি রেহমানকে একদিন নভেরার কাছে নিয়ে গেলেন। নভেরা নিউ বেইলি রোডের একটা অ্যাপার্টমেন্টে একাই থাকতেন। তাঁর হাতে গোনা কয়েকজন বন্ধু ছিল। তিনি ছিলেন বস্তুত এক বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা। এরপর রেহমান বেশ কয়েকবার নভেরার বাসায় গেছেন। তিনি নভেরাকে সব সময় কালো পোশাক পরা অবস্থায় দেখতেন। কথা বলতেন কম। নভেরা সম্পর্কে রেহমানের মন্তব্য হলো, তিনি ছিলেন খুবই আবেগপ্রবণ। রেহমান মাঝেমধ্যে তাঁকে নিয়ে বেড়াতে বের হতেন।

বাইরে থেকে থিয়েটারের কোনো গ্রুপ এলে ব্রিটিশ কাউন্সিলে তাঁরা যেতেন অনুষ্ঠান দেখতে। ওই সময় একজন অবিবাহিত তরুণ অ্যাপার্টমেন্টে একাকী বসবাসকারী একজন তরুণীর কাছে যাওয়া-আসা করেন, এটা হয়তো অনেকেই লক্ষ করেছেন। বছর খানেক চলল এ রকম। ইতিমধ্যে রেহমান সিদ্ধান্ত নিয়েছেন তিনি সালমাকে বিয়ে করবেন। রেহমান স্বীকার করেছেন, নভেরার প্রতি তাঁর দুর্বলতা ছিল। কিন্তু তিনি তখন আস্তে আস্তে রাজনীতির বৃত্তে ঢুকছেন এবং নভেরা ছিলেন বিপরীত মেরুর। এটাকে রেহমান বলেছেন প্ল্যাটোনিক সম্পর্ক। তিনি নভেরাকে সালমাকে বিয়ে করার সিদ্ধান্ত জানালেন। নভেরা বুঝে নিলেন, তাঁদের সম্পর্কের এখানেই ইতি। এরপর নভেরা প্যারিস চলে যান (পৃ. ২১৬-২১৭)।

সালমা ১৯৫৮ সালের গ্রীষ্মে কেমব্রিজের গার্টন কলেজ থেকে আইনশাস্ত্রে বিএ অনার্স করেন এবং লিঙ্কনস ইন-এ নাম লেখান। ২১ বছর বয়সে তিনি ব্যারিস্টার হন। তিনি পাকিস্তানের দ্বিতীয় কনিষ্ঠতম ব্যারিস্টার। হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী হলেন সালমার মামা। সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন সালমা তাঁর জুনিয়র হিসেবে আইন ব্যবসায়ে থাকুক। সালমা তাঁর রাজনীতিবিদ মামার পেছনে দৌড়াদৌড়ি করতে চাননি। সালমার বাবা পাকিস্তানের পররাষ্ট্রসচিব হিসেবে ১৯৬৯ সালে অবসরে যান এবং লন্ডনে কমনওয়েলথ ইকোনমিক কমিটির চেয়ারম্যান পদে যোগ দেন। লন্ডনেই সালমার সঙ্গে রেহমানের বিয়ে হয়। একজন সাবেক আইসিএস অফিসারের মেয়ে এবং সোহরাওয়ার্দী পরিবারের সদস্য হিসেবে যে আয়েশি জীবনে অভ্যস্ত ছিলেন সালমা, তিনি ঢাকায় একজন শিক্ষকের সীমিত আয়ের সংসারে নিজেকে মানিয়ে নিতে পারবেন কি না, এ নিয়ে রেহমানের মনে সংশয় ছিল। ১৯৬২ সালের ১৭ মে তাঁদের বিয়ে হয়। সালমা পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আইন বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগ দিয়েছিলেন। তিনি মানবাধিকার নিয়ে অনেক কাজ করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশে তিনি গড়ে তুলেছিলেন 'আইন ও সালিশ কেন্দ্র'। তারপরও একটা অতৃপ্তি থেকে যেতে পারে। স্বাধীনভাবে নিজের পেশায় নিয়োজিত থাকলে সমাজ হয়তো একজন দক্ষ আইনজীবী কিংবা বিচারপতি পেত।

১২.

রেহমান সোবহান আপাদমস্তক একজন শিক্ষক। আর একজন শিক্ষকের কাছে সবচেয়ে বড় সম্পদ হচ্ছে তাঁর ছাত্র। তেমনি একজন ছাত্রের কাছে সবচেয়ে বড় অবলম্বন হচ্ছেন একজন শিক্ষক। এ দেশের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে ছাত্র-শিক্ষক সম্পর্কে টানাপোড়েন লক্ষ করা যায় ষাটের দশকে থেকেই। সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির কারণে অনেক ছাত্র ও শিক্ষকের পদস্খলন দেখা গেছে।

রেহমান সোবহান ১৯৫৭ থেকে ১৯৭১—একটানা ১৪ বছর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র পড়িয়েছেন। একদিকে তিনি দেশের সেরা শিক্ষকদের পেয়েছেন সহকর্মী হিসেবে, অন্যদিকে তাঁর হাত ধরে সেরা ছাত্ররা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ্ডি ছেড়ে সমাজের বিভিন্ন স্তরে ছড়িয়ে পড়েছেন নানা কর্মযজ্ঞে অংশ নিতে। তিনি তাঁর ছাত্রদের ভোলেননি। তবুও তাঁর একটু আক্ষেপ থেকে গেছে। শিক্ষা একটা পরিবারের কাছে বিনিয়োগের ক্ষেত্র বটে। পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের অনেকেই শিক্ষাবিদ না হয়ে সিভিল সার্ভিসের দিকে ঝুঁকেছিলেন। হয়তো সেখানেই বিনিয়োগ ছিল বেশি ঝুঁকিমুক্ত এবং লাভজনক। এ প্রসঙ্গে তিনি যাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন, তাঁরা সবাই পরীক্ষায় ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া, যাঁদের পেলে বিশ্ববিদ্যালয় বর্তে যেত। তাঁদের মধ্যে আছেন ফখরুদ্দীন, মির্জ্জা আজিজ, এ এম এ রহিম, আবুল আহসান, মনোয়ারুল ইসলাম, মোস্তফা ফারুক মোহাম্মদ, শামসুল আলম, ফরাসউদ্দিন ও শাহ মোহাম্মদ ফরিদ। শিক্ষার জগতে থেকে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন আজিজুর রহমান খান। লেকচারার হিসেবে যোগও দিয়েছিলেন। ছাত্র ইউনিয়নের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে যুক্ত থাকার কারণে সরকারি গোয়েন্দা সংস্থার ছাড়পত্র না পাওয়ায় তাঁর চাকরি নিয়মিত করা হয়নি। তিনি দেশ ছেড়ে যুক্তরাষ্ট্রে চলে যান এবং ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক হন। তাঁর আরেকজন ছাত্র আমিনুল ইসলামের একই কারণে একই পরিণতি হয়েছিল। স্বদেশ বোস তাঁর রাজনৈতিক সম্পৃক্ততার কারণে বিশ্ববিদ্যালয়ে ঠাঁই পাননি। আমিনুল ইসলাম এবং স্বদেশ বোস পরে করাচিতে পাকিস্তান ইনস্টিটিউট অব ডেভেলপমেন্ট ইকোনমিকসে (পিআইডিই) যোগ দিয়েছিলেন। ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া আরেকজন ভালো ছাত্রের কথা রেহমান বলেছেন, যিনি রাজনীতিকেই কর্মক্ষেত্র হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তিনি হলেন মুজাহিদুল ইসলাম সেলিম। তাঁর আরেকজন ছাত্র রাশেদ খান মেনন ছাত্র ইউনিয়নের বড় নেতা ছিলেন। এমএ পরীক্ষার সময় তিনি জেলে ছিলেন। এটা ১৯৬৫ সালের কথা। মেননের মৌখিক পরীক্ষা নেওয়ার জন্য অধ্যাপক আবু মাহমুদ, আনিসুর রহমান ও রেহমান সোবহান ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে গিয়েছিলেন। পরীক্ষায় মেনন তাঁর ক্লাসে পঞ্চম স্থান পেয়েছিলেন। তিনিও কর্মক্ষেত্র হিসেবে রাজনীতিকেই বেছে নেন।

১৩.

সংকীর্ণ গোষ্ঠীস্বার্থে সরকারের উঁচু পর্যায়ের মদদে যদি ছাত্রসংগঠনকে ব্যবহার করা হয়, তবে ওই সংগঠন নিতান্তই লাঠিয়াল বাহিনী হয়ে পড়ে। গভর্নর মোনেম খান ১৯৬২ সালে পূর্ব পাকিস্তানের গভর্নর নিযুক্ত হওয়ার পর থেকেই এনএসএফকে সরকারের লাঠিয়াল বাহিনী হিসেবে ব্যবহার করতে থাকেন। তাদের সমর্থনে

কয়েকজন শিক্ষকও জুটে যান। ঢাকা হলের প্রভোস্ট মুশফিকুর রহমান সরাসরি এনএসএফকে সমর্থন করতেন। ঢাকা হলে ছাত্রসংসদ নির্বাচনে এনএসএফ সব সময় জিতে যেত।

ষাটের দশকজুড়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল উত্তপ্ত। একদিকে সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে ক্ষোভ ও আন্দোলন, অন্যদিকে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এনএসএফের পেশিশক্তির ব্যবহার। ১৯৬৪ সালে কার্জন হলে সমাবর্তন অনুষ্ঠানে এর একটা বিস্ফোরণ ঘটে। অনুষ্ঠানটি পণ্ড হয়ে যায়। শেখ ফজলুল হক মণি ছিলেন ছাত্রলীগের নেতা। তাঁর শাস্তি হয়। তাঁর এমএ ডিগ্রি বাতিল করে দেওয়া হয়। শাস্তিপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের একজন ছিলেন রেহমান সোবহানের ছাত্র জাকির আহমদ। জাকির ছাত্র ইউনিয়ন করতেন। জাকির হাইকোর্টে মামলা ঠুকে দেন। মামলায় তাঁকে সহযোগিতা দেন কামাল হোসেন। কামালের মাধ্যমে জ্যেষ্ঠ আইনজীবী এস আর পাল জাকিরের পক্ষে দাঁড়ান। হাইকোর্টের বিচারপতি সাত্তার জাকিরের পক্ষে রায় দেন। হাইকোর্ট শাস্তি বাতিল করলেও মামলাটি সুপ্রিম কোর্ট পর্যন্ত গড়ায়। 'জাকির আহমদ বনাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়' মামলাটি ওই সময় বেশ আলোচিত হয়েছিল এবং 'ল রিপোর্ট'-এ তা জায়গা করে নিয়েছিল। জাকির আহমদ পরে আইন পেশায় যুক্ত হন এবং আশির দশকে হাইকোর্টের বিচারপতি হয়েছিলেন।

১৪.

কোনো ধরনের সমালোচনা সরকারের ধাতে সয় না। সম্ভবত এটাই প্রকৃতির অলিখিত নিয়ম, বিশেষ করে পশ্চাদপদ সমাজে। অন্যায় দেখলে মানুষ প্রতিবাদী হবে, এটাই স্বাভাবিক। বিশেষ করে তরুণেরা, ছাত্ররা কখনোই বিনা প্রতিবাদে চাপিয়ে দেওয়া কোনো অন্যায় বা অন্যায্য সিদ্ধান্ত মেনে নেয় না। সে জন্য তরুণদের বিভক্ত করতে বা দমিয়ে রাখতে সরকার নানা ফন্দি আঁটে, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে লাঠিয়াল বাহিনী পোষে, দালাল বুদ্ধিজীবী তৈরি করে এবং নানাভাবে তাঁদের পারিতোষিক দেওয়ার বন্দোবস্ত করে। মোনেম খানের আমলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়েও পেশিশক্তি ব্যবহার করে ছাত্র-শিক্ষকদের মুখ বন্ধ রাখার চেষ্টা হয়েছিল। ষাটের দশকের ওই সময়ের অন্ধকার দিনগুলোর বর্ণনা পাওয়া যায় রেহমান সোবহানের বইয়ে।

সরকারের ঠ্যাঙারে বাহিনীর পোশাকি নাম ছিল এনএসএফ। এদের একজন নেতা জাহাঙ্গীর ফয়েজ ঢাকা হলের প্রভোস্টের মদদে হলে মাফিয়া রাজত্ব কায়েম করেছিল। তার সহযোগীদের মধ্যে ছিল সাইদুর রহমান, যে পাঁচপাত্তু নামে পরিচিত ছিল। সে অবশ্য আয়েশ করে বলত পাসপার্ট টু, যদিও এ নামে বিশ্ববিদ্যালয়ে কোনো ডিগ্রি ছিল না। জাহাঙ্গীরের আরেক সঙ্গী ছিল খোকা। সে

গলায় একটা জ্যান্ত সাপ পেঁচিয়ে হেঁটে বেড়াত। তাদের সবার নেতা ছিল রেহমান সোবহানেরই একজন ছাত্র, জমির আলী। জমির আলীর সঙ্গে মোনেম খানের দুই ছেলের ভালো যোগাযোগ ছিল। সরকারপ্রধানের ছেলে যদি গুন্ডামি করে বেড়ায়, তখন শৃঙ্খলা বলতে আর কিছু থাকে না। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থা তখন অনেকটা ওই রকমই ছিল। সরকারি মদদে দুর্বৃত্তায়ন ষোলোকলায় পূর্ণ হয়েছিল। উপাচার্য অধ্যাপক ওসমান গণি সরাসরি এদের পৃষ্ঠপোষকতা দিতেন।

অধ্যাপক আবু মাহমুদ সদ্য হার্ভার্ড থেকে পিএইচডি করে ফিরেছেন। তিনি মার্ক্সবাদী হিসেবে পরিচিত ছিলেন। ১৯৬৪ সালে বিভাগীয় প্রধান অধ্যাপক নুরুল ইসলাম পিআরডিইর পরিচালক পদে নিয়োগ পেয়ে করাচি চলে যান। সিনিয়র শিক্ষক হিসেবে অধ্যাপক মাহমুদ অর্থনীতি বিভাগের প্রধান হলেন। কে টি হোসেন, আনিসুর রহমান ও রেহমান সোবহান তখন অর্থনীতি বিভাগের রিডার (সহযোগী অধ্যাপক)। আনিসুর রহমান তখন বিদেশে। উপাচার্য করলেন কী; তিনি সবাইকে ডিঙিয়ে অপেক্ষাকৃত জুনিয়র কে টি হোসেনকে বিভাগীয় প্রধান পদে নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন। অধ্যাপক মাহমুদ এই নিয়োগকে চ্যালেঞ্জ করে আদালতে মামলা ঠুকে দেন। হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি সৈয়দ মাহবুব মোর্শেদ মামলার শুনানি করেন। মামলার কাজ গোছানোর দায়িত্ব নেন কামাল হোসেন। আইনজীবী এস আর পাল আদালতে মাহমুদের পক্ষে দাঁড়ান। মামলায় মাহমুদের জয় হয়। উপাচার্যের হাইকোর্টের রায় উপেক্ষা করে কে টি হোসেনকে বিভাগীয় প্রধান হিসেবে নিয়োগ দেন। মাহমুদ তখন আদালত অবমাননার মামলা করেন। বিচারপতি মোর্শেদ উপাচার্যকে আদালত অবমাননার দায়ে দোষী সাব্যস্ত করে রায় দেন।

উপাচার্য এবং তাঁর সাঙ্গপাঙ্গরা হাইকোর্টের রায় হজম করতে পারেননি। ১৯৬৬ সালের ১৫ ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে চরম অঘটন ঘটল। মাহমুদ গাড়িতে করে তাঁর বাসায় যাচ্ছিলেন। এনএসএফের জাহাঙ্গীর ফয়েজ, আলতাফ হোসেন, পাঁচপাত্তু, খোকা এবং আরও দুজন হকিস্টিক নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করে। গাড়ি ভাঙচুর করা হয়। মাহমুদকে পিটিয়ে রক্তাক্ত করা হয়। তাঁকে কয়েক সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়।

এর কিছুদিন আগে এনএসএফের কয়েকজন অর্থনীতি বিভাগের ছাত্র মাহবুবউল্লাহকে কলাভবন চত্বরে পিটিয়েছিল। মাহবুবউল্লাহ পিকিংপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের সক্রিয় কর্মী ছিলেন। আহত অবস্থায় মাহবুবউল্লাহ অধ্যাপক আবু মাহমুদের কামরায় আশ্রয় নেন এবং তাঁর লাঞ্ছনার বর্ণনা দেন। তাঁর কাছ থেকে জানা যায়, এনএসএফের গুন্ডারা অর্থনীতি বিভাগের সরকারবিরোধী শিক্ষকদের দেখে নেবে বলে হুমকি দিয়েছে। মাহবুবউল্লাহ পরে কমিউনিস্ট পার্টির মতিন-

আলাউদ্দিন গ্রুপে যুক্ত হন। তিনি গ্রেপ্তার হয়েছিলেন। ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে তিনি রেহমান সোবহানের কাছে চিঠি লিখেছিলেন।

কয়েক দিন পর গভর্নর মোনেম খান গভর্নর হাউসে কয়েকজন সিনিয়র শিক্ষককে ডেকে পাঠান। শিক্ষকেরা ন্যায়বিচার দাবি করলে তিনি তাঁদের তিরস্কার করেন। তিনি বলেন, মাহমুদ তাঁর প্রাপ্য পেয়েছেন। মোনেম খান তাঁর নিচুমানের শিক্ষাগত যোগ্যতার কারণে হীনম্মন্যতায় ভুগতেন। নিজের পক্ষে সাফাই গাইতে তিনি যুক্তি দিতেন, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের তো বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো ডিগ্রি ছিল না!

কয়েক সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান ঢাকা সফরে আসেন। নাগরিকদের একটা প্রতিনিধিদল বেগম সুফিয়া কামালের নেতৃত্বে আইয়ুবের সঙ্গে দেখা করে। ওই দলে কামাল হোসেনও ছিলেন। মোনেম খান এর আগেই আইয়ুব খানকে কানপড়া দিয়ে থাকবেন। তিনি আগত অতিথিদের বিরুদ্ধে বেশ আক্রমণাত্মক ভাষায় কথা বলেন। তিনি বলেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা রাজনীতি করেন, তাঁরা সরকারবিরোধী এবং পাকিস্তানবিরোধী। বেগম সুফিয়া কামাল কথা বলছিলেন উর্দুতে। তিনি ইনসানিয়াতের (মানবিকতা) দোহাই দিয়ে প্রেসিডেন্টকে পরিস্থিতি সামাল দিতে অনুরোধ করেন। আইয়ুব উর্দুতে জবাব দেন, সরকারবিরোধীরা ইনসান (মানুষ) নয়, তারা হায়ওয়ান (জানোয়ার)।

পরিস্থিতি ক্রমেই খারাপের দিকে যাচ্ছিল। অধ্যাপক আবদুর রাজ্জাককে হেনস্তা করার ফন্দি আঁটে কর্তৃপক্ষ। তিনি দীর্ঘ ছুটি নিয়ে ১৯৬৭ সালে ইংল্যান্ডে চলে যান। আবু মাহমুদ পদত্যাগ করে জাতিসংঘের চাকরি নিয়ে ব্যাংককে যান। মুজাফফর আহমদও পদত্যাগ করেন এবং ইউনাইটেড ব্যাংকের উপদেষ্টা হিসেবে যোগ দিতে করাচি চলে যান। আনিসুর রহমান যোগ দেন যুক্তরাষ্ট্রের ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ে। রেহমান সোবহান ফোর্ড ফাউন্ডেশনের একটা বৃত্তি নিয়ে লন্ডন স্কুল অব ইকোনমিকসে যান পিএইচডি করতে। সরকারের পেটোয়া বাহিনীর দৌরাত্ম্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তখন রীতিমতো নরক। রেহমানের পিএইচডি করার জন্য যথেষ্ট প্রস্তুতি ছিল না। দুই বছর পর তিনি ফিরে আসেন। তত দিনে দেশ অনেকটা বদলে গেছে। ১৯৬৮-৬৯ সালে দেশে ঘটে গেছে একটা গণবিপ্লব। আইয়ুব-মোনেমের সূর্য অস্তাচলে গেছে। ক্ষমতায় আসীন হয়েছে জেনারেল ইয়াহিয়া খানের নেতৃত্বে সামরিক জান্তা।

১৫.

রেহমানের লড়াইয়ের প্রধান অস্ত্র ছিল কলম। কলমের লড়াইয়ে দরকার হলো একটা বাহনের। এখানে দেখা গেল কামাল হোসেনের সঙ্গে তাঁর মিলিত প্রয়াস। 'ফোরাম' নামে একটা ইংরেজি সাপ্তাহিকের ডিক্লারেশন নিলেন কামাল, নিজেই

হলেন প্রকাশক। সম্পাদক হলেন তাঁর স্ত্রী হামিদা হোসেন। রেহমান সোবহান পত্রিকা বের করার যাবতীয় দায়িত্ব নিলেন, হলেন নির্বাহী সম্পাদক। *দৈনিক সংবাদ* সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিল। কর্মী জোগান দিয়ে তো সাহায্য করলই, বিনা পয়সায় *সংবাদ*-এর ছাপাখানায় ছাপা হতো *ফোরাম*। প্রতি সংখ্যার দাম আট আনা।

একদিকে চলছে মাঠে-ময়দানে স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে রাজনীতির লড়াই। নেতৃত্বে শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ। অন্যদিকে *ফোরাম*-এ ছাপা হচ্ছে অর্থনৈতিক বৈষম্য আর বঞ্চনা নিয়ে শাণিত সব প্রতিবেদন আর প্রবন্ধ। 'বিটুইন দ্য লাইন' নামে নিয়মিত কলাম পাঠাতেন লাহোর থেকে মজহার আলী খান। আরও লিখতেন করাচির এম ভি নাকভি এবং ঢাকার এবিএম মূসা, এ এল খতিব, রাজিয়া খান আমিন, সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী, মঈদুল হাসান, মওদুদ আহমদ, সিরাজুল হোসেন খান প্রমুখ। এ ছাড়া *ফোরাম*-এ মাঝেমধ্যে লিখতেন নুরুল ইসলাম, আনিসুর রহমান, আখলাকুর রহমান, এ আর খান, কবিরউদ্দিন আহমদ, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, কে জি মুস্তাফা। এমনকি অমর্ত্য সেন, হামজা আলাভি ও নেভিল ম্যাক্সওয়েলের মতো মানুষেরাও *ফোরাম*-এ লিখেছেন।

চলতি পুঁজি জোগাড়ের জন্য *ফোরাম*-এর আজীবন গ্রাহক সংগ্রহের চেষ্টা চালানো হয়। এক হাজার টাকা অগ্রিম দিলেই একজনকে আজীবন গ্রাহক করা হতো। প্রথম আজীবন গ্রাহক হলেন স্বয়ং শেখ মুজিব। ১৯৬৯ সালের ২২ নভেম্বর রমনার সবুজ চত্বরে *ফোরাম*-এর আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়। ওই অনুষ্ঠানেই শেখ মুজিব এক হাজার টাকা দিয়ে গ্রাহক হয়ে যান। ম্যাগাজিন সাইজের এই সাপ্তাহিকীটি বের হতো রোববারে। নিউজপ্রিন্টে ছাপা হলেও প্রচ্ছদে থাকত কার্টুনচিত্র।

১৬.

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে পাকিস্তানের প্রথম সাধারণ নির্বাচনে বিপুল বিজয়ের পর আওয়ামী লীগের সামনে প্রধান চ্যালেঞ্জ ছিল ছয় দফার ভিত্তিতে একটা সংবিধান তৈরি করা। এত দিন যা ছিল দাবি, এখন তা হয়ে দাঁড়াল দায়িত্ব। সৈয়দ নজরুল ইসলাম, তাজউদ্দীন আহমদ, ক্যাপ্টেন মনসুর আলী, এ এইচ এম কামারুজ্জামান ও খন্দকার মোশতাক আহমদকে নিয়ে শেখ মুজিবের একটা অনানুষ্ঠানিক হাইকমান্ড ছিল। শেখ মুজিব তাঁদের নিয়ে বারবার বৈঠক করেন। কিন্তু সংবিধান তৈরির জন্য দরকার বিশেষজ্ঞের। শেখ মুজিব এ কাজে তাঁর পরীক্ষিত সহযোগীদের জড়ালেন, যাঁরা এত দিন বুদ্ধিবৃত্তিক ফ্রন্টে স্বাধিকারের জন্য লড়াই করে আসছিলেন। রেহমান সোবহানের বিবরণ থেকে জানা যায়, বিশেষজ্ঞদের

মধ্যে ছিলেন নুরুল ইসলাম, মোজাফফর আহমদ চৌধুরী, খান সরোয়ার মুরশিদ, আনিসুর রহমান, কামাল হোসেন এবং তিনি নিজে। একাত্তরের উথালপাতাল দিনগুলোতে লোকচক্ষুর আড়ালে চলত তাঁদের আলোচনা। তাঁরা খসড়া তৈরি করে শেখ মুজিবকে দিতেন। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার সঙ্গে সংলাপ ও দর-কষাকষির জন্য একা খসড়া সংবিধান তৈরির কাজটা মুজিব আগেভাগেই করে রাখলেন।

১৭.

১ মার্চ ইয়াহিয়ার নামে প্রচারিত বেতার ভাষণে ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য জাতীয় পরিষদের অধিবেশন স্থগিত হওয়ার ঘোষণা প্রচারিত হলে মানুষ পাকিস্তানি পতাকা পুড়িয়ে বিক্ষোভ জানায়। শেখ মুজিব সর্বাত্মক অসহযোগ আন্দোলনের ডাক দেন। ওই আন্দোলনে আরও অনেকের মতো দেশের সামনের কাতারের অর্থনীতিবিদেরাও শরিক হন। রেহমান সোবহানের বর্ণনায় জানা যায়, নুরুল ইসলামের ধানমন্ডির বাসা তখন তাঁদের আলাপ-আলোচনার একটা কেন্দ্র হয়ে ওঠে। শিগগিরই তা গোয়েন্দাদের নজরদারিতে চলে আসে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর কর্নেল ইয়াসিন এবং টিঅ্যান্ডটি বিভাগের কর্মকর্তা এম হুদা ছিলেন নুরুল ইসলামের আত্মীয়। তাঁর ওই বাসায় নিয়মিত যেতেন। ঢাকা সেনাবাহিনীতে বিভিন্ন সামগ্রী সরবরাহের দায়িত্বে ছিলেন কর্নেল ইয়াসিন। সেনাবাহিনীতে খাবার সরবরাহকারীদের একটা তালিকা তৈরি করে তিনি আওয়ামী লীগের নেতাদের হাতে তুলে দেন। আওয়ামী লীগের কর্মীরা ওই সরবরাহকারীদের সবাইকে খুঁজে বের করে এবং খাবার সরবরাহ থেকে নিবৃত্ত করে। এই কৌশলটি পাকিস্তানি সেনাদের কাবু করতে কাজে লেগেছিল। ইয়াসিন এবং হুদা দুজনকেই ২৫ মার্চের পর গ্রেপ্তার করা হয়। তাঁরা অমানুষিক নির্যাতনের শিকার হন। ইয়াসিনকে লাহোরে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল এবং বাঙালি জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তা ব্রিগেডিয়ার মজুমদারের সঙ্গে একই মামলায় বিচারের মুখোমুখি করা হয়েছিল।

১৮.

সংলাপ ব্যর্থ হয়েছিল। পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিরোধ আন্দোলন সশস্ত্র রূপ নিল এবং একটা সর্বাত্মক মুক্তিযুদ্ধের পর্বে প্রবেশ করল একাত্তরের ২৫ মার্চ রাতে। পূর্ব পাকিস্তান এখন বাংলাদেশ। বাংলাদেশের নতুন নাম হলো পিপলস রিপাবলিক অব বাংলাদেশ (গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ)। অনেকেই জানেন না এই নামকরণের ইতিহাস। এ প্রসঙ্গে মঈদুল হাসান বলেছেন :

> রেহমান সোবহান বোধ হয় কখনো এটা দাবি করেননি, কিন্তু আমি বিষয়টা জানি। তিনিই বাংলাদেশের এই নামকরণ করেন। এই নামটা এখনো চলছে।[৫]

১৯.

রেহমান সোবহান স্মৃতিকথা লিখলেও নিজের নামে অনাবশ্যক ঢোল পেটাননি। ব্যক্তিগত প্রসঙ্গগুলো বারবার উল্লেখ করলেও নেপথ্যে উঠে এসেছে ওই সময়ের ঘটনাপ্রবাহ, ইতিহাসের নানা চরিত্র, যা হয়ে উঠেছে সময়ের এক নির্মোহ দলিল। রেহমানের এই বই হলো একজন তরুণ শিক্ষকের অ্যাকটিভিস্ট হয়ে ওঠার গল্প, যিনি নিরন্তর লড়াই করে গেছেন বুদ্ধিবৃত্তিক ফ্রন্টে। ইউরোপে 'পাবলিক ইনটেলেকচুয়াল' কথাটি চালু আছে। এ হলো এমন একটি প্রতিভূ, যেখানে একজন বুদ্ধিজীবী একই সঙ্গে হয়ে যান সমাজবদলের সৈনিক। সেই যুদ্ধটি রেহমান সোবহান লাঠিসোঁটা কিংবা বন্দুক দিয়ে করেননি। মেধা ও মনন দিয়ে কলম হাতে নিয়ে করেছেন। এ লড়াইয়ে আরও অনেকেই ছিলেন। তিনি তো অবশ্যই ছিলেন।

তথ্যসূত্র

১. Humayun, Syed (1995), *Sheikh Mujibs 6-Point Formula: An Analytical Study of the Breakup of Pakistan*. Royal Book Company, Karachi, p. 411-415

২. Islam, Nurul (2013). *Making of a Nation Bangladesh: An Economist's Tale*, UPL, Dhaka, p. 38-44

৩. Marx, Karl (1977). *A Contribution to the Critique of Political Economy*, Progress Publishers, Moscow.

৪. নুরুল ইসলাম, ছয় দফা ও দুই অর্থনীতি, *প্রতিচিন্তা*, পঞ্চম বর্ষ, চতুর্থ সংখ্যা, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০১৫, ঢাকা, পৃ. ১১

৫. এ কে খন্দকার; মঈদুল হাসান; এস আর মীর্জা (২০১৪), *মুক্তিযুদ্ধের পূর্বাপর: কথোপকথন*, প্রথমা প্রকাশন, ঢাকা, পৃ. ২৫

খ্যাতি চিন্তা
বই আলোচনা

পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি উপনিবেশবাদ

মো. ফজলে রাব্বি

পাক কলওনিয়্যালিজম ইন ইস্ট বেঙ্গল—ডি. আর. মানকেকার, সুমাইয়া পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, নয়াদিল্লি : ১৯৭১

ডি. আর. মানকেকার গ্রন্থিত *পাক কলওনিয়্যালিজম ইন ইস্ট বেঙ্গল* গ্রন্থটি সেপ্টেম্বর ১৯৭১, নয়াদিল্লিতে সুমাইয়া পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড কর্তৃক প্রকাশিত হয়। *পাক কলওনিয়্যালিজম ইন ইস্ট বেঙ্গল* গ্রন্থটি পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এর রচনাকাল ও প্রকাশকাল উভয়ই বিবেচনায় রাখা উচিত। গ্রন্থটিতে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম থেকে বাংলাদেশের স্বাধিকার আদায়ে চলমান মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সময়পরিক্রমায় পূর্ব পাকিস্তানের ওপর পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনের কার্যকারণ, প্রভাব ও পরিণতি তুলে ধরার প্রয়াস রয়েছে। ২৫৪ পৃষ্ঠার গ্রন্থটিকে লেখক ১৬টি অধ্যায়ে ভাগ করে বিষয়ভিত্তিক বিশ্লেষণ করেছেন। পাঠকদের সুবিধার্থে তিনি গ্রন্থের পরিশিষ্টে কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথির অনুলিপি সংযুক্ত করেছেন। গ্রন্থটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য এই যে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালীন রচিত বলে হয়তো অনেক অনুমিত বর্ণনা একপক্ষীয় কিন্তু উত্থাপিত ও বর্ণিত বিষয়গুলো তৎকালীন সমসাময়িক বাস্তবতায় অকাট্য ও বাস্তব। ডি. আর. মানকেকার তাঁর গ্রন্থ রচনায় পাকিস্তানের দাপ্তরিক ও অ-দাপ্তরিক নথিপত্রের পাশাপাশি পাকিস্তানি ও বিদেশি সংবাদপত্রের ওপর নির্ভর করেছেন। বিশেষত ১৯৭১ সালের প্রথম পাঁচ মাসে প্রকাশিত *পাকিস্তান টাইমস* ও *ডন*-এর প্রতিবেদনগুলো তিনি সূত্র হিসেবে ব্যবহার করেছেন।

> '২০০ বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের পরম্পরায় পশ্চিম পাকিস্তান এই ভূখণ্ডে নয়া উপনিবেশবাদ স্থাপন করেছে।' গ্রন্থের মুখবন্ধে ডি. আর. মানকেকার (পৃষ্ঠা-১)

যখন বিশ্বে উপনিবেশবাদ বিলুপ্তির পথে এমন সময় পশ্চিম পাকিস্তানের উপনিবেশবাদ প্রতিষ্ঠিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন পূর্বসূরি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ অপেক্ষা ক্রূর এবং সহিংস ছিল। মানকেকার তাঁর গ্রন্থে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক মুক্তির জন্য সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ববঙ্গের বাঙালিদের গণতান্ত্রিক শক্তির সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানিদের স্বৈরতন্ত্রের মধ্যে দ্বন্দ্বের বিষয়টিও তুলে ধরেছেন। অবশ্য পূর্ববঙ্গের মুসলিমদের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিমদের (দেশ ভাগের আগে সাবেক ভারতীয় উচ্চবর্ণের মুসলিমদের) দ্বৈরথ নতুন কোনো বিষয় নয়। ২৫ মার্চ ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানের উভয় অংশের রাজনীতিবিদেরা (জুলফিকার আলী ভুট্টো ছাড়া) নির্বাচনের রায় মেনে জনগণের ইচ্ছার সম্মান রাখতে শেখ মুজিবুর রহমানের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর চেয়েছিলেন। তৎকালীন সময়ে *পাকিস্তান টাইমস* ও *ডন*-এর মতো ডাকসাইটে পত্রিকা শেখ মুজিবের ছয় দফা ও আওয়ামী লীগের সরকার গঠনের প্রক্রিয়াকে স্বাগত জানায়। মুমতাজ দৌলতানা ও শওকাত হায়াত খানের মতো কট্টর পাঞ্জাবি নেতা ও আবদুল কাইয়ুম খান ইয়াহিয়াকে ছয় দফার ভিত্তিতে শেখ মুজিবের সঙ্গে আলোচনার জন্য ২৫ মার্চ পর্যন্ত অনুরোধ করেছিলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতা শেখ মুজিবুর রহমানের নতুন সংবিধানের দাবিকে সমর্থন জানিয়েছিলেন। মানকেকারের মতে, শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দলের বিরুদ্ধে ইয়াহিয়ার আগ্রাসী ও দমননীতির প্রতি সন্দেহাতীতভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের জনসাধারণ এবং অধিকাংশ রাজনৈতিক নেতৃত্বের সমর্থন ছিল না। ব্রিটিশরা ভারতীয়দের তীব্র বিরোধিতা ও পরিস্থিতির বৈরিতা বিবেচনা করে তাদের ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব পরিত্যাগ করেছিল কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান তার ঔপনিবেশিক কর্তৃত্ব টিকিয়ে রাখতে সামরিক শাসন স্থাপনের জন্য নির্বিচারে জনমানুষের বিরুদ্ধে ট্যাংক, মেশিনগানের মতো ভারী অস্ত্রশস্ত্র ব্যবহার করেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গে উপনিবেশবাদের রক্তাক্ত পরিসমাপ্তি ঘটে। ভারতে ২০০ বছরের ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের তুলনায় পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসন অত্যন্ত অমানবিক ও রক্তাক্ত ছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুই ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের জন্মকে একটা রাষ্ট্রের জন্ম বলার চেয়ে একটা জাতির জন্ম বলাই যুক্তিযুক্ত। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ১২০০ মাইল দূরত্বে অবস্থিত এবং অন্য আরেকটি জাতিরাষ্ট্র দ্বারা বিভাজিত দুটি পৃথক ভূখণ্ড নিয়ে গঠিত হয় পাকিস্তান। পশ্চিমাংশের নামকরণ করা হয় পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্বাংশ পরিচিতি লাভ করে পূর্ব পাকিস্তান বা পূর্ববঙ্গ নামে। ভাষা, সংস্কৃতি, নৃতাত্ত্বিকভাবে সম্পূর্ণ আলাদা এবং ভৌগোলিকভাবে অসম দূরত্বে অবস্থান সত্ত্বেও শুধু ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের মাধ্যমে গঠিত এই

জাতিরাষ্ট্রের ভবিষ্যৎ জন্মের সময়ই নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। শুধু সময়ের পরিক্রমায় এই জাতিরাষ্ট্রের পূর্বনির্ধারিত ভাঙন ২৪ বছরে বাস্তবায়িত হয়। অবিভক্ত পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের মধ্যে যে মরণঘাতী বিষফোড়া সুপ্ত ছিল, তা-ই সময়ের পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে মরণঘাতী ক্যানসারে রূপান্তরিত হয়। ২৪ বছরে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্ম-ত্রুটিগুলো বিষবৃক্ষ হয়ে বিষবাষ্প ছড়াতে শুরু করে। দুটি ভূখণ্ড, মাঝখানে হাজার মাইলেরও বেশি ভিন্ন রাষ্ট্রের দেয়াল নিয়ে একটা রাষ্ট্র হিসেবে জন্ম লাভ করার দৃষ্টান্ত আধুনিক ইতিহাসে নেই। হাজার হাজার মাইল ব্যবধান নিয়ে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন রাষ্ট্র আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আলাস্কা ও হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ মূল মার্কিন ভূখণ্ড থেকে বহু দূরে। কিন্তু আলাস্কা ক্রয়সূত্রে এবং হাওয়াই দখলি সূত্রে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অংশ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের জন্ম তাদের নিয়ে হয়নি। ব্রিটেন ও ফ্রান্সের অনেক দূরবর্তী ভূখণ্ড রয়েছে। কিন্তু সেগুলো উপনিবেশ, মূল রাষ্ট্র নয়। মালয়েশিয়ার মূল ভূখণ্ড ও তার সারাওয়াক অঞ্চলের মধ্যে অনেক ব্যবধান, কিন্তু তাদের মধ্যে কোনো ভিন্ন রাষ্ট্রের দেয়াল নেই। সুতরাং ভারতীয় উপমহাদেশের দুই প্রান্তের দুই ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মলাভ একেবারেই অনন্য একটা ঘটনা। এই অনন্য ঘটনা সংঘটিত হয়েছে দুই ভূখণ্ডের মানুষের এক জাতিত্বের ধারণা থেকে। ব্রিটিশ ভারতের 'ভারতীয়'রা হিন্দু ও মুসলিম দুই পরিচয় নিয়ে মুসলমানেরা গঠন করল পাকিস্তান রাষ্ট্র। এই রাষ্ট্র গঠন সম্ভব হলো উপমহাদেশে মুসলমানদের একটা স্বতন্ত্র জাতি হিসেবে জন্মলাভের ফলেই। অতএব জাতির জন্মটাই এখানে মুখ্য। এ কারণেই পাকিস্তানের জন্মকে একটা রাষ্ট্রের জন্ম না বলে একটা জাতির জন্ম বলে অভিহিত করা হয়েছে।

আজকের দুনিয়ায় যখন ভাষা ও অঞ্চলভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র গঠনের বন্যা বয়ে চলেছে, সেই সময় মুসলিম জাতিভিত্তিক ভারত বিভাগ এবং রাষ্ট্র গঠন আধুনিক বিশ্বের এক নজিরবিহীন ঘটনা। এই জাতি গঠন ও রাষ্ট্র গড়ার মধ্য দিয়ে পাকিস্তান রাষ্ট্রের মুসলমানেরা অনন্য এক দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্রটি টিকল না আড়াই যুগও। পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রটির ২৫তম স্বাধীনতা দিবস আসার আগেই ভেঙে পড়ল রাষ্ট্রটি। পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হলো। অবশ্য পূর্ব পাকিস্তান স্বতন্ত্র স্বাধীন রাষ্ট্র বাংলাদেশে পরিণত হলেও ১৯৪৭-এর ভারত বিভাগ অক্ষুণ্ন্নই থাকল। পূর্ব পাকিস্তান যেমন ছিল মুসলিম আবাসভূমি, বাংলাদেশও সেই পরিচয়কেই গ্রহণ করল। বাংলাদেশ এ পরিচয়কে বড় করে না দেখলে আঞ্চলিক স্বার্থ, সুযোগ ও ভাষার ঐক্যকে সামনে রেখে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সঙ্গে মিশে যাওয়াই তার জন্যে যুক্তিযুক্ত ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গ বিভাগ টেকেনি কেন? টেকেনি কারণ, বিভাগটা ছিল প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক বিবেচনাপ্রসূত। এর বিরুদ্ধে কলকাতাবাসী শক্তিশালী যুক্তি উত্থাপন করেছিল অখণ্ড বাংলার, অখণ্ড

বাঙালি ও অখণ্ড বাঙালি জাতিসত্তার। শেষে এই যুক্তিই জয়ী হয়েছিল। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের সময় বঙ্গ বিভাগের প্রশ্নে এ যুক্তি উঠেছিল। বলা হয়েছিল, বাংলার অখণ্ডত্বের কথা। পাকিস্তান ভেঙে এক অংশ স্বতন্ত্র স্বাধীন বাংলাদেশ রাষ্ট্রে পরিণত হলো, অপর অংশ পাকিস্তানই থাকল। কিন্তু পাকিস্তান ভাঙার এই কাজটা হলো রক্তক্ষয়ী। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে পূর্ব পাকিস্তানে বিজয় লাভ করল শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জুলফিকার আলী ভুট্টোর পিপলস পার্টি। গণতন্ত্রের বিধান অনুসারে সংখ্যাগরিষ্ঠের সমর্থনপুষ্ট শেখ মুজিব সরকার গঠন করার কথা। কিন্তু শাসনতন্ত্র প্রণয়নের সময়কাল এবং শাসনতন্ত্রের প্রকৃতি নিয়ে বিতর্ক তুলে জাতীয় পরিষদ আহ্বানও করা হলো না এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরও হলো না। তার বদলে শুরু হলো ভুট্টো-সামরিক কোটারি-পাঞ্জাবি স্বার্থের কুৎসিত ষড়যন্ত্র। এই ষড়যন্ত্র যুক্তির বদলে শক্তির আশ্রয় গ্রহণ করল এবং সামরিক শক্তি দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের দাবি দমন করতে চাইল। এই পরিস্থিতিই ডেকে নিয়ে এল রক্তক্ষয়ী সংঘাত। এই সংঘাতেই ভেঙে গেল পাকিস্তান এবং সৃষ্টি হলো স্বাধীন বাংলাদেশের। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয় বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য রাজনৈতিক ঘটনা।

১৯৪৭ সালের পাকিস্তান-ভারত দেশভাগের মতো ১৯৭১ সালে পাকিস্তান আবার দেশভাগের শিকার হয়। পাকিস্তান ভাগের জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক মানসিকতা এবং বিমাতাসুলভ আচরণ দায়ী। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিবুর রহমানের নিরঙ্কুশ বিজয় পাকিস্তানের ভাঙন সুনিশ্চিত করে। ১৯৭০ সালের নির্বাচন পূর্ববঙ্গের আনুষ্ঠানিক রাজনৈতিক পরিচয় গড়ে দেয় এবং স্বতন্ত্র জাতিগত ও সাংস্কৃতিক স্বায়ত্তশাসনের দাবি প্রতিষ্ঠিত করে। শেখ মুজিবুর রহমানের 'মুক্তির আন্দোলন' সফল হলে পাকিস্তানের অন্যান্য অঞ্চলও স্বাধীনতার দাবি করবে, এই ভয়ে ইয়াহিয়া খান শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে বাঙালিদের 'মুক্তির আন্দোলন' নস্যাৎ করতে সর্বাপেক্ষা নৃশংস কৌশল বেছে নেন। স্বাধীন বাংলাদেশের আন্দোলন অতি দ্রুত জনপ্রিয় হয়ে ওঠার প্রধান কারণ ছিল ২৪ বছরের পাশবিক ঔপনিবেশিক শোষণ।

পশ্চিম পাকিস্তান ও পূর্ব পাকিস্তান যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে আবদ্ধ ছিল না, ঔপনিবেশিক সম্পর্কে সম্পর্কিত হয়। পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গের বা পূর্ব পাকিস্তানের ওপর নব্য ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপন করে। ২০০ বছরের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক মডেলে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গকে ২৪ বছর ধরে শোষণ করেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই শোষণের মাত্রা ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক সময়ের চেয়েও বেশি ছিল। সদ্য ঔপনিবেশিক শাসন থেকে মুক্তি পাওয়া কোনো অঞ্চল সমগোত্রীয় আরেকটি অঞ্চলের ওপর এরূপ উপনিবেশ স্থাপন করার ঘটনা বিশ্ব ইতিহাসে

বিরল। মানকেকার যথার্থই তাঁর গ্রন্থে বলেছেন, 'বিশ্ব থেকে যখন উপনিবেশবাদ বিদায় নিচ্ছে সে সময় পশ্চিম পাকিস্তান নব্য উপনিবেশবাদী রাষ্ট্রদর্শন অনাকাঙ্ক্ষিত হলেও তাদের রাজনৈতিক দর্শনে এটি সহজাত ছিল (পৃষ্ঠা- ১)।'

লেখক তাঁর গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে পূর্ববঙ্গের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ককে ঔপনিবেশিক সম্পর্ক হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে, পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানের আদৌ কোনো যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্ক ছিল না। পাকিস্তান সৃষ্টির সময় থেকে পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ববঙ্গ বা পূর্ব পাকিস্তানকে তাঁর ঔপনিবেশিক অঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করে এসেছে। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের প্রারম্ভে ভৌগোলিকভাবে বিচ্ছিন্ন দুটি অঞ্চল যুক্তরাষ্ট্রীয় সম্পর্কে সম্পর্কযুক্ত হওয়ার কথা ছিল। এই নব্য ঔপনিবেশিক শাসন তৎকালীন বৈশ্বিক রাজনীতির প্রেক্ষাপটে অভিনব বিষয় ছিল। এর ফলে বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলন ও স্বাধীনতার দাবির ন্যায্যতা বিশ্ববাসীর কাছে প্রমাণের জন্য ও তাদের সমর্থন আদায়ে বাংলাদেশকে অনেক বাধা ও প্রতিবন্ধকতা অতিক্রম করতে হয়েছে। বিশ্ববাসীর কাছে সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়ার গণতন্ত্রমনা ইমেজের মুখোশ খুলে দেওয়া ছিল সব থেকে বড় চ্যালেঞ্জ। কারণ ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচন আয়োজনের মধ্য দিয়ে ইয়াহিয়া একজন গণতন্ত্রপন্থী সামরিক শাসক হিসেবে শুধু বিদেশে নয়, পাকিস্তানে বিশেষত পশ্চিম পাকিস্তানে পরিচিতি পেয়েছিলেন।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ সাড়ে সাত কোটি মানুষের বিরুদ্ধে তিনি ইতিহাসের বর্বরোচিত জেনোসাইড শুরু করেন। দেশে-বিদেশে অনেকে প্রথমে তা সত্য বলে বিশ্বাস করতে বা মেনে নিতে পারেননি। ইয়াহিয়া খানের ওপর হিটলারের ভূত ভর করেছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ না থাকলেও অনেকেই সে সময় বিষয়টি এড়িয়ে গেছেন বা অগ্রাহ্য করেছেন। আন্তর্জাতিক মহলে যখন ইয়াহিয়া খান কর্তৃক পূর্ববঙ্গে সংঘটিত জেনোসাইডের খবর প্রকাশিত হয়, তখন অনেকে একে বানোয়াট এবং ষড়যন্ত্রমূলক আখ্যা দিয়ে প্রত্যাখ্যান করেন। কিন্তু অতি স্বল্প সময়ের মধ্যেই তাঁদের এই ভ্রান্ত আস্থা ও বিশ্বাসের স্তম্ভ ভেঙে পড়ে, যখন পূর্ববঙ্গে দায়িত্ব পালনকারী বিদেশি সংবাদদাতাদের একের পর এক প্রামাণ্য প্রতিবেদন আন্তর্জাতিক গণমাধ্যমে প্রকাশিত হয়। ইয়াহিয়া খান এবং তাঁর জেনারেলদের নেতৃত্বে সামরিক বাহিনী কীভাবে পূর্ববঙ্গের বর্তমান এবং ভবিষ্যৎ নেতৃত্বের উৎস বুদ্ধিজীবী সমাজ তথা ছাত্র, শিক্ষক, রাজনীতিবিদ ও পেশাদার ব্যক্তিবর্গকে নিধনের মাধ্যমে রাজনৈতিকভাবে সচেতন বাঙালি জনগোষ্ঠীকে নিশ্চিহ্ন করতে যে আগ্রাসী হামলা চালায়, তার নগ্ন রূপ প্রকাশিত এবং প্রচারিত প্রামাণ্য সংবাদ এবং প্রতিবেদনগুলো থেকে জানা যায় (পৃষ্ঠা ১-২)।

অনুরূপভাবে ইয়াহিয়া খান পরিচালিত বাঙালি নিধনের হলোকাস্টে এক সপ্তাহের মধ্যে ঢাকায় ১০ হাজারসহ সারা দেশে দুই লাখ মানুষ হতাহত হওয়ার বিষয়টি আন্তর্জাতিক মহলে বানোয়াট সংবাদ হিসেবে পরিগণিত হয়। অবশ্য পরবর্তী সময়ে প্রমাণিত হয় এই সংখ্যা শুধু সত্য নয় বরং আরও কয়েক গুণ বেশি ছিল। পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেসামরিক ছাত্রাবাস ট্যাংক হামলা চালিয়ে গুঁড়িয়ে দেয় এবং নিরীহ, নিরস্ত্র ছাত্র ও শিক্ষক এবং পুরান ঢাকার সংখ্যালঘু হিন্দুদের ওপর নির্বিচারে হামলা চালিয়ে তাদের নৃশংসভাবে হত্যা করে।

ইয়াহিয়া খানের সংঘটিত জেনোসাইড বা হলোকাস্ট আরও কিছুদিন চাপা থাকত যদি না তিনি পূর্ব পাকিস্তানে দায়িত্বরত ৩৫ জন বিদেশি সংবাদদাতাকে অপমানজনকভাবে বহিষ্কার না করতেন। ইয়াহিয়ার পূর্ববঙ্গের সামরিক প্রশাসন ৩৫ জন বিদেশি সাংবাদিককে গৃহবন্দী রাখে এবং তাঁদের নোটবুক, ক্যামেরার রিল ইত্যাদি জব্দ করে জোর করে ঢাকা ত্যাগ করতে বাধ্য করে। পরবর্তী সময় বিভিন্নভাবে অনুপ্রবেশকারী বিদেশি সাংবাদিকদের প্রতিবেদনে পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানি বাহিনীর বর্বরতার সত্য কাহিনি তুলে ধরা হয়। বিদেশি গণমাধ্যমে প্রচারিত প্রামাণ্য সংবাদ প্রতিবেদনের মাধ্যমে পাকিস্তানের সাম্প্রদায়িক সহিংস আগ্রাসনের বিষয়টি সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। গ্রন্থকারের মতানুসারে, পাকিস্তানি বাহিনীর জেনোসাইডের দুটি প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—প্রথমত, পূর্ববঙ্গের সনাতন ধর্মাবলম্বীদের (হিন্দু) হত্যা করা অথবা ভারতে পালিয়ে যেতে বাধ্য করার মাধ্যমে তাদের সংখ্যা শূন্যতে নামিয়ে আনা। দ্বিতীয়ত, অবিভক্ত পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের সংখ্যালঘিষ্ঠে পরিণত করা। উল্লেখ্য, ১৯৭১ সালে পূর্ববঙ্গে ৮০ লাখ সনাতন ধর্মাবলম্বী বসবাস করত এবং অবিভক্ত পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ (সাড়ে সাত কোটি) ছিল বাঙালি জনগোষ্ঠী।

ইয়াহিয়া খানের সামরিক প্রশাসন পরবর্তী সময় তাদের অপকর্ম সম্পর্কে প্রচারিত সংবাদ প্রতিবেদনগুলোকে বানোয়াট ও ষড়যন্ত্রমূলক প্রমাণ করার জন্য বিভিন্ন দেশের গণমাধ্যমের সংবাদদাতাদের পূর্ব পাকিস্তান পরিদর্শনের আমন্ত্রণ জানায়। পাকিস্তান সরকার সুনিয়ন্ত্রিতভাবে আগত বিদেশি সংবাদকর্মীদের পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন এলাকা পরিদর্শনে নিয়ে যায়। অবশ্য এই প্রচেষ্টা যে ব্যর্থ হয়েছে তার প্রমাণ অ্যান্থনি মাসকারেনহাসের পশ্চিম পাকিস্তানের করাচিভিত্তিক ইংরেজি দৈনিক *মর্নিং নিউজ*-এর দায়িত্ব পরিত্যাগ এবং পূর্ব পাকিস্তানে সংঘটিত জেনোসাইড নিয়ে *দ্য সানডে টাইমসে* সংবাদ প্রতিবেদন প্রকাশ। ঢাকা ও কুমিল্লায় পাকিস্তানি জেনারেলরা ৩০ বছর পূর্ব পাকিস্তানে তাদের উপনিবেশ টিকিয়ে রাখার প্রয়োজনে ২০ লাখ বাঙালিকে হত্যা করবে বলে অ্যান্থনি মাসকারেনহাস তাঁর প্রতিবেদনে উল্লেখ করেছেন।

মানকেকার তাঁর গ্রন্থে তৎকালীন সময়ে অনেক রাজনৈতিক বিশ্লেষকের বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য মুক্তিসংগ্রামকে নাইজেরিয়ার বায়োফ্রার বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের সঙ্গে তুলনা করাকে অযৌক্তিক বলে মন্তব্য করেছেন। তাঁর মতে, ইগবো নাইজেরিয়ার সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এবং তারা সশস্ত্র স্বাধীনতা আন্দোলনের আগে শান্তিপূর্ণ উপায়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ লগোসদের সঙ্গে রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছাতে চেষ্টা করেনি। কিন্তু পাকিস্তানে বাঙালিরা সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল এবং যথার্থভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালিদের নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বলেছেন, 'সংখ্যাগরিষ্ঠ কখনো সংখ্যালঘিষ্ঠের কাছ থেকে বিচ্ছিন্ন হতে পারে না। বস্তুত বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নয়, বরং স্বাধীনতার জন্য ন্যায়যুদ্ধ ছিল' (পৃষ্ঠা ৫)। পূর্ববঙ্গ সশস্ত্র স্বাধীনতাসংগ্রামের পূর্বে লাগাতার ২০ বছর অসীম বৈষম্য হ্রাসের জন্য সংবিধান সংশোধন এবং স্বায়ত্তশাসনের জন্য আন্দোলন করেছে। আর বরাবর পশ্চিম পাকিস্তানভিত্তিক পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকার সে আন্দোলনকে সহিংস পন্থায় দমনের চেষ্টা করেছে। পূর্ববঙ্গের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সর্বোচ্চ নিদর্শন ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে অবশ্যম্ভাবীভাবে শেখ মুজিবুর রহমানের নেতৃত্বে আওয়ামী লীগের নিরঙ্কুশ বিজয় অর্জন। এই বিজয় স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে গণরায়ের নামান্তর।

পূর্ববঙ্গের এই যৌক্তিক এবং গণদাবি পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর কাছে অনভিপ্রেত ছিল। ইয়াহিয়া খানের সামরিক প্রশাসনের প্রাগুক্ত ধারণা ছিল না যে, আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা এত বেশি যে সাধারণ নির্বাচনে জনগণের রায় একচ্ছত্রভাবে আওয়ামী লীগের পক্ষে যাবে। তারা কোনোভাবেই পূর্ববঙ্গের ওপর তাদের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং আমলাতান্ত্রিক খবরদারি খর্ব হোক, তা মেনে নিতে পারেনি। পাকিস্তানের কেন্দ্রের শাসনক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী এই গোষ্ঠী পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে পাকিস্তানের আপামর জনসাধারণকে গণতন্ত্র থেকে বঞ্চিত রেখে এসেছে।

বস্তুত ক্ষমতার এরূপ পটপরিবর্তন পাকিস্তানের প্রথাগত সেনা-আমলা-ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের জন্য হজম করা শক্ত ছিল। সেনা-আমলা-ব্যবসায়ী নিয়ন্ত্রিত কেন্দ্রীয় সরকারের শঙ্কা ছিল, শেখ মুজিবুর রহমান ক্ষমতায় এলে পাকিস্তানের সামরিক বাহিনী ও তাঁর কলেবর সংকোচন, প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের উদারীকরণ করবে। ইয়াহিয়া শেখ মুজিবুর রহমানকে তাঁর ছয় দফা থেকে সরিয়ে আনতে বিভিন্ন ধরনের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক চাপ সৃষ্টি করেন। এই উদ্যোগ ব্যর্থ হলে ইয়াহিয়া চরমপন্থী সমাধান হিসেবে বাঙালি জাতিকে নিশ্চিহ্ন করার নীতি গ্রহণ করেন। ইয়াহিয়ার এই

পৈশাচিক ও অমানবিক নীতির ব্যাপারে শুরুতে বিশ্ব জনমত জাতিসংঘ সনদের দোহাই দিয়ে বিষয়টি পাকিস্তানের একান্তই অভ্যন্তরীণ এই অজুহাতে নীরব ভূমিকা পালন করে। মুসলিম বিশ্ব এই ঘৃণ্য ও বর্বরোচিত হত্যাযজ্ঞের প্রতিবাদ করেনি। মুসলিম বিশ্বের বদ্ধমূল ধারণা ছিল, কোনো মুসলিম দেশ এ ধরনের ন্যক্কারজনক কাণ্ড করতেই পারে না। আবার অনেকে এই অঞ্চলের (পূর্ববঙ্গের) জনগোষ্ঠীকে মুসলিমই মনে করত না। অন্যদিকে বিশ্বের পরাশক্তিগুলো তাদের ক্ষমতার দ্বৈরথের প্রয়োজনে পূর্ববঙ্গের মতো পশ্চাৎপদ অঞ্চল ও জনগোষ্ঠীর স্বাধীনতা এবং জীবনমালের নিরাপত্তাকে খুব একটা গুরুত্ব দেয়নি। যুক্তরাষ্ট্র বামভাবাপন্ন পূর্ববঙ্গের জন্য দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশীদার পাকিস্তানের পক্ষ ত্যাগ করতে মোটেও আগ্রহী ছিল না। ভারতের সঙ্গে বৈরী সম্পর্কের কারণে চীন পাকিস্তানকে সমর্থন অব্যাহত রাখে। শুধু জনমতের চাপে ব্রিটেন পশ্চিম পাকিস্তানি কর্মকাণ্ডের আনুষ্ঠানিক বিরোধিতা করে। দক্ষিণ এশিয়ায় চীনের আধিপত্য বিস্তার রুখতে সোভিয়েত ইউনিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানের সরাসরি বিরোধিতা করে। পরাশক্তিগুলোর পররাষ্ট্রনীতির একগুঁয়েমি অবস্থান জাতিসংঘের পূর্ব বাংলার জরুরি আবেদনে সাড়া দেবার পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়।

ইয়াহিয়া খান 'অভ্যন্তরীণ বিষয়ের' অজুহাতে তাঁর জেনোসাইড পরিকল্পনা বাস্তবায়নের প্রয়াস পান। অথচ ন্যুরেমবার্গ সনদের অনুচ্ছেদ ২-এর ৭ম ভাগে বলা হয়েছে, আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ কোনো বিষয় 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' বিবেচিত হবে না। জাতিসংঘে বাংলাদেশের সংগ্রামকে 'আন্তর্জাতিক ইস্যু' ঘোষণা করলে পরিস্থিতি এত নাজুক হতো না বলে যথার্থভাবে রহমতউল্লাহ খান মন্তব্য করেছিলেন। জাতিসংঘের সনদের ৯৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে মহাসচিব নিরাপত্তা পরিষদে সরাসরি আন্তর্জাতিক নিরাপত্তা ও শান্তির জন্য হুমকিস্বরূপ বিরোধ নিষ্পত্তির বিষয়ে প্রস্তাব পেশ করতে পারেন। কঙ্গোর ক্ষেত্রে এরূপ ক্ষমতার প্রয়োগের নজির দেখা যায়। মানকেকার জাতিসংঘের ক্ষমতা ব্যবহারের অক্ষমতা বা পক্ষপাতদুষ্টের ব্যাপারে ড. সালভাদর মাদারেঙ্গার উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

> "জাতিসংঘে যদি দুটি ক্ষুদ্র দেশের বিরোধ উত্থাপিত হয়, তাহলে বিরোধটি উবে যায়। কিন্তু যদি একটি ক্ষুদ্র দেশ ও পরাশক্তির মধ্যকার বিরোধ উত্থাপিত হয়, তাহলে ক্ষুদ্র দেশটি উবে যায়। আর যদি দুই পরাশক্তির মধ্যকার বিরোধ উত্থাপিত হয়, তাহলে জাতিসংঘ উবে যায় (পৃষ্ঠা-৯)।'

মানকেকারের মতে, একই স্থানে যেমন উপর্যুপরি বজ্রপাত হয় না, তেমনি কোনো অঞ্চলে অন্তত ২০০ বছরের কম সময়ের ব্যবধানে ঔপনিবেশিক শাসন স্থাপিত হয় না (পৃষ্ঠা-১০)। ব্রিটিশ ২০০ বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের পর পূর্ববঙ্গ ২৪ বছর পাকিস্তান নামক কল্পিত রাষ্ট্রের নব্য উপনিবেশ হিসেবে শোষিত ও

নিষ্পেষিত হয়েছে। ব্রিটিশ ও পাকিস্তানি উপনিবেশবাদের মধ্যে বৈশিষ্ট্যগত সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য নৃশংসতার মানদণ্ডে পাকিস্তান ব্রিটিশদের থেকে হাজার গুণ এগিয়ে ছিল। তিনি ব্রিটিশ উপনিবেশের সঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গে ঔপনিবেশিক শাসনের সাদৃশ্য এবং উত্তরসূরি সূত্র খুঁজে পেয়েছেন। জওহরলাল নেহরু তাঁর *দ্য ডিসকভারি অব ইন্ডিয়া* গ্রন্থে উনিশ শতকের ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে উল্লেখ করেন—

> 'শিল্পপ্রধান ইংল্যান্ডের শিল্পের জন্য কাঁচামাল সরবরাহের জন্য ভারতকে কৃষিপ্রধান উপনিবেশ হিসেবে গড়ে তোলা ছিল আধুনিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য।' (পৃষ্ঠা ১০-১১)

গ্রন্থকারের মতে, পাকিস্তানে পূর্ববঙ্গের ওপর ঔপনিবেশিক শাসন আধুনিক ঔপনিবেশিক অর্থনীতির প্রাগুক্ত উদাহরণের পুনরাবৃত্তি। মানকেকারের মতে, ১৮ ও ১৯ শতকে ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনামলে তাঁতশিল্পকে যেমন ব্রিটিশ বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল সরবরাহের প্রয়োজনে এবং তৈরি পোশাকের বাজার রক্ষার্থে ধ্বংস করা হয়েছে, তদ্রূপ পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীও নিজেদের তৈরি পোশাকের বাজার সম্প্রসারণের জন্য পূর্ববঙ্গের তাঁতশিল্পকে ধ্বংস করেছে। ইংল্যান্ডের জবরদস্তিমূলক নীতি ও রপ্তানি নিষেধাজ্ঞার ফলে শত শত কারিগর ও নকশাকার বেকার হয়ে পড়েন। একই রকম জবরদস্তিমূলক নীতি গ্রহণ করা হয়েছিল পাকিস্তানি আমলে। এর ফলে বাংলাদেশের শত শত হস্তশিল্পী বেকার হন। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বিজয়-পরবর্তী ঢাকা চেম্বার অব কমার্সের সংবর্ধনায় ২০ লাখ হস্তশিল্প কারিগর কেন্দ্রীয় সরকারের পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পের বাজার রক্ষার জন্য গৃহীত পক্ষপাতদুষ্ট নীতির কারণে বেকার হয়েছেন বলে শেখ মুজিবুর রহমান অভিযোগ আনেন। তিনি আরও অভিযোগ করেন, পশ্চিম পাকিস্তানের তৈরি কাপড়ের দাম জাপানের তৈরি কাপড়ের দামের ছয় গুণ। অথচ জনগণকে বাধ্য করা হচ্ছে উচ্চমূল্যে কাপড় ক্রয়ে। অন্যদিকে বাঙালি পাটচাষিদের ও চা-শ্রমিকদের ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন পাকিস্তান আমলেও হয়নি। কিন্তু পাট ও চা ছিল পাকিস্তানের প্রধান বৈদেশিক মুদ্রা আয়ের খাত। অথচ পূর্ববঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের কোনো উল্লেখযোগ্য বিনিয়োগ হয়নি। পণ্যের মতো সেবা খাতও ছিল অবহেলিত পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চলে (পৃষ্ঠা ১১-১৬)। পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থে পূর্ববঙ্গে উপনিবেশ অর্থনীতি স্থাপন করা হয়। পূর্ববঙ্গের ঔপনিবেশিক শোষণের ফলে পশ্চিম পাকিস্তানের ব্যবসায়ীরা শুধু নন, আমলারাও লাভবান হয়েছেন। পূর্ববঙ্গ যে বিশ্বের আটটি দরিদ্রতম অঞ্চলের একটিতে পরিণত হয়, এর দায় পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর। পাট যেখানে পাকিস্তানের প্রধান বৈদেশিক আয়ের উৎস, সেখানে পূর্ববঙ্গের ঢাকায় এবং চট্টগ্রামে সে রকম কোনো পাট কারখানা গড়ে ওঠেনি বা গড়ে তোলা হয়নি।

পশ্চিম পাকিস্তানের ক্রমাগত ঔপনিবেশিক শোষণ পূর্ববঙ্গের স্বতন্ত্র জাতীয়তাবাদকে উসকে দেয় এবং আরও সংঘবদ্ধ করে। বাঙালি পরিচয়বাহী বৈশিষ্ট্যগুলো ক্রমশ পূর্ববঙ্গের মানুষের কাছে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পাকিস্তানি পরিচয় যখন ক্ষয়িষ্ণু, তখন বাঙালি পরিচয় আরও সুস্পষ্ট হতে শুরু করে। শেখ মুজিবুর রহমান বাঙালির এই সংগ্রামকে 'মুক্তির সংগ্রাম' আখ্যা দিয়েছেন (পৃষ্ঠা ৩৪)। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী শাসনকালে শোষণ এবং অপমানের ফলে পুঞ্জীভূত জনরোষ যেমন ১৮৫৭ সালের সিপাহি বিপ্লবের মাধ্যমে বিস্ফোরিত হয়, পশ্চিম পাকিস্তানের ঔপনিবেশিক শাসনামলেও তা-ই ঘটে। বাঙালি দুর্বল এবং যুদ্ধে অপারঙ্গম—এই অজুহাতে বাঙালিদের সামরিক বাহিনী উচ্চপদ থেকে বঞ্চিত করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী বাঙালি অধস্তন উপজাতি—এই অজুহাতে তাদের ওপর উর্দু রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করে। ভাষা কেড়ে নেওয়ার এই চেষ্টা সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের অংশ ছিল। পাকিস্তানি সরকারের উর্দুকে বাঙালিদের ওপর রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা সাংস্কৃতিক বিপ্লবের জন্ম দেয়। দেশভাগের পর রাজনৈতিক পটপরিক্রমায় বাংলা বাঙালি সংস্কৃতি ও জাতীয়তাবাদের শক্তিশালী উদ্দীপকে পরিণত হয় (পৃষ্ঠা ৩৫)। বাঙালি সাংস্কৃতিক নবজাগরণের ফলে বাঙালিদের কাছে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য স্পষ্টতর ও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্বসূরি যেমন পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত, তেমনি পূর্ববঙ্গের মুসলমান সমাজের পূর্বসূরিদের সঙ্গে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সম্পর্ক ছিল।

১৯৪৮ সালে জিন্নাহর উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার মধ্য দিয়ে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের ভাষাভিত্তিক যে বিরোধের সূত্রপাত হয়, তার পরিণতি ছিল বাঙালি জাতীয়তাবাদের বিকাশ এবং ১৯৭১ সালে বাঙালির সর্বাত্মক স্বাধীনতার সংগ্রাম। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর আরবি হরফে বাংলা লৈখিক রীতি প্রবর্তনের চেষ্টা কিংবা ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২-এর মতো ছাত্রদের প্রতিবাদ মিছিল-সমাবেশের ওপর নির্বিচারে গুলিবর্ষণ ও সান্ধ্য আইন আরোপ—কিছুই এই জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশকে রুখতে পারেনি। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী চীনের নীতি-কৌশল অনুসরণ করে বাঙালিদের সাংস্কৃতিক পরিচয় পরিবর্তনের চেষ্টা করে তা সময়ের পরিক্রমায় অসাড় ও অকার্যকর প্রমাণিত হয় (পৃষ্ঠা ৩৭)। পশ্চিম পাকিস্তানের আমলা এবং পরবর্তী সময় পাকিস্তান সরকারের মহাসচিব চৌধুরী মুহাম্মাদ আলী ১৯৫০ সালে পাকিস্তান সরকারের কাছে দুটি দিকনির্দেশনা পেশ করেছিলেন—

১. আজ অথবা কাল পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তান থেকে বেরিয়ে যাবে। সুতরাং সরকারের এই অঞ্চলের অর্থনৈতিক প্রয়োজনীয়তার প্রতি গুরুত্ব দেওয়া নিষ্প্রয়োজন।
২. পূর্ববঙ্গে হিন্দুদের সংখ্যা হ্রাসের জন্য সরকারের উপায় অনুসন্ধান করতে হবে (পৃষ্ঠা ৪০)।

পাকিস্তানের জন্ম থেকেই পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে যোজন যোজন দূরত্ব ক্রমশ স্পষ্টতর হতে থাকে। পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গের ঔপনিবেশিক শোষণ এবং বৈরী মনোভাব শুধু এই দূরত্বকে দ্রুত সম্প্রসারিত করে। শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত বলে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী যে অভিযোগ করেছিল, তা বহুলাংশে ভ্রান্ত ও বানোয়াট। পূর্ববঙ্গের রাজনৈতিক নেতৃত্ব শুধু এ অঞ্চলের প্রতি অর্থনৈতিক ন্যায্যতা, ক্ষমতার অংশীদারি দাবি করেছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তান এ দাবিগুলো মেনে নিলে তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য হারাবে—এই আশঙ্কায় ন্যায্য দাবিগুলোকে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রচারণা হিসেবে আখ্যায়িত করে। ঐতিহাসিকভাবে সামন্তবাদী পাঞ্জাবিদের তুলনায় বাঙালি হিন্দু বা মুসলিম-নির্বিশেষে সবাই রাজনৈতিকভাবে স্বাধীনচেতা ও বুদ্ধিদীপ্ত। লন্ডনভিত্তিক *দ্য ইকোনমিস্ট* বাঙালি জাতিকে রাজনৈতিকভাবে ভারতের সবচেয়ে সচেতন জাতি হিসেবে আখ্যায়িত করেছিল (পৃষ্ঠা ৪২)।

পূর্ববঙ্গের মুসলিম সমাজের সঙ্গে ভারতীয় উচ্চবর্ণের মুসলিম বা উত্তর ভারতের মুসলিমদের সম্পর্ক ব্রিটিশ আমল থেকেই শীতল ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী ছিল মূলত উত্তর ভারতের মুসলিম সমাজের উত্তরসূরি, যারা দেশভাগের ফলে পাকিস্তানের পশ্চিমাংশে পাড়ি জমায় এবং অত্র অঞ্চলের নেতৃত্ব গ্রহণ বা দখল করে। বাঙালি মুসলমানেরা দেশভাগের ফলে তাদের ভাগ্যবিড়ম্বনার অচিরেই অবসান করবে বলে যে আকাশকুসুম কল্পনা করেছিল, তা অচিরেই ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়। দেশভাগের আগে যেখানে বাঙালি মুসলিমরা ভারতীয় মুসলমানদের জন্য আলাদা আবাসভূমির নেতৃত্বে আসীন ছিল, সেখানে তাদের পাকিস্তানের জন্মের পর কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব থেকে বিতাড়িত করা হয় (পৃষ্ঠা ৪৬)। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাবের মাধ্যমে ভারতীয় মুসলমানদের জন্য একাধিক স্বাধীন আবাসভূমির প্রস্তাব একজন বাঙালি মুসলিম নেতা শেরেবাংলা এ কে ফজলুল হক পেশ করেছিলেন।

১৯৪৬ সালে প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগের জয়ের নায়ক ছিলেন একজন বাঙালি মুসলিম রাজনীতিবিদ হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী। প্রাদেশিক নির্বাচনে মুসলিম লীগ ১১৯ আসনের মধ্যে ১১৬টি আসনে বিজয়ী হয়। অথচ উত্তর ভারতে ৩৮টি আসনের মধ্যে তারা মাত্র ১৭টি আসনে বিজয়ী হয়েছিল (পৃষ্ঠা ৪৭)। বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রীয় ও আঞ্চলিক হিন্দু নেতাদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন, হিন্দু-মুসলিম ঐক্য সম্ভব নয়। বাঙালি মুসলিম নেতারা মনে করেছিলেন, তাঁদের রাজনৈতিক নেতৃত্বের নিয়ন্ত্রণ এবং

সংখ্যাগরিষ্ঠ হিসেবে পাকিস্তানের শাসনভার তাঁদের ওপর বর্তাবে। কিন্তু উত্তর ভারতীয় নেতৃত্বের সূক্ষ্ম চালে বাঙালি মুসলিম নেতারা মার খেয়ে যান। পাকিস্তান ঘোষণাপত্রের রচয়িতা চৌধুরী খালেকুজ্জামান রাষ্ট্রগুলোর স্থলে শুধু রাষ্ট্র শব্দটি ব্যবহার করেন (পৃষ্ঠা ৪৮)। বিষয়টি অনেক বাঙালি মুসলিম নেতা জানতেন না, অথবা বুঝতে পারেননি। অবশ্য ঘোষণাপত্র প্রণয়ন কমিটিতে কোনো বাঙালি সদস্য ছিলেন না এবং সন্দেহাতীতভাবে বিষয়টি পূর্বপরিকল্পিত ছিল। পাকিস্তানের জন্ম থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের সঙ্গে যে ধরনের ছলনা ও বঞ্চনা করা হয়েছিল, তা হজম করা তাদের জন্য কষ্টসাধ্য ছিল। মুসলমানদের জন্য স্বাধীন আবাসভূমির দাবিতে শুধু বাংলায় ৯৯ শতাংশ ভোট পড়েছিল। বাংলার মতো অবিভক্ত ভারতের মুসলিম অধ্যুষিত অন্যান্য অংশে স্বাধীন আবাসভূমির দাবির পক্ষে জনমত জোরাল ছিল না। দেশভাগের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানে রাজনৈতিক মেরুকরণ শুরু হয় এবং দ্রুত পাকিস্তানের নেতৃত্ব বাঙালিদের হাত থেকে উত্তর ভারত থেকে আসা মোহাজির নেতাদের হাতে চলে যায়। বাঙালি মুসলিম লীগের নেতা বেগম ইকরামুল্লাহ তাঁর *পর্দা ইন পার্লামেন্ট* গ্রন্থে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা উদ্ধৃত করে বলেন—

> '... আমি ইতঃস্তত কাটিয়ে যখন করাচি এবং ঢাকায় গণপরিষদের ফিরতি বৈঠকের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলাম; প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'নারীরা কখনো বাস্তব সমস্যা বোঝে না।' তখন আমি প্রত্যুত্তরে জবাব দিলাম, 'আমরা যদি বুঝতাম তাহলে আমরা আজকের এই পাকিস্তান পেতাম না।' (পৃষ্ঠা- ৫১)

১৯৪৮ সালে প্রথমবারের মতো একজন বাঙালি গণপরিষদে পাকিস্তানে পূর্ব পাকিস্তানের জনসাধারণ অবহেলার শিকার হচ্ছে এবং পশ্চিম পাকিস্তান পূর্ব পাকিস্তানকে উপনিবেশ হিসেবে দেখছে বলে অভিযোগ করেন। ভাষার প্রশ্নে পশ্চিম পাকিস্তানের বৈরী মনোভাবের পর ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গের দুর্ভিক্ষ পশ্চিম পাকিস্তানের বিমাতাসুলভ আচরণকে আরও প্রত্যক্ষ করে তোলে। ১৯৫১ সালে পূর্ব বাংলা থেকে নির্বাচিত প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দিন ভাষা প্রশ্নে বিরোধ আবার উসকে দেন উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার মাধ্যমে। খাজা নাজিমউদ্দিনের এই হঠকারী উদ্যোগের প্রতিবাদ রক্তক্ষয়ী রূপ নেয়। ২০ জন ছাত্র ও সাধারণ মানুষকে ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে গুলি করে হত্যার পর দুর্বার জন-আন্দোলনের মুখে কেন্দ্রীয় সরকারের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ স্থগিতের মাধ্যমে ভাষার প্রশ্নে সংগ্রামের সাময়িক ইতি বা সমঝোতা স্থাপিত হয়। অন্যদিকে আহমদিয়াবিরোধী দাঙ্গায় নাজিমউদ্দিন পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সমর্থন হারান। অবশ্য পূর্ব বাংলার নেতৃত্ব হস্তগত করার জন্য ষড়যন্ত্রমূলকভাবে এই দাঙ্গা লাগানো হয়েছিল বলে জানা যায়। ১৯৫৩ সালে তিনটি স্থানীয় রাজনৈতিক দল—এ কে ফজলুল হকের কৃষক-শ্রমিক লীগ, শহীদ সোহরাওয়ার্দীর আওয়ামী মুসলিম লীগ ও নেজাম-ই-ইসলাম ২১ দফার ভিত্তিতে মুসলিম লীগবিরোধী মোর্চা গঠন করে।

এই মোর্চা পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরোধী ছিল। ১৯৫৪ সালের সাধারণ নির্বাচনে এই মোর্চা ১৯৭০ সালের আওয়ামী লীগের মতো নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। ৩১০টি আসনের মধ্যে তারা ২২৬টিতে জয়লাভ করে। নুরুল আমিনের মতো মুসলিম লীগের ডাকসাইটে নেতা মোর্চার ১৮ বছর বয়সী তরুণ প্রতিদ্বন্দ্বীর কাছে হেরেছেন। ফজলুল হকের সরকারকে ক্ষমতাচ্যুত করতে নারায়াণগঞ্জের আদমজী পাটকলে অ-বাঙালিদের সঙ্গে বাঙালিদের দাঙ্গা লাগানো হয়। কলকাতায় ৩০ মে ফজলুল হকের আবেগঘন বক্তব্যের অপব্যাখ্যা দিয়ে তাঁকে দেশদ্রোহী প্রমাণের চেষ্টা করা হয়। ফজলুল হক এই অপব্যাখ্যার জবাব দিলেও তার প্রতি কর্ণপাত না করে তাঁকে গৃহবন্দী করা হয় এবং কেন্দ্রীয় সরকার ইস্কান্দর মির্জাকে গভর্নর নিযুক্ত করে ঢাকা প্রেরণ করে।

মওলানা ভাসানী ১৯৫৬ সালের জানুয়ারিতে এক জনসমাবেশে কেন্দ্রীয় সরকার পূর্ব বাংলার জনমানুষের দাবি পূরণ না করলে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হবে বলে হুঁশিয়ারি দেন। আইয়ুব খান রক্তপাতহীন ক্যু-এর মাধ্যমে পাকিস্তানের রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিলেন। তিনি তাঁর ক্ষমতা দখলকে বিপ্লব আখ্যায়িত করেছিলেন (পৃষ্ঠা ৭৪)। ১৯৫৯ সালে আইয়ুব খান জাতীয় পুনর্গঠন ব্যুরো প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই প্রতিষ্ঠান কোনো কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেনি। ব্যুরো জনপ্রচারণার মাধ্যমে আবেগঘন সংহতিকরণের প্রচেষ্টা চালায়, যা ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ক্ষমতার স্থায়িত্ব বাড়াতে আইয়ুব খানের পূর্ববঙ্গের সমর্থনের প্রয়োজন ছিল। এই প্রয়োজনে মৌলিক গণতন্ত্রের নামে তিনি পূর্ববঙ্গের অনেক স্থানীয় নেতাকে তাঁর দলে সম্পৃক্ত করেন।

আইয়ুব খান ১৯৬৫ সালের পাকিস্তান-ভারত যুদ্ধে বাঙালি সমর্থন আদায়ে ভারত সফরের সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের ওপর ভারতীয়রা হামলা চালিয়েছে, এমন অপপ্রচার চালান। পরবর্তী সময় জানা যায়, এ ধরনের কোনো ঘটনা আদৌ ঘটেনি। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনৈতিক নেতা ও আমলাদের সঙ্গে কোন্দলের জের ধরে আইয়ুববিরোধী মোর্চা পশ্চিম পাকিস্তানে সংগঠিত হতে থাকে। পূর্ববঙ্গেও আওয়ামী লীগের সঙ্গে দ্বন্দ্বের জের ধরে আইয়ুব সরকার তার সমর্থন হারায়। ১৯৬৯ সালে পূর্ববঙ্গে আইয়ুববিরোধী গণ-অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়।

১৯৬৯ সালে ইয়াহিয়া খান আইয়ুব খানকে অপসারণ করে পাকিস্তানের ক্ষমতা

দখল করেন। ১৯৫০-এর দশকে আওয়ামী লীগ তরুণ নেতৃত্বের হাত ধরে নবরূপে আবির্ভূত হয়। ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমানের ছয় দফা দাবি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির পাশাপাশি বঞ্চনা ও শোষণে অতিষ্ঠ জনগণের খণ্ডিত অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক স্বপ্নগুলোকে এবং রাজনৈতিকভাবে জাতীয়তাবাদী চেতনায় সংগঠিত করে এবং নব্য জাতি হিসেবে নতুন আত্মপরিচয়ে পরিচিত করে তোলে। ১৯৬৯ সালে ছাত্র-শ্রমিকদের আওয়ামী লীগের ৬ দফাসহ ১১ দফা এবং আইয়ুববিরোধী গণ-অভ্যুত্থান আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তাকে উচ্চ শিখরে নিয়ে যায়। ১৯৭০ সালে পাকিস্তানে প্রাদেশিক ও জাতীয় পরিষদের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ বিজয়ের মাধ্যমে আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তার প্রতিফলন ঘটে।[১] পূর্ব বাংলায় আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা যত বৃদ্ধি পেয়েছে, তত পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতাসীন শাসকগোষ্ঠী, ক্ষমতা নিয়ন্ত্রণকারী আমলা ও সামরিক সদস্যদের মধ্যে পূর্ব বাংলার জনগণের প্রতি অসহিষ্ণুতা ও ঘৃণা তত বেড়েছে।[২]

১৯৭০ সালের নির্বাচনে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রাপ্তি সত্ত্বেও আওয়ামী লীগের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরে গড়িমসি, কালক্ষেপণ এবং আওয়ামী লীগের বিরুদ্ধে বিভ্রান্তিকর ও উসকানিমূলক বিদ্বেষী প্রচারণা চালায় পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রশাসন এবং পশ্চিম পাকিস্তানে পাঞ্জাবিদের পছন্দের দল হিসেবে আবির্ভূত পিপলস পার্টির কান্ডারি জুলফিকার আলী ভুট্টো। জুলফিকার আলী ভুট্টো তাঁর পূর্ব কর্মসূত্রে পাঞ্জাবনিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানের আমলাতন্ত্র ও সামরিক প্রশাসনের সঙ্গে ব্যক্তিগত সুসম্পর্কের ফায়দা নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান ও তাঁর দল আওয়ামী লীগকে নিষ্ক্রিয় করতে সচেষ্ট হন।

প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তানের তৎকালীন সামরিক প্রশাসনকে পূর্ব বাংলার রাজনৈতিক নেতৃত্ব এবং কর্মী ও সমর্থকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে সামরিক ব্যবস্থা গ্রহণে ইন্ধন জোগায়। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক বৈষম্য জাতিগত ঘৃণা, পারস্পরিক মতবিরোধ তৈরি করে এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার অপমৃত্যু ঘটায়। অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির স্বৈরাচারী ও বর্ণবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের জন্য পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐকমত্যের শেষ সম্ভাবনাও নস্যাৎ হয়ে যায়।

আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী এবং ব্যবসায়ী সম্প্রদায় যেমন পাঞ্জাবিদের নিয়ন্ত্রণে ছিল, তেমনি বাঙালি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং তাদের দাবি ছিল ন্যায্য। এর ফলে ১৯৭০ সালে ইয়াহিয়া খানের সাধারণ নির্বাচনে পাঞ্জাবনিয়ন্ত্রিত প্রশাসন এবং সামরিক বাহিনী সত্ত্বেও বাঙালিরা নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস শুধু গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে বারবার বাধাগ্রস্ত করার ইতিহাস।

পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী তাদের একচ্ছত্র আধিপত্য বজায় রাখতে বারবার গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় হস্তক্ষেপ করেছে। ১৯৭০ সালের নির্বাচনে বাঙালিদের নিরঙ্কুশ বিজয়ের পর এর ব্যত্যয় হবে, তা ভাবা বরং অস্বাভাবিক ছিল। স্বভাবতই নির্বাচনের পর ক্ষমতা হস্তান্তর নিয়ে টালবাহানা শুরু হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ক্ষমতা ও প্রাদেশিক নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখার নানা উপায় অনুসন্ধান শুরু হয়।

১ মার্চ ইয়াহিয়া খান গণপরিষদের অধিবেশন স্থগিত ঘোষণা করেন। তাঁর এই ঘোষণা পূর্ববঙ্গে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে বাঁধভাঙা জনরোষ দেখা দেয়। ৫ মার্চ ১৯৭১ করাচিতে পাঁচদলীয় বৈঠকে অবিলম্বে সামরিক সরকারের প্রতি নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য বলা হয় (পৃষ্ঠা ১০২)। ৭ মার্চ শেখ মুজিবুর রহমান রেসকোর্স ময়দানে জনসমাবেশে চূড়ান্ত মুক্তি সংগ্রামের নির্দেশনা দেন (পৃষ্ঠা ১০৩)। মার্চজুড়ে বিচ্ছিন্নভাবে পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে নিরস্ত্র জনসাধারণের প্রতিবাদ মিছিল ও সমাবেশে পাকিস্তান সামরিক বাহিনী গুলিবর্ষণ করে। দেশজুড়ে বহু হতাহত হয়। ইতিমধ্যে পাকিস্তানি জেনারেল টিক্কা খানকে প্রধান সামরিক প্রশাসক করে পূর্ব পাকিস্তানে পাঠানো হয়। ১৫ মার্চ ইয়াহিয়া খান অচলাবস্থা নিরসনে আলোচনার জন্য ঢাকায় আসেন (পৃষ্ঠা ১১৪)।

শেখ মুজিবের সঙ্গে ইয়াহিয়া খান ৩৫টি প্রশাসনিক নির্দেশনা নিয়ে আলোচনা করেন। অন্যদিকে শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালির 'মুক্তি আন্দোলনের' প্রতি মওলানা ভাসানী ও আতাউর রহমান খান পূর্ণ সমর্থন ব্যক্ত করেন। ঢাকার রেডিও ও টেলিভিশন কেন্দ্র শেখ মুজিবুর রহমানের নিয়ন্ত্রণে চলে যায়। পূর্ববঙ্গের অফিস-আদালত, শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান, ব্যাংক, ব্যবসাপ্রতিষ্ঠান সবকিছু আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণাধীন হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের সামরিক বাহিনী ব্যতীত কোনো কিছুর ওপর নিয়ন্ত্রণ ছিল না। আলোচনার অন্তরালে করাচি থেকে আকাশ ও সমুদ্রপথে পূর্ববঙ্গে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সামরিক সমরাস্ত্র ও জনবলের সমাবেশ করা হয়।

বাংলাদেশে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান যে পূর্বপরিকল্পিত ছিল, তার প্রমাণ পাওয়া যায় ১৯৭১ সালে *দ্য টেলিগ্রাফ*-এর দক্ষিণ এশীয় সংবাদদাতা ডেভিড লোসাকের বক্তব্যে, '১৯৭১ সালের শুরুর দিকে করাচি থেকে ঢাকাগামী পাকিস্তানের আন্তর্জাতিক বিমানের ফ্লাইটে আসন খালি পাওয়া ভাগ্যের ব্যাপার ছিল... রাষ্ট্রপতি ইয়াহিয়া খান অভিযানের জন্য দীর্ঘ সময় ধরে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন... ইতিমধ্যে ২০,০০০ পশ্চিম পাকিস্তানি সৈন্য পূর্বাঞ্চলে পাঠানো হয়েছে।... জ্যেষ্ঠ সামরিক কর্মকর্তাদের পরিকল্পনা অনুসারে দখলদার সেনাবাহিনীর জনবল ৩৫-৪০ হাজার থেকে বাড়িয়ে ৬০ হাজার করা হয়েছে এবং

৩ হাজার মাইল পাড়ি দিয়ে সৈন্যদের তাদের নতুন কর্মস্থলে যোগদান করতে হয়েছে।[৩] পাকিস্তানি সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার কিছুদিনের মধ্যে ব্রিটিশ দৈনিক *গার্ডিয়ান*-এ দেওয়া সাক্ষাৎকারে শেখ মুজিবুর রহমানের অর্থবিষয়ক উপদেষ্টা রেহমান সোবহান বলেন, 'আইয়ুববিরোধী আন্দোলনে বাঙালি জাতীয়তাবাদের শক্তির যে পরিচয় পাওয়া গেছে, তা বিবেচনায় রেখে দুই বছর ধরে সামরিক অভিযানের পরিকল্পনা রচনা করা হয়।... লে. জেনারেল ইয়াকুবের স্থলে পাঞ্জাবি জেনারেলদের মধ্যে ভয়ংকর হিসেবে পরিচিত লে. জেনারেল টিক্কা খান ৭ মার্চ দায়িত্ব গ্রহণ করেন।'[৪] ২৫ মার্চ, ১৯৭১ থেকে বাঙালিদের ওপর পাকিস্তানিদের যে নৃশংস হামলা শুরু হয় তার প্রস্তুতি কয়েক মাস ধরে চলছিল। ৭ মার্চ, ১৯৭১ *ওয়ার্কিং পিপলস ডেইলি* (রেঙ্গুন) প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুসারে, জাহাজ ও বিমানে করে পূর্ব পাকিস্তানে বিপুল পরিমাণ সমরাস্ত্র ও জনবল পাঠানো হচ্ছে।[৫] মার্চের দ্বিতীয় সপ্তাহ থেকে জ্যেষ্ঠ বাঙালি সামরিক কর্মকর্তাদের নিরস্ত্র এবং অন্তরীণ করার চেষ্টা শুরু হয় (পৃষ্ঠা ১৩২)। ২৫ মার্চ পূর্ব কোনো ঘোষণা ছাড়া ইয়াহিয়া খান ঢাকা ত্যাগ করেন। ২৫ মার্চ রাতে পূর্ববঙ্গে আওয়ামী সমর্থকগোষ্ঠী ও সনাতন ধর্মাবলম্বী সংখ্যালঘুদের বিরুদ্ধে সর্বাত্মক সামরিক অভিযান শুরু হয়। পূর্ববঙ্গে পাকিস্তানের সামরিক অভিযান শুরুর সঙ্গে সঙ্গে জুলফিকার আলী ভুট্টো ঘোষণা দেন, 'মহান আল্লাহকে ধন্যবাদ পাকিস্তানকে রক্ষা করার জন্য' (পৃষ্ঠা ১৩৪)।

২৪ বছর পূর্বে উপমহাদেশের জনগণ দেশভাগের যে দুঃস্বপ্নের সাক্ষী হয়েছিল তার পুনঃ চিত্রায়ণ হয় পূর্ববঙ্গে ১৯৭১ সালে। দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তান নামক যে তাসের ঘর নির্মিত হয়েছিল, তার ভাঙন অবশ্যম্ভাবী ছিল। পশ্চিম পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর সামন্তবাদী আচরণ শুধু এই ভাঙনকে ত্বরান্বিত করে। পাকিস্তানের ভাঙনের কারণ পাকিস্তান রাষ্ট্রের কাঠামোর মধ্যে নিহিত ছিল। ১৯৭০ সালের সাধারণ নির্বাচনে শেখ মুজিব ও তাঁর দল সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন সত্ত্বেও ক্ষমতা হস্তান্তরে টালবাহানা এবং সামরিকভাবে জনসমর্থিত একটি রাজনৈতিক দলকে দমনের চেষ্টা পাকিস্তান রাষ্ট্রের ভাঙনের আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করে মাত্র। ১৯৪৮ সালে ভাষার ওপর আঘাত হানার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্র ধ্বংস করার যে প্রক্রিয়া উদ্বোধন করা হয়, ২৫ মার্চ নিরীহ বাঙালিদের নিশ্চিহ্ন করতে অতর্কিতে ইয়াহিয়ার সামরিক বাহিনীর সামরিক হামলার মাধ্যমে পাকিস্তান রাষ্ট্রের ধ্বংসের সে প্রক্রিয়ার সফল সমাপ্তি নিশ্চিত করা হয়। ইয়াহিয়া খান পূর্ববঙ্গে শুধু পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক স্বার্থ নয়, বরং পাকিস্তানের ঐক্যের জন্য শেখ মুজিবুর রহমানের বাঙালির 'মুক্তির আন্দোলন' সশস্ত্রভাবে দমনে প্রয়াসী হয়েছিলেন, যা ছিল তাঁর উপর্যুপরি ভুল।

১৯৪৭ সালের দেশভাগের সময়ের মতো জীবন বাঁচাতে লাখ লাখ শরণার্থীর দেশত্যাগের মাধ্যমে পশ্চিম পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গের ওপর ঔপনিবেশিক শোষণের সমাপ্তি ঘটে। ২৫ মার্চ পাকিস্তানি সামরিক বাহিনী হত্যাযজ্ঞ শুরু করার পর এপ্রিলের শুরুতে শরণার্থী সংখ্যা ৩ মিলিয়নে পৌঁছায়। ৩০ আগস্ট ভারত সরকার প্রদত্ত হিসাব অনুযায়ী ভারতে আশ্রয় নেওয়া শরণার্থীর সংখ্যা ছিল প্রায় ৯ মিলিয়ন। এই সময় প্রতিদিন গড়ে ৪০,০০০ শরণার্থী ভারতে প্রবেশ করছিল। পরিস্থিতির উন্নয়ন না হলে শরণার্থীসংখ্যা ১৫ মিলিয়ন ছাড়িয়ে যাবে বলে বিভিন্ন মহল থেকে আশঙ্কা প্রকাশ করা হয় (পৃষ্ঠা ১৭৫)। এই সংখ্যা ছিল ১৯৪৭ সালে দেশভাগের সময় পাকিস্তান-ভারত উভয় দিকে দেশান্তরিত মোট শরণার্থীদের সমান। ভারত সরকারকে এই বিশাল শরণার্থী জনগণের জন্য প্রতি মাসে ৪০ কোটি রুপি ব্যয় করতে হয়। এপ্রিল-জুন সময়কালে ভারত সরকার শরণার্থীদের ত্রাণসহায়তার জন্য মোট ১২০ কোটি রুপি ব্যয় করেছে। সেপ্টেম্বর পর্যন্ত শরণার্থীদের ত্রাণসহায়তার জন্য ভারত সরকার বৈদেশিক সাহায্যসহ মোট ৩১৬ কোটি রুপি ব্যয় করেছে। ভারতের জনবহুল রাজ্যগুলোতে শরণার্থীদের ঢল স্থানীয় পর্যায়ে সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অস্থিরতা তৈরি করে। এই শরণার্থীরা হয়তো স্থায়ীভাবে থেকে যাবে এমন শঙ্কা জনমনে তৈরি হয়। কেন্দ্রীয় ভারত সরকার বাংলাদেশে শরণার্থী প্রত্যাবর্তনের পরিস্থিতি তৈরি না হলে শরণার্থীদের ফেরত না পাঠানোর নীতিগত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া খানের সঙ্গে শান্তি আলোচনার কোনো সম্ভাবনা বা সুযোগ তৈরি করা সম্ভব ছিল না। শরণার্থীদের প্রথম ঢলে মুসলিম জনসাধারণ, আওয়ামী লীগের কর্মী, ছাত্র, পুলিশ, ইপিআর সদস্য ও বাঙালি সেনা সদস্যরা ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী ঢলে প্রধানত ছিল হিন্দু ধর্মাবলম্বী জনসাধারণ।

ইয়াহিয়া খানও *নিউজউইককে* দেওয়া তাঁর সাক্ষাৎকারে ভারতে পাকিস্তানের ২ মিলিয়ন বা ২০ লাখ শরণার্থী আশ্রিত আছে বলে স্বীকার করেন। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী ও প্রচারমাধ্যম পাকিস্তান সামরিক বাহিনীর হিন্দুবিদ্বেষী মনোভাব ও হিন্দুদের প্রতি আগ্রাসন অবশ্য অস্বীকার বা লুকানোর কোনো চেষ্টা করেনি। পূর্ববঙ্গের হিন্দু সম্প্রদায়কে নিশ্চিহ্ন করার ব্যাপারে পাকিস্তান সেনাবাহিনী বদ্ধপরিকর ছিল। অবশ্য এই সাম্প্রদায়িক গণহত্যা প্রতিরোধে জাতিসংঘ বা বিশ্বমানবতা এগিয়ে আসেনি। ভারতের সঙ্গে সোভিয়েত ইউনিয়নের মৈত্রী চুক্তি এই সমস্যা সমাধানের জন্য পাকিস্তানের ওপর চাপ সৃষ্টি করার সুযোগ তৈরি করলেও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও গণচীনের সঙ্গে পাকিস্তানের আঁতাত এবং মুসলিম বিশ্বের পাকিস্তানের প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন পরিস্থিতির ইতিবাচকভাবে দ্রুত পরিবর্তনে প্রতিবন্ধকতা তৈরি করে (পৃষ্ঠা-১৮০)।

জাতিসংঘ এবং আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের কাছে ইয়াহিয়ার আগ্রাসী সামরিক বাহিনীর বিরুদ্ধে পূর্ববঙ্গের জীবনকে বাজি রেখে মুক্তির সংগ্রাম ছিল পাকিস্তানের 'অভ্যন্তরীণ বিষয়' (পৃষ্ঠা-৬২)। বিশ্ব পরাশক্তিগুলোর কাছে এই সংগ্রাম অপেক্ষা দক্ষিণ এশিয়ায় আঞ্চলিক ক্ষমতার ভারসাম্য রক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল। বিশ্ব জনমতের কাছে পূর্ববঙ্গের এই বেদনাদায়ক ঘটনা মানবিক বিপর্যয়ের চেয়েও বেশি কিছু ছিল। শুধু ত্রাণসহায়তা এই সমস্যার সমাধান নয়, তা অচিরেই বিশ্ববাসী বুঝতে পারে।

বস্তুত ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান নামে একটি দেশ তৈরি করা হয়েছিল। রাষ্ট্রটির ধর্ম ভিন্ন কোনো ভিত্তি-কলাম ছিল না। পাকিস্তান নামক ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতে গড়ে ওঠা রাষ্ট্রটির মেয়াদ ক্ষণস্থায়ী হবে তাঁর আলামত ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক, ভারতীয় উপমহাদেশের ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতিবিদ ও ভারতীয় আধুনিক জাতীয়তাবাদের অগ্রজ প্রবক্তা মাওলানা আবুল কালাম আজাদ তাঁর জীবনী *ইন্ডিয়া উইনস ফ্রিডম* গ্রন্থে উল্লেখ করেছিলেন, 'জিন্নাহ ও তাঁর অনুসারীরা বুঝতে পারছেন না যে ভৌগোলিক অবস্থান তাঁদের বিরুদ্ধে... এই দুই অঞ্চলের (পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশ) কোনো ধরনের প্রত্যক্ষ যোগাযোগ স্থাপনের সুযোগ নেই। অঞ্চলদ্বয়ের অধিবাসীরা একে অপর থেকে যেকোনো বিচারে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র শুধু ধর্মীয় পরিচয় ব্যতিরেকে। ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, ভাষাতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক মৌলিক পার্থক্য সত্ত্বেও ধর্মীয় পরিচয়ের ভিত্তিতে ঐকমত্য স্থাপনের প্রচেষ্টা জনগণের সাথ ধোঁকাবাজি ছাড়া কিছু নয়।... সর্বাপেক্ষা আশাবাদী ব্যক্তিও আশা করবে না যে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান তাদের সব মতপার্থক্য ভুলে গিয়ে একটি জাতিতে পরিণত হবে।'[৬]

পাকিস্তান রাষ্ট্রের গঠনকাঠামোর সমস্যার কারণে রাজনৈতিক পরিকাঠামোতে আঞ্চলিক ও সাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলোকে সম্মিলিতভাবে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। পাকিস্তানের রাজনৈতিক সমাজে এক অঞ্চলের নেতৃত্বের অন্য অঞ্চলের প্রতি সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় উচ্চমার্গীয় ও প্রভুত্ববাদী আচরণ বর্ণবাদী রূপ পরিগ্রহ করে। আইয়ুব খান এই বর্ণবাদকে তাঁর মৌলিক গণতন্ত্রের নামে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তানিদের সম্পর্কে বলেছিলেন, 'এ দেশের জনসংখ্যার সিংহভাগ ভারতীয় গোত্রভুক্ত। পাকিস্তানের জন্মের পূর্বে এদের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সম্পর্কে কোনো ধারণা ছিল না। তারা এ যাবৎ হিন্দু বর্ণপ্রথা, মোগল, পাঠান ও ব্রিটিশদের দ্বারা শাসিত হয়ে আসছে। এর ফলে তাদের মধ্যে এখনো হিন্দুয়ানি সংস্কৃতি এবং ভাষাতাত্ত্বিক প্রভাব রয়েছে। তারা সব সময় নতজানু জাতি এবং মানসিকভাবে এখনো নব্য স্বাধীনতার সঙ্গে মানিয়ে নিতে মানসিকভাবে প্রস্তুত নয়, পূর্ব বাংলার মানুষদের প্রতি পশ্চিম পাকিস্তানের এ ধরনের আচরণ আঁতে ঘা সৃষ্টি করে। অথচ পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার জন্য জাতীয়তাবাদের অর্থনৈতিক উপাদান পূর্ব বাংলার মুসলিম সম্প্রদায়ই জোগান দিয়েছিল।'

পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে সাংস্কৃতিক ও ভাষাতাত্ত্বিক পার্থক্য সত্ত্বেও শুধু অবিভক্ত ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বৈষম্য ও শোষণের কারণে পূর্ব বাংলার জনগণ বিশেষত মুসলিম সম্প্রদায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠাকে সমর্থন করেছিল। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর অবশ্য নব্য শাসকগোষ্ঠীর পূর্বসূরিদের মতো শাসন ও শোষণ অব্যাহত রাখলে অল্প সময়ের মধ্যে পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্ত ও কৃষক সমাজের স্বপ্নের সলিল সমাধি ঘটে। ১৯৪৭ সালে দেশভাগের পূর্বে ব্রিটিশরাজে অন্তত সমতার প্রশ্নে কিছু সহযোগিতা পাওয়া যেত। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ কলকাতাকেন্দ্রিক বাবুদের 'ভদ্রলোক' বলে বিদ্রূপ করলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রে নিজেরা 'ভদ্রলোক'রূপে আবির্ভূত হয়। পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজ পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের শাসকশ্রেণিকে 'অভদ্র' মনে করত, কারণ তারা রবীন্দ্রসংগীত বা কবি কাজী নজরুল ইসলামের সৃষ্টি সম্পর্কে জানত না, বুঝত না, কদর করত না। অন্যদিকে পশ্চিম পাকিস্তানিরা নিজেদের ইন্দো-ইসলামি সংস্কৃতির উত্তরাধিকারী হিসেবে বাঙালিদের নিম্ন শ্রেণির এবং রাজনৈতিকভাবে বিদ্রোহী মনোভাবাপন্ন মনে করত। পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের মধ্যে পরস্পরের প্রতি প্রতিক্রিয়াশীল দৃষ্টিভঙ্গি ক্রমশ সাগরসম ব্যবধান ও বিরোধিতা তৈরি করে এবং ভৌগোলিকভাবে দূরবর্তী অঞ্চলদ্বয়ের মধ্যে সম্পর্কের সেতু নির্মাণের আদৌ কোনো সুযোগ অবশিষ্ট ছিল না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ঘটনাপরম্পরায় অনিবার্যভাবে তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে বিরোধিতা শুধু সাংস্কৃতিক নয়, বরং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক কারণেও ত্বরান্বিত হয়েছে। রাজনৈতিক আদর্শগত ভিন্নতা এবং রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক স্বার্থের প্রশ্নেও ১৯৪৭ থেকে ১৯৭১ পর্যন্ত পাকিস্তানে আঞ্চলিক এবং জাতীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক সমাজে দীর্ঘমেয়াদি রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠা এবং গণতান্ত্রিক সংস্কৃতির বিকাশ সম্ভব হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের রাজনীতিতে পাঞ্জাবের কর্তৃত্ব বিস্তার এবং পাঞ্জাবি সামরিক-আমলাতান্ত্রিক সভ্যদের অন্যদের বিশেষত পূর্ব বাংলার মুসলিম সমাজের প্রতি বৈরী মনোভাব ও প্রতিক্রিয়াশীল আচরণ শুধু জাতিগত ঘৃণা ও হিংসা বৃদ্ধি করেছে। জাতিগত এই অসহিষ্ণুতা বাংলাদেশ জেনোসাইডের প্রধান উপজীব্য। জাতিগত ঘৃণা পাঞ্জাবনিয়ন্ত্রিত পাকিস্তানি সামরিক বাহিনীকে বাঙালি জাতিকে নৃশংসভাবে নিশ্চিহ্ন করতে প্রণোদিত করে। পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে জাতিগত, ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক পার্থক্য এবং অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সামরিক বৈষম্য জাতিগত ঘৃণা, পারস্পরিক মতবিরোধ তৈরি করে এবং গণতান্ত্রিক ও মানবিক সহমর্মিতা ও সহযোগিতার অপমৃত্যু ঘটায়। অবিভক্ত পাকিস্তানের শাসকশ্রেণির

উপনিবেশবাদী দৃষ্টিভঙ্গি এবং আচরণের জন্য পূর্ব বাংলা ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে ঐকমত্যের শেষ সম্ভাবনার দ্বার চিরতরে বন্ধ হয়ে যায়।

তথ্যসূত্র :

১. K. Subrahmanyam and Mohammed Ayoob. *The Liberation War*, New Delhi: S. Chand & Co. (Pvt.) Ltd., 1972. Pp. 73-92.
২. K. Subrahmanyam and Mohammed Ayoob. প্রাগুক্ত, Pp. 94-110.
৩. Devid Loshak, Pakistan Crisis, London, 1971, P.59.
৪. Guardian (Manchester), June 5, 1971.
৫. K. Subrahmanyam and Mohammed Ayoob. প্রাগুক্ত, P. 138.
৬. K. Subrahmanyam and Mohammed Ayoob. প্রাগুক্ত, P.1

লে খ ক প রি চি তি

বদরুল আলম খান

বদরুল আলম খান দীর্ঘকাল ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনায় নিযুক্ত আছেন। চট্টগ্রাম ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজতত্ত্ব বিভাগে শিক্ষকতার পর বর্তমানে তিনি অস্ট্রেলিয়ার সিডনি শহরে ইউনিভার্সিটি অব ওয়েস্টার্ন সিডনিতে অধ্যাপনা করছেন। তাঁর গবেষণার বিষয়বস্তু আন্তর্জাতিক সম্পর্ক, বাংলাদেশ সমাজ, শ্রেণি, ধর্ম ও বিশ্বায়ন। তিনি বেশ কয়েকটি গ্রন্থ রচনা করেছেন, যার মধ্যে *পুঁজিবাদের সমাজতত্ত্ব* (সম্পাদনা), *সমাজতত্ত্ব: সংকট ও সম্ভাবনার দেড়শ বছর*, *দর্শনের সংকট এবং তৃতীয় বিশ্ব*, *ধর্ম ও সমাজ বিপ্লব* বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। *সংঘাতময় বাংলাদেশ: অতীত থেকে বর্তমান* নামক একটি গ্রন্থ ২০১৫ সালে প্রথমা প্রকাশন থেকে প্রকাশিত হয়েছে।

মালেকা বেগম

গবেষক ও শিক্ষক। সেন্ট্রাল উইমেন্স ইউনিভার্সিটির সোসিওলজি অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের বিভাগীয় প্রধান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উইমেন অ্যান্ড জেন্ডার স্টাডিজ বিভাগের খণ্ডকালীন শিক্ষক। বাংলাদেশের নারীবাদী আন্দোলনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছেন। নারীর সামাজিক, পারিবারিক, রাজনৈতিক ও আইনি অধিকার নিয়ে গবেষণা করেছেন। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা—[সম্পা] *নারীর কথা* (ঐতিহ্য, ২০১২); *মুক্তিযুদ্ধে নারী* (প্রথমা প্রকাশন, ২০১১); [সম্পা] *নির্বাচিত বেগম: অর্ধশতাব্দীর সমাজচিত্র ১৯৪৭-২০০০* (পাঠক সমাবেশ, ২০০৬); *যৌতুকের সংস্কৃতি* (ইউপিএল, ২০০৬); [সম্পা] *স্নেহলতা* (সূচীপত্র, ২০০৬)।

জন পি থর্প

মার্কিন সমাজতাত্ত্বিক। সমাজতত্ত্ব, নৃতত্ত্ব এবং সমাজকর্ম বিভাগের সহকারী অধ্যাপক, সেন্ট মেরিস কলেজ, নটরডেম, ইন্ডিয়ানা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা— *পাওয়ার অ্যামং দ্য ফারমার্স অব দাড়িপাল্লা: আ বাংলাদেশ ভিলেজ স্টাডি* (কারিতাস বাংলাদেশ, ১৯৭৮); [সম্পা] *বাংলাদেশ: সোসাইটি, পলিটিকস এন্ড ব্যুরোক্রেসি* (সেন্টার ফর অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ স্টাডিজ, ১৯৮৪)।

বরিস কালিয়াগিন

সোভিয়েত সাংবাদিক বরিস কালিয়াগিনের জন্ম ১৯৩৮ সালের ১০ সেপ্টেম্বর। কেন্দ্রীয় টেলিভিশনের আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক তিনি। ১৯৬২ সালে তিনি মস্কো

রাষ্ট্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভুক্ত 'প্রাচ্যের ভাষা ইনস্টিটিউট' থেকে 'হিন্দি ভাষা ও ভারতীয় সাহিত্য' বিষয়ে এমএ করেন। এরপর এক বছর পড়াশোনা করেন দিল্লি বিশ্ববিদ্যালয়ে। ১৯৬৬ সালে ভারতের ইতিহাস বিষয়ে পিএইচডি করেন।

ভ্লাদিমির স্কসিরিওভ

তিনি সোভিয়েত ইউনিয়নের বহুল প্রচারিত পত্রিকা *ইজভেস্তিয়ার* সাংবাদিক। তাঁর সম্পর্কে এর বেশি তথ্য পাওয়া যায়নি।

মহিউদ্দিন আহমদ

অর্থনীতি নিয়ে পড়াশোনা করেছেন। সুংকোংহে বিশ্ববিদ্যালয়ের (সিউল) এমএ ইন এনজিও স্টাডি কোর্সের প্রতিষ্ঠাতা অধ্যাপক। গবেষক, মাঝেমধ্যে পত্রিকায় কলাম লেখেন। লেখা ও সম্পাদনায় গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে এ যাবৎ ৩৮টি। এর মধ্যে কবিতার বই সাতটি। উল্লেখযোগ্য বই: *কার্ল মার্ক্সের কবিতা*, *লাল সালাম কমরেড*, *পিতা হি পরমন্তপ*, *উঠোনভরা কষ্ট*, *গভীর পবিত্র অন্ধকার*, *ফ্রম যমুনা টু নাইল*, *এই দেশে একদিন যুদ্ধ হয়েছিল*, *সিউল ডায়রি*, *আমাদের একাত্তর*, *নারীজীবনের গল্প*, *আমরা করব জয়*, *ভয়েসেস থ্রু ব্যালট*।

মো. ফজলে রাব্বি

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস ও পররাষ্ট্রনীতির ইতিহাস, ক্ষুদ্র রাষ্ট্র অধ্যয়ন, মিয়ানমার, আর্কাইভস এবং সামাজিক উন্নয়ন বিষয়ে গবেষণারত। বর্তমানে বাংলাদেশের প্রথম আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক দ্বৈমাসিক পত্রিকা *ফরেন অ্যাফেয়ার্স ইনসাইটস অ্যান্ড রিভিউস*-এর (এফএআইআর) সদস্য সম্পাদক এবং ল্যাঙ্কেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়-ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ গবেষণা প্রকল্পে জ্যেষ্ঠ গবেষণা সহযোগী হিসেবে কর্মরত আছেন। জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিষয়ে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে অধ্যয়ন করেছেন।

গ্রাহক হওয়ার নিয়ম

যেকোনো সময় যেকোনো সংখ্যা থেকে *প্রতিচিন্তা*র গ্রাহক হওয়া যাবে। একবারে কমপক্ষে চার সংখ্যা বা এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে হবে। 'মিডিয়াস্টার লিমিটেড প্রতিচিন্তা' বরাবর মানি অর্ডার, পে-অর্ডার বা ব্যাংক ড্রাফটের মাধ্যমে টাকা জমা করা যাবে। অফিসে সরাসরি উপস্থিত হলেই শুধু নগদ টাকা গ্রহণ করা হবে। এক বছরের জন্য গ্রাহক হতে দেশের গ্রাহকদের অগ্রিম দিতে হবে ২০০ (দুই শত) টাকা, বিদেশের গ্রাহকদের জন্য ৩০ (ত্রিশ) ডলার; দুই বছরের ক্ষেত্রে যথাক্রমে ৪০০ (চার শত) টাকা ও ৬০ (ষাট) ডলার।

গ্রাহক হিসেবে আবেদন করতে পরিষ্কার করে লিখুন:

নাম, অবস্থান (দেশ/ বিদেশ), বিস্তারিত ঠিকানা, ফোন ও ই-মেইল (যদি থাকে), গ্রাহক হওয়ার মেয়াদ (এক/ দুই বছর), অর্থ প্রদানের মাধ্যম (মানি অর্ডার/ পে-অর্ডার/ ব্যাংক ড্রাফট), টাকা/ ডলারের পরিমাণ।

গ্রাহক হিসেবে নিবন্ধিত হওয়ার পর গ্রাহককে একটি রসিদ দেওয়া হবে।

যোগাযোগের ঠিকানা

সম্পাদক
প্রতিচিন্তা
১০০ কাজী নজরুল ইসলাম অ্যাভিনিউ (সিএ ভবন), কারওয়ান বাজার
ঢাকা ১২১৫। ফোন: ৮১৮০০৮১

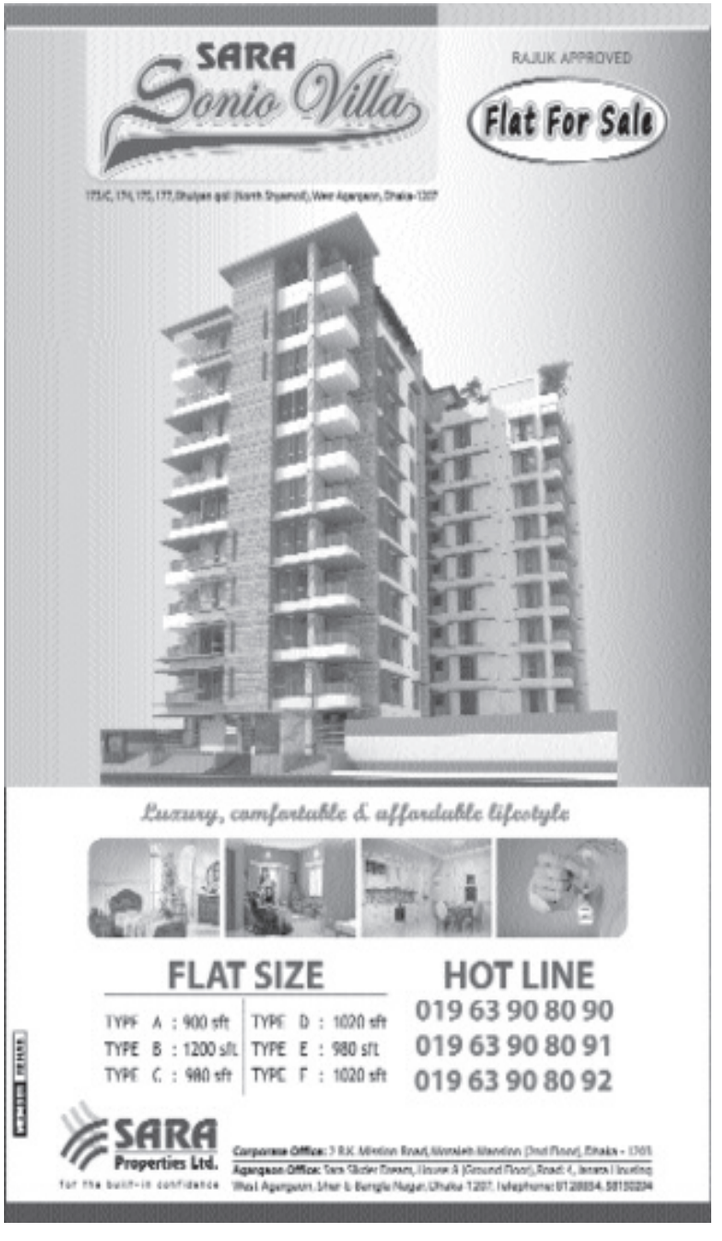
SARA
Sonio Villa
RAJUK APPROVED
Flat For Sale

Luxury, comfortable & affordable lifestyle
FLAT SIZE
TYPE A : 900 sft
TYPE B : 1200 sft
TYPE C : 980 sft
TYPE D : 1020 sft
TYPE E : 980 sft
TYPE F : 1020 sft
HOT LINE

SARA
Properties Ltd.
for the built-in confidence
Corporate Office: 7 R.K. Mission Road, Motaleb Mansion (2nd Floor), Dhaka - 1205
Agargaon Office: Sara Glider Tower, House 8 (Ground Floor), Road 4, Janata Housing West Agargaon, Sher-e-Bangla Nagar, Dhaka-1207. Telephone: 0128854, 58150204